SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

6752

Hooghly Basic Training School.

তৃপ্তি

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিন্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীযুক্ত ঠাকুর হরনাথের
শ্রীচরণে

কৈফিয়ৎ

"তৃপ্তি" ধারাবাহিকভাবে "বঙ্গবাণী"তে বাহির হইয়াছিল। এস্থলে তাহার সামান্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার করা হইয়াছে।

রাম না হইতে রামায়ণ হইয়াছিল, এ বইখানিরও বই হইবার পূর্ব্বেই অনেক সমালোচনা হইয়াছে প্রধানতঃ মুখে মুখে। অধিকাংশ সমালোচনা শুনিয়া হতাশ হইয়াছি, কেন না সমালোচনা হইয়াছে "তৃপ্তি" উপন্যাসের নয়, তার তত্ত্ব কথার। পাঠক পাঠিকাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, এ বইয়ে তত্ত্বকথা যতই থাকুক, তাঁরা যেন বিচার করেন উপন্যাস হিসাবে ইহার সার্থকতা। ইহার তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে যেন তাঁরা এই প্রশ্নটাই মনে জাগাইয়া রাখেন যে এই সব তত্ত্বালোচনা নায়িকার জীবনের উন্মেষের কি পরিচয় দেয় তাই প্রধানতঃ দেখিবার জিনিষ।

"শুভা" ও "শান্তি" শ্রেণীর উপন্যাস হইতে "তৃপ্তি" অনেকটা ভিন্ন এই হিসাবে যে "শুভা" বা "শান্তি"র ভিতর একটা কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়া একটী সজীব নারীর চিত্তের যে পথে পরিণতি লাভ হইয়াছিল, "তৃপ্তির" নায়িকার পরিণতি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন পথে। এ বিষয়ে আমার উপন্যাসের মধ্যে "তৃপ্তি" সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নয় এ কথা আমার পাঠক-পাঠিকা জানেন।

"শুভা", "শান্তি" শ্রেণীর উপন্যাস পড়িয়া যে সমালোচকেরা আমাকে গালি দিয়াছিলেন, "তৃপ্তি" শ্রেণীর উপন্যাস পড়িয়া তাঁরা আমাকে অভিনন্দন করিয়াছেন—যিনি প্রশংসা বা অভিনন্দনের যোগ্য উদারতা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই তিনিও আমার চিত্তের নৈতিক স্বাস্থ্যোন্নতির

সার্টিফিকেট দিয়াছেন। অপর পক্ষে যাঁহারা "শুভা" "শান্তি" পড়িয়া আমাকে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর উপন্যাস পড়িয়া হতাশ হইয়াছেন।

ইঁহাদের নিন্দাবাদে আমি বিচলিত হই নাই, ইঁহাদের প্রশংসায়ও আমি উল্লসিত হইতে পারি না। কারণ নিন্দা ও প্রশংসা আলোচনা করিয়া যে সত্যটা খুব প্রবলভাবে আমার কাছে প্রকাশ হইয়াছে সেটা এই যে তাঁহারা আমাকে বোঝেন নাই।

কথাটা বড় স্পর্দ্ধার কথার মত শোনায়, সুতরাং একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা দরকার।

যে কোনও উপন্যাসের প্রধানতঃ তিন ভাবে সমালোচনা হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

(১) উপন্যাসকে নিছক সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করিয়া তাহার রসালোচনা—ইহা খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনা।

(২) উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বা অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলির সমাজের প্রতি উপযোগিতা বা অপকারিতার আলোচনা। ইহা সাহিত্যালোচনা নয়, সামাজিক জীবনে সাহিত্যের স্থান ও মূল্য নিরূপণ।

(৩) উপন্যাস লেখকের চিত্ত ও প্রতিভার বিকাশ—সুতরাং উপন্যাস আলোচনা করিয়া লেখকের চিত্ত ও চরিত্র, মতামত ও মতি-গতির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা সাহিত্যালোচনা নয়, সাহিত্যিকের জীবনীর আলোচনা।

আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা অত্যন্ত বিরল। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচনা যথেষ্ট আছে। তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচনা প্রকাশ্যভাবে খুব কম আছে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে অনেক হয়।

আমার উপন্যাসগুলির প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা অতি যৎসামান্য

হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে। এবং বহু সমালোচনার মধ্যেই তৃতীয় শ্রেণীর আলোচনা প্রচ্ছন্নভাবে হইয়াছে। অর্থাৎ সমালোচক আমার বইয়ের মতামতের ভিতর আমার মতামত এবং আমার চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন।

আমি যদি এত বড় সাহিত্যিক হই যে আমার জীবন ও চিত্তের অবস্থা ও পরিণতির সংবাদ লইতে পাঠকবর্গের কৌতূহল হয়, তবে আমার বইগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু সে আলোচনার পদ্ধতি, কোনও একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের সাহিত্যহিসাবে সমালোচনার পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। আমার মতামত বা আমার মনের অবস্থা কিম্বা জীবনতত্ত্ব (Philosophy of Life) সম্বন্ধে আমার বিশিষ্ট মত যেমন আমার একদিনের একটা কথা ধরিয়া আলোচনা করা যায় না, তেমনি কেবলমাত্র একখানা বা দুইখানা বই পড়িয়াও তাহা আলোচনা করা যায় না। সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে আমার সমস্ত বইগুলি সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে কতকটা জানা যাইতে পারে। আমি কোনও বই-ই কোনও বিশেষ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই, তবু একথা অবশ্যই সত্য যে সবগুলি বইয়ের ভিতরই আমার বিশিষ্ট জীবনতত্ত্বের ছায়াপাত নিশ্চয়ই হইয়াছে। সবগুলি বই সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে তাহা আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।

যদি কেহ সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কোনও দিন আমার সমগ্র গ্রন্থাবলীর এমন সমালোচনা করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমার এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সব বইয়ের ভিতর জীবন ও সমাজ বিষয়ে যে মতবাদ প্রচ্ছন্নভাবে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ তো নয়ই, তাহা একটি সমগ্র অখণ্ড জীবনতত্ত্বের বিচ্ছিন্ন খণ্ড মাত্র—সে খণ্ডগুলি

একীকৃত করিলে হয় তো সেই সম্পূর্ণ মতবাদের আভাস পাইয়া যাইতে পারিবে। আমার Philosophy of Life জানিবার আগ্রহ যদি কাহারও হয় তাঁহাকে এই একীকরণ করিবার আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

সম্প্রতি আমার এক সুপ্রসিদ্ধ নিন্দক আমার উপন্যাসের ভিতরকার মতামত লইয়া মাসিকপত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন—তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি আমার সব বই পড়িয়াছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কতকগুলি গালিগালাজ করিয়া বলিয়াছেন আমি কি এমন একটা লোক যে আমার সব লেখা সকলকে পড়িতেই হইবে? বলা বাহুল্য আমি এমন স্পর্দ্ধার কথা কোনও দিনই বলি নাই যে আমি যাহা কিছু লিখিব তার সবই সকলের পড়িতে হইবে। পড়া না পড়া পাঠকের ইচ্ছাধীন। সব বই না পড়িয়াও যে কোনও সমালোচক আমার যে কোনও একখানা বইয়ের সমালোচনা করিতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু আমার সব বই না পড়িয়া, কেবল একখানা দুইখানা কি দশখানা বই পড়িয়া যদি কেহ **আমার** প্রচারিত মতবাদ বা **আমার** মতিগতির আলোচনা করিতে যান, তবে আমার আপত্তি করিবার অধিকার আছে, আশা করি এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে **আমার** মতামতের এরূপ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই, কখনও আসিবে কি না ভগবান জানেন। আপাততঃ পাঠক ও সমালোচক যদি সেই অনাবশ্যক আলোচনা না করিয়া বইগুলি উপভোগ ও আলোচনা করেন, তবে তাঁদের অন্ততঃ অনেকটা পণ্ডশ্রম নিবারিত হইবে।

কিন্তু আমার লেখার যে সব সমালোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে আমার এই সামান্য আশা পূর্ণ হওয়া বিষয়ে আমি হতাশ

হইয়াছি। আমার সমালোচক-বৃন্দ আমার বই পাইলেই আমার সমাজ-ঘটিত মতামত ও তার হিতাহিত লইয়া আলোচনা করিতে বসেন। আমার প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে তাঁদের কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত ধারণা আছে, যেগুলি আমার বইয়ের নিরপেক্ষ আলোচনার উপর মোটেই প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব ধারণা লইয়া তাঁরা কেহ বা আমাকে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন, কেহ বা পরোক্ষভাবে সাবধানে শব্দভেদী বাণ ছাড়িয়া আমাকে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের প্রতিপাদ্য এই যে, এইভাবে আমি যে সব চিত্র আঁকিয়াছি, তাহা আমাদের সনাতন আদর্শের বিরোধী, সমাজের পক্ষে অহিতকর এবং বর্ত্তমান সমাজের চিত্রহিসাবে অসত্য।

এ সব কথার উত্তর দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কল্পিত চিত্রগুলি অসত্য এ কথা যদি কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেন, তবে আমি মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতাম; কিন্তু আমার সমালোচকেরা কেহ সে চেষ্টা করেন নাই, কেবল কতকগুলি নিরুপাধিক ফাঁকা কথার সৃষ্টি করিয়া "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি" নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহারা আমার এক কাল্পনিক মূর্ত্তির দিকে ছুঁড়িয়া তাঁদের শব্দভেদী বাণ বৃথা অপচয় করিয়াছেন, তাঁদের সমালোচনা আমাকে স্পর্শ করে নাই।

যদি তাঁদের সমালোচনা আমাকে স্পর্শ করিত, তবুও আমার সে বিষয়ে কিছু বলিবার থাকিত না। কেন না সমালোচনার উত্তরে নিজের বইয়ের সমালোচনা গ্রন্থকারের পক্ষে নীতিবহির্ভূত। আর যদি বা আমার এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় থাকিত, তবু বলিতে পারিতাম না। কেন না, সম্প্রতি আমার কোনও প্রসিদ্ধ সমালোচক আমাকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহ মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যের এক নিঃশ্বাসে এক সমালোচনা

করিয়াছিলেন—তার প্রধান প্রতিপাদ্য আমার মতামত সম্বন্ধে আমাকে তিরস্কার। আমি উত্তরে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে সিংহ মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অধিকারী হইতে গেলে যে সব বিষয়ে জ্ঞান অপরিহার্য্য সে সব বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অজ্ঞতা আছে। উত্তরে সিংহ মহাশয় খেউড় গাহিয়াছিলেন। সে খেউড়ের ভিতর যেটুকু যুক্তির আভাস পাওয়া যায় তাহা এই—"আমি কিছু জানি না এবং পড়ি নাই সত্য, কিন্তু জানিবার বা পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু কোনও কিছু না জানিয়া আমার সহজ-বুদ্ধিতে যে কথা আসে তাহা আমি বলিব।"

শুধু অজ্ঞান দূর করা যায় কিন্তু এই স্পর্দ্ধিত অজ্ঞতা, অজ্ঞতা লইয়া এই প্রচণ্ড দর্প—ইহার প্রতিকার নাই।

আমি আমার সমালোচকদেরকে যুক্তি দিয়া নিরুত্তর করিব এ স্পর্দ্ধায় এ দীর্ঘ মুখবন্ধ উপস্থিত করি নাই। আমি শুধু বলিতে চাই যে আমি আমার সমালোচকদের কোনও উত্তর দিব না, কেন না, প্রথমতঃ তাঁরা আমাকে বোঝেন নাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁদের বুঝিবার ইচ্ছা নাই। শ্রীভগবানের উপর আমার কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া আমি সুধু প্রতীক্ষা করিব সেই সমালোচকের যিনি আমার গ্রন্থপথে আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহার দোষগুণ বিচার করিবেন। হয় তো ভগবানের আশীর্ব্বাদে সেদিন কোনও দিন আসিতে পারে,

"কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী"

গ্রন্থকার।

তৃপ্তি

১

শিশির বাবুর বাড়ীর অবস্থা ভাল। কিন্তু তবু তিনি ডেপুটিগিরী করেন। পাড়াগাঁয়ে বিষয় কর্ম্ম লইয়া পড়িয়া থাকা তাঁর ধাতে সয় না। তা ছাড়া তিনি আদ্যোপান্ত কাজের লোক। কাজ না থাকিলে তাঁর প্রাণটা হাঁপাইয়া ওঠে। পাড়াগাঁয়ের জীবনের পরিপক্ক আলস্য তাঁর অসহ্য। ডেপুটী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া নানারকম সমাজের হিত চেষ্টায় তাঁর আনন্দ। তাই তিনি পুরাপুরি বিশ বৎসর অক্লান্ত ভাবে ডেপুটিগিরী করিতেছেন। তাঁর মত কর্ম্মপটু সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডেপুটি দুর্ল্লভ। বলা বাহুল্য, তাঁর সাহসের প্রধান আশ্রয় তাঁর ধনবল। চাকরী ইস্তফা দিতে হইলে বা বরখাস্ত হইলে তাঁকে ভাতে মারিতে হইবে না, এ কথা তিনিও জানিতেন, এবং আর সকলেও জানিত। তাই তিনি ল্যাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া কালেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত সকলের সহিত পরম সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করিলেও, মাথা খাড়া করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। ভাল অফিসার বলিয়া তাঁর সরকারে প্রতিপত্তি ছিল, আর যেখানেই যাইতেন সেখানেই দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত।

তাই যখন দুইদিনের জ্বরে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হইল, তখন চুঁচুড়ার সহরশুদ্ধ লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। শিশির বাবুর যেমন প্রতিপত্তি ছিল পুরুষ মহলে, তাঁর স্ত্রীর বুঝি তার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি ছিল মেয়ে মহলে, আর গরীব দুঃখীর কাছে। গরীবের দুঃখে তিনি কেবল আহা উহু করিতেন না, তাদের ঘর বহিয়া নীরবে তাঁর সেবা পৌঁছাইতেন। আর এদিকে এমন মিশুক, এমন হাস্য রহস্যময়ী নারী চুঁচুড়ার সমাজের মধ্যে ছিল না। মেয়ে মজলিশ তাঁকে ছাড়া জমিত না। বাসর ঘরে তিনি না আসিলে হাসি ফুটিত না। আবার কারও শক্ত রোগ হইলে তাঁর হাসি মুখের সেবা না হইলে রোগ সারিত না।

এমন নারীর মৃত্যুতে সমস্ত সহর শুদ্ধ লোক যে কাঁদিয়া মরিবে সে আর বিচিত্র কি ?

যখন বিদ্যুল্লতার সদ্যমৃত দেহ লালপেড়ে শাড়ী ও কপালে সিন্দুর মাখিয়া সহরে সারা পথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিল, তখন প্রায় সহস্রলোক তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাজ্যের নারী তাঁর এগার বছরের ছেলে দিলীপকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাহাকার করিল। জানালায় জানালায় মেয়েদের ভিড় হইয়া গেল। সকলে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি ভাগ্যবতী !"

বাস্তবিক বিদ্যুৎ বড় ভাগ্যবতী। তার বিবাহের পর হইতে তিনি একদিনের তরে দুঃখের মুখ দেখেন নাই। শুধু একবার তাঁর কাঁদিতে হইয়াছিল—যখন তাঁর স্নেহময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁকে সংসারের ভার দিয়া চিরদিনের তরে হাসিমুখে চক্ষু মুদিলেন। যেদিন বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছে সেদিন হইতে তাঁর স্বামীর সব দিক দিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁর একটি মাত্র ছেলে দিলীপ। সে দেখিতে রাজপুত্রের মত। বুদ্ধি শুদ্ধি স্বভাব চরিত্র সুন্দর আর লেখাপড়ায় সে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। স্বামীপুত্রের

এমন সৌভাগ্য দেখিতে দেখিতে ভাগ্যবতী বিদ্যুৎ, মাত্র দুইদিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁর মত ভাগ্য কার?

কিন্তু শিশির ইহাতে একদম ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ বৎসর হইল তার বিবাহ হইয়াছে, এ বিশ বৎসর এই পরম স্নেহময়ী নারীর প্রীতি সেবা হাস্য তাকে চারিদিক দিয়া এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাকে এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে হঠাৎ এমনি ভাবে তার সে স্নেহ-বন্ধন ভাঙ্গিয়া পড়িতে সে চারিদিক দিয়া জীবন শূন্য বোধ করিল। তার সকল কাজে বিদ্যুতের হাত ছিল, আফিসের কাজে পর্য্যন্ত সে ছিল তাঁর মন্ত্রণাদাত্রী। কাজেই সব কাজ করিতে করিতে তার ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল। তার মনে হইল যে চারিদিক দিয়া তার সকল আশ্রয় যেন ধপ করিয়া ধসিয়া পড়িয়াছে।

দিলীপ হইল এখন হইতে শিশির বাবুর প্রধান কার্য্য। আফিসের সকল কাজ অবহেলা করিয়া সে দিন রাত আপনাকে ছেলের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। দিলীপ যাতে মায়ের অভাব বুঝিতে না পারে, সকল দিক দিয়া তার জীবন যাতে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয় সেইজন্য শিশির বাবু উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

কিছুদিন দিলীপ মাকে হারাইয়া একটু উন্মনা হইল। কিন্তু এমনভাব তার বেশীদিন রহিল না! এগার বছরের ছেলের মনে অভাবের ছাপ কখনও বেশীদিন থাকে না। তাই দু দিন না যাইতেই সে পূর্ব্ববৎ হাসি খেলা করিতে লাগিল। তা'ছাড়া দিলীপ বরাবরই মায়ের চেয়ে বাপকেই বেশী ভাল বাসিত। পিতার সরকারীকাজকর্ম্মে এত বেশী ব্যাপৃত থাকিতে হইত যে দিলীপ তাঁহাকে পাইত বড় কম। আর যাও পাইত তাতেও আবার মা অর্দ্ধেক ভাগ বসাইতেন। তাই মা থাকিতে সে বাপকে কোনদিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাছে পাইত না। এখন সে তাঁকে

ষোলআনা রকমে দখল করিতে পারিয়া বরং বেশ একটু উৎফুল্ল বোধ করিল। মায়ের অভাবের ক্ষতিটা এ লাভে তার পোষাইয়া গেল।

কিছুদিন পর শিশির তার এক বিধবা ভগ্নীকে বাড়ীতে আনিল। তাঁর সঙ্গে আসিল আর একটী পোষ্য—তাঁর পুত্র রমেন।

পিসীমার নাম উমা—শিশিরের খুড়তুতো ভগ্নী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইয়াছিল, শিশিরের তিন চার বছরের ছোট। দেখিতে শুনিতে ভাল নয় বলিয়া তাহার বিবাহটা তত সুবিধার হইয়াছিল না। কিন্তু শিশিরের পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তত দিন উমার টাকা পয়সার অভাব ছিল না। শিশিরও চিরদিনই উমাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু উমা বড় দুর্ভাগিনী। তার চারিটি ছেলে শিশিরের সাহায্যে লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইবার মত হইতেছিল, কিন্তু এক বছরের মধ্যে তিনটি ছেলে মারা গেল। অবশিষ্ট রহিল রমেন। তার পর তার স্বামী মারা গেল। সে আজ দুই বৎসরের কথা। রমেনের বয়স তখন তের বছর।

উমা গোড়ায় মেয়েটি মন্দ ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণচেতা স্বামীর সঙ্গে বাস করিয়া এবং দারিদ্র্যের কষ্টের ভিতর কাটাইয়া তার সুখলোলুপ হৃদয় অনেকটা সঙ্কীর্ণ ও পরশ্রীকাতর হইয়া উঠিয়াছিল। তার সব চেয়ে বেশী হিংসা ছিল বিদ্যুতের উপর। শিশির উমাকে যত যা দিত, কিছুতেই তার মন উঠিত না। তার মনে হইত দাদা বৌদিদিকে যেমন জিনিষ দেয়, বৌদিদিকে যেমন সুখ স্বচ্ছন্দে রাখে তার ভাগ্যে তেমন হয় না। এজন্য যে দায়ী তার বৌদিদি সে বিষয়ে উমার এক ফোঁটাও সন্দেহ ছিল না।

তার পর ছেলেগুলি ও স্বামী মারা যাওয়ার পর তার মনটা যেন

কেমন বিকৃত হইয়া গেল। সে ভয়ানক খিট্‌খিটে হিংসুক ও ঝগড়াটে হইয়া উঠিল। সে বিধবা হইলে শিশির তাকে নিজের কাছে আনিয়াছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে সংসারে এত অশান্তি সৃষ্টি করিল যে শিশির বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। তার পর দুই বৎসর সে দেশে ছিল। আর এই অপমানের জন্য সে বিদ্যুতের উপর অসহ্য বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল।

যখন বিদ্যুৎ মারা গেল তখন কিছুদিন সংসার করিয়াই শিশির বুঝিল যে একর্ম্ম বেটাছেলের নয়—বিশেষ করিয়া তাঁর মত বেটাছেলের। বিদ্যুৎ এ কুড়ি বৎসর তাঁর সংসার এমন সৌষ্ঠবের সহিত চালাইয়া সংসারের সকল চিন্তা হইতে তাঁকে এত পরিপূর্ণরূপে মুক্তি দিয়াছিল যে সংসার চালাইবার শক্তি শিশিরের যাহা ছিল তাহাও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই ছয়মাস কাল বিদ্যুৎশূন্য সংসার পরিচালন করিয়াই শিশির ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া শেষে সে উমাকেই আবার সংসারে আনা স্থির করিল। সে আসিলে সংসারটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিবে, আর উমা দিলীপকে দেখাশুনা করিতে পারিবে। তা ছাড়া রমেন আসিলে দিলীপের একজন সঙ্গী জুটিবে। তাতে সে থাকিবে ভাল। তাই উমা আসিয়া সংসারে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এবার উমার চেহারা ফিরিয়া গেল। এখন বৌদিদি নাই, কাজেই হিংসার প্রধান হেতু নাই। দাদা সংসারের সমস্ত ভার তার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কাজেই সে যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে। সুতরাং তাহার মেজাজ অনেকটা নরম হইয়া গেল।

উমার এ সংসারে এখন বেশ চলিতেছিল,কেবল গোল লাগিল বাড়ীর পুরাতন ঝি মালতীকে লইয়া। মালতী দিলীপ জন্মাইবার দুই বছর আগে

হইতে বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে ছিল এবং দিলীপকে মানুষ করিতে তার বাপমা'র যত্নের চাইতে তার যত্ন ও চেষ্টা কম ছিল না। বিদ্যুৎ মারা যাইবার পর হইতে সে-ই খোকাবাবুর খাওয়া দাওয়াটা দেখিত। উমা আসিয়া যেদিন দুধের পুরু সরটি তুলিয়া নিজের ছেলেকে খাওয়াইল এবং তার তলার দুধটুকু দিলীপকে আদর করিয়া খাইতে দিল, সেদিন মালতী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, পিসীমা তুমি একি ক'রলে ?"

তার পর যেদিন মালতী দেখিল যে দিলীপের জন্য দুখানা কাঁটার মাছ পড়িল এবং মুড়াটা পেটিটা খাইয়া রমের স্কুলে গেল, সেদিন সে উমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ঠাকুরকে খুব খানিকটা ধমকাইল।

এই রকম ব্যাপারে উমা একটু থমকিয়া গেল, কিন্তু একেবারে ভড়কাইল না। এখন হইতে সে রমেনকে খাওয়ান বিষয়ে একটু সাবধান হইল—অর্থাৎ তাহার জন্য ভাল ভাল জিনিষ তাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া খাওয়াইত। কিন্তু ইহাতেও সে মালতীর হাত হইতে নিস্তার পাইল না। মালতী একদিন শেষে অত্যন্ত শান্তভাবে উমাকে বুঝাইল, "হাঁ দেখ, পিসীমা, এমন ধারা কেন কর বল দিকিনি। ওই দুধের বাছা, মা-মরা, ওর পেট শুকোও কেন ? তোমার ছেলেকে যা, খাওয়াতে মন চায় খাওয়াও না, বাবু তো আর তা বরণ ক'রতে আসেন না। তার জন্য খোকাকে বঞ্চিত ক'রে কি দরকার ?"

উমা এ শান্ত উপদেশ হজম করিতে পারিল না। সে খুব কড়া কড়া কথায় ছোট লোকের বেটীকে মুখ সামলাইয়া কথা কইতে বলিল এবং প্রকাশ করিল দিলীপ তার ভ্রাতুষ্পুত্র, তার চেয়ে একটা মাইনা করা ঝি হইয়া যেন সে বেশী দরদ দেখাইতে না আসে—মার চেয়ে মাসীর দরদ —ইত্যাদি !

শ্রীমতী মালতী দাসী ইহার উত্তরে বিরাশী সিক্কার ওজনে শক্ত

শক্ত কথা বলিয়া গেল এবং ক্রমে উমাকে সাশ্রু নয়নে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইল।

যখন শিশির বাবু আফিস হইতে ফিরিলেন তখন উমার রাগের আবেগটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। রাগের প্রথম ঝোঁকটায় সে স্থির করিয়াছিল যে দাদা আসিলেই সে মালতীর নামে তাঁর কাছে লাগাইবে এবং তাকে বিদায় করিতে বলিবে। কিন্তু এখন সে বুঝিল এরূপ করিলে মালতীও ছাড়িয়া কথা কহিবে না। তাহা হইলেই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গা হইবে। এবং তার মনে হইল যে উপস্থিত ক্ষেত্রে দাদা মালতীর কথাটাই হয়তো বিশ্বাস করিবেন। সুতরাং সে আপাততঃ চাপিয়া গেল। এবং সম্প্রতি খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে মালতীর উপদেশই অনুসরণ করিল!

কিন্তু মালতীর মাথাটা যে চিবাইয়া খাইতে হইবে সে বিষয়ে তার সঙ্কল্পের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। এই ব্যাপারের দশ পনের দিন পর সে শিশিরের কাছে কথা পাড়িল যে এতগুলো চাকর বাকরের মধ্যে আবার একটা ঝি রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শিশির হাসিমুখে বলিল, "না—ও থাক, দিলীপকে ও মানুষ ক'রেছে।"

উমা বলিল, "কিন্তু ও যে চোর! আমি এত চোখ রাখি, তবুও যে কোথা থেকে কেমন ক'রে সব জিনিস সরায় বুঝতে পারি না।"

এ কথায়ও শিশির বাবু টলিল না দেখিয়া উমা আপাততঃ কথাটা স্থগিত রাখিল।

সে স্থির করিল এ পথে চলিলে হইবে না। মালতীকে দূর করিতে হইলে প্রথমে দিলীপকে হাত করা চাই এবং তার মনটা মালতীর উপর চটাইয়া দিয়া তার মারফতে শিশিরের কাছে মালতীকে বরখাস্ত করিবার আবেদন পেশ করিতে হইবে। তা ছাড়া মালতীর পেঁটরার ভিতর চোরাই মাল ঢুকাইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে হইবে।

এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কিছুদিন সময় লাগিবার কথা। দিলীপকে পটানো বড় সোজা কথা নয়। সে একটা ভয়ানক দুরন্ত ছেলে ;—ঘরে থাকে কম, পড়াশুনার সময় ছাড়া দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানই তার স্বভাব। সুতরাং তাকে বাগানো বড় সহজ নয়। সে নানা রকম করিয়া দিলীপকে অপরিসীম স্নেহ দেখাইয়া তাহাকে কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দিলীপের মন সহসা তাহাতে গলিল না। উমা তাকে ছোট ছেলের মত আদর সোহাগ করিতে যাইত, তাকে চুমা খাইবার চেষ্টা করিত—তাতে দিলীপ বিরক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইত। এরকম আহ্লাদ নেওয়া কোনও দিনই তার ভাল লাগিত না ; বিশেষ বারো বছর বয়সে যে তাকে কেউ চুমা খাইবে এ তাহার অসহ্য ছিল।

কিন্তু উমা তাহাকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং অনেক গবেষণার ফলে দিলীপের মনোদুর্গের একটা গোপন চাবী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

দিলীপ সাধারণতঃ গল্প শুনিতে ভালবাসিত। উমা খুব ভাল গল্প করিতে জানিত না, তার পুঁজিও সামান্য ছিল। তাই সে একদিন তার দাদার ছেলে বয়সের কথা গল্প করিতে লাগিল। সে দেখিয়া আনন্দিত হইল যে এ বিষয়ে দিলীপের কৌতূহল ও আগ্রহের অন্ত নাই !

এই সূত্র ধরিয়া পিসীমার সঙ্গে দিলীপের আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। সে দিনের পর দিন বসিয়া পিসীমার কাছে তার বাপের ছেলেবেলার কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিতে লাগিল। এক একটা কথা দশবার কুড়িবার শুনিয়াও তার আশ মিটিত না। সে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিত। এ কথার আলোচনায় তার যে আনন্দ তার তুলনা ছিল না।

এই সূত্র ধরিয়া উমা সাবধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং

আনন্দের সহিত দেখিল যে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতভাবে দিলীপ তার হাতের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। তার পর সে একটু একটু করিয়া দিলীপের মনে মালতীর উপর বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এ কাজটা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া মনে হইল। তবু উমা একেবারে নির্ভরসা হইল না। দেড় বছর কাটিয়া গেল, উমা তবু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না।

যখন সে মনে করিল যে সফলতা তার প্রায় করায়ত্ত সেই সময় এক ফুৎকারে তার সব সঙ্কল্প ওলট পালট হইয়া গেল।

২

শিশিরের এক বন্ধু ছিল হাইকোর্টের উকীল। শিশির তার বাড়ীতে প্রায় যাইত। প্রায়ই শনি রবিবারে হয় সে কলিকাতায় যাইত না হয় তার বন্ধু বিনোদবাবু হুগলী আসিতেন। দিলীপ প্রায়ই সঙ্গে থাকিত, উমা আসিবার পর দিলীপ বেশী থাকিত না। বিনোদের বাড়ীতেই শিশিরের একদিন হঠাৎ মিনতির সঙ্গে দেখা হয়। মিনতি বিনোদের ছোট শালী।

মিনতির রঙ ফরসা নয়, বেশ ময়লা। তার মুখখানিও এমন কিছু ভয়ানক প্রশংসা করিবার মত নয়—কিন্তু তার চোখ দুটি ছিল আশ্চর্য্য। অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কমনীয়তাময় সে চক্ষু—অথচ উজ্জ্বল তীব্র, প্রতিভাময়।

যখন শিশির হঠাৎ বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া ঢুকিল তখন সে দেখিতে পাইল একটী মেয়ে বিনোদের পাশে বসিয়া Tennysonএর In Memoriamএর একটা অংশ বুঝিতেছে। সে ঘরে ঢুকিতেই মিনতি একটু লজ্জিত হইয়া চোখ দুটি নত করিল, কিন্তু খুব ভয়ানক এমন কিছু জড়সড় হইয়া গেল না। লজ্জিত হইয়া শিশির পিছাইয়া গেল।

বিনোদ ডাকিল, "আরে এস ভায়া এসো, এ কিছু বাঘ সিংহ নয়—এ কেবলমাত্র শালী—অর্থাৎ আমার। এঁর নাম মিনতি—বাপ মায়ের নাম রাখবার সাধারণ ভুলের একটা সামান্য পরিচয়! কেননা মিনতি করা এঁর স্বভাবই নয়, ইনি করেন হুকুম। আর সে হুকুম জজসাহেবদের হুকুমের চেয়ে অনেক কড়া। সেই কড়া হুকুমের চোটে আজ আমার ভারী ভারী ব্রিফ ফেলে এঁকে In Memoriam বুঝাতে বসেছি।"

মিনতি একটু হাসিয়া বলিল, "এখন তবে থাক।"

শিশির বলিল, "মাপ ক'রবেন। আমি আপনার কাজে বিঘ্ন হ'তে চাই না। আমি অনেকক্ষণ থাকবো। আপনি আপনার কাজ সেরে নিন। নইলে আমাকে অপরাধী ক'রবেন।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তোমার কি বাহাত্তুরে ধ'রেছে নাকি হে। এইটুকু মেয়েকে আপনি বলতে ব'সেছ—আর সে হ'চ্ছে গিয়ে আমার শালী—তোমার বোনের ধাক্কা।"

"চুপ বেয়াদেব!" বলিয়া শিশির বিনোদের পিঠে একটা চড় লাগাইয়া দিল। "এখন তুমি তোমার চাকরী ক'রবে নাকি কর," বলিয়া ঘরের অপর কোণে গিয়া শিশির একখানা ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিল।

মিনতি অনিন্দ্য উচ্চারণের সহিত তার কোমল মধুর কণ্ঠে পড়িয়া গেল

This truth came borne with bier and pall
I knew it when I sorrowed most,
It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

বিনোদের ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, সে এই চারটি লাইনের ব্যাখ্যা করিয়া আর দুদশটী কবির দুচারটে বাক্য উদ্ধার করিয়া এ পদের অর্থ ও মাধুর্য্য প্রকট করিয়া গেল।

মিনতি বলিল, "বুঝতে পারলাম না মুখুজ্জে মশায়, ভালবেসে হারালে কষ্ট হয়, না-ভালবাসলে কষ্টটা হয় না। তবে ভালবেসে হারানটা, না-ভালবাসার চেয়ে ভাল কেমন ক'রে হ'ল?"

"কবির তাৎপর্য্য হ'চ্ছে এই যে ভালবাসাটাই চিত্তের পক্ষে একটা মস্ত লাভ, আত্মার একটা মস্ত অভ্যুদয়। তার সঙ্গে পাওয়া না পাওয়ার যেমন কোন সম্বন্ধ নেই, তেমনি সে লাভের হিসাবে,ভালবাসার জিনিসকে

হারান না হারান'র, কোনও সম্বন্ধ নেই। ভালবাসাটাই লাভ—সেইটাই একটা জীবনের গৌরব। সেই গৌরবের আনন্দ তার সার্থকতা সেইটাই একটা মস্ত লাভ। যদি ভালবাসার বস্তু থাকে সেটা মস্ত আনন্দ, মস্ত লাভ। তাকে হারান একটা মস্ত লোকসান ; কিন্তু হারালেও প্রাণের যে অভ্যুদয়ের আনন্দ সেটা থেকে যায়।"

মিনতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা আমার বোধ হ'চ্ছে কবির এ ভাবের সঙ্গে তাঁর আর একটা ভাবের একটু সম্পর্ক আছে।"

One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name.

কিম্বা

Better an hour of Europe. than a cycle of Cathay

ভালবাসা যে কটা দিন পাওয়া যায় সেই কটা দিন গৌরবের দিন— সেই কটা গৌরবের দিনের জন্য লোকসানটাও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। তাই নয় কি ?"

সমস্তগুলি কথা শিশির সমস্ত চক্ষু কর্ণ দিয়া গিলিতেছিল।

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

এই নিদারুণ সত্য যে তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফল। বিদ্যুৎকে হারাইয়া তারও মনে অনেকদিন এমনি কথাই জাগিয়া উঠিয়াছে। কতদিন সে ভাবিয়াছে। যদি সে কোনও দিন বিদ্যুৎকে না পাইত, যদি কোনও দিন ভাল না বাসিত! অমনি মনটা আঁৎকাইয়া উঠিত। সেটা এত বড় সর্ব্বনাশ হইত—এত বড় নিদারুণ ক্ষতি, জীবনের এমন একটা শূন্য নিরর্থকতা—যে তার চিন্তাতেও তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। তখন বার বার টেনিসনের এই দুইটী লাইন

তার মনে উঠিয়াছে। অনেকবার সে মনে মনে এই কথার আবৃত্তি করিয়াছে।

কিন্তু এই দুটি লাইনের মিনতির মুখে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া তার একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের অনুভূতি হইল। এ দুইটি চরণের ভিতর যে এত অপরূপ রস আছে সেটা কোনও দিনই শিশির উপলব্ধি করে নাই। ছাপায় গান পড়িয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, সুকণ্ঠে গীত হইলে তার মাধুর্য্য শতগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। তেমনি কবিতারও ভালরূপে আবৃত্তি হইলে তার রস-সমৃদ্ধি বিকশিত হইয়া উঠে। একথা চিরপরিচিত। কিন্তু সেই পুরাতন সত্যটা শিশির আজ এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিল যে পূর্ব্বে সে কখনও ইহা সত্য সত্য আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া তার এখন মনে হইল না। মিনতির অপূর্ব্ব মাধুরীমাখা কণ্ঠের প্রত্যেকটি সুর গিয়া যেন তার অন্তরের কোমলতম পরদায় আঘাত করিল এবং সমস্ত অন্তর একটা অপরূপ রসানুভূতিতে ভরিয়া দিল।

তার পর সে অবাক হইল মিনতির ব্যাখ্যায়! এ মেয়েটি যে শুধু কলেজের পড়া তৈয়ার করিবার জন্য কবিতা পড়ে না,তার রস অন্তর দিয়া গ্রহণ করে ইহা দেখিয়া শিশির ভারি তৃপ্তি অনুভব করিল। আর সে রসানুভূতি যে কত গভীর, তার উপর যে কেমন একটা তাজা মনের ছাপ আছে, তা ভাবিয়া সে মুগ্ধ হইল। আর সেই অনুভূতির ব্যাখ্যান তার সুললিত কণ্ঠে যেন সহস্রগুণ মধুময় হইয়া ফুটিয়া উঠিল। বিস্ময় শ্রদ্ধা ও পুলকে শিশিরের অন্তর ভরিয়া গেল। সে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া একদৃষ্টে মিনতির একাগ্র তন্ময় মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার মনের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল যে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা বা অবসর রহিল না।

বিনোদ বলিল, "হাঁ, ও রকম করেও নিতে পার কথাটা। Love life

জিনিসটারই একটা সার্থকতা, একটা গৌরব আছে—সেটা সফল হউক বা নিষ্ফল হউক, এইটাই কবির প্রতিপাদ্য।"

মিনতির দৃষ্টি বই হইতে সরিয়া যেন কোন্ সুদূর শূন্যে নিবদ্ধ হইয়া গেল! সে কতকটা আবিষ্ট হইয়া বলিল, "শুধু Love life নয়, জীবনের প্রত্যেক সার্থক অনুভূতি সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা সত্য। ভালবাসা বলুন, ধর্ম্মানুভূতি বলুন, দেশাত্মবোধ বলুন, সৌন্দর্য্যবোধ বলুন, সবগুলি অনুভূতিরই এমন এক একটা মহামুহূর্ত্ত আসে যখন মনে হয় যে তারই ভিতর সমস্ত জীবনের সব দিনের চেয়ে বড় একটা অনুভূতি, একটা নিবিড়তর গভীরতর জীবন যেন হঠাৎ বিরাট হ'য়ে প্রকাশ হয়—তখন মনে হয় যে আমাদের রোজকার জীবন যেন একটা mere existence। বোধ হয় একথা সত্য যে We live in moments and not in the days and years.

"বাঃ! Beautiful thought! যাও—এখন তোমার এই অনুভূতিটা তাজা থাকতে থাকতে একটা কবিতা লিখে ফেল গে।"

"কিন্তু Wordsworthএর এই লাইন কটা"—

"এখন নয়! এখনকার মত এই একটা মহামুহূর্ত্তই যথেষ্ট"—

"না আমার ঘোধ হ'চ্ছে, এখন ওর মানে আমি বুঝেছি—

The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream.

এর মানে হ'চ্চে বোধ হয় এই যে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করি সেটার মূল্যের চেয়ে তার ভিতর আমরা যে অর্থ ও সৌন্দর্য্য ভরে' দিই সেইটাই হ'ল বড়। Love life জিনিসটার ভিতর বাস্তব প্রেম সম্বন্ধের উপর যেমন একটা consecration and the poet's dream যোগ ক'রে দিয়ে আমরা তাকে গৌরবময় ক'রে দিই, সব জায়গায়ই বোধ হয় তাই। রূপ

গৌরব প্রভৃতি জগৎ থেকে আমরা যা পাই তার চেয়ে তার ভিতর আমরা যেটা আমাদের অন্তর থেকে দিই সেইটাই বড় জিনিস, তার ভিতরই তার সার্থকতা।"

"বস্, তবে আর তুই আমার কাছে কবিতার মানে জিজ্ঞাসা ক'রতে আসিস কেন বল দিকিনি? তুই জন্মেছিস্ কবি হ'য়ে, আর, 'কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি'। ফের যদি তুই আমার কাছে কবিতা বুঝতে আসবি তো ঠেঙ্গাবো। কাণ্ট বা হেগেল বুঝতে হয় তো আসিস।"

"না মুখুজ্জে মশায় আপনার কাছে না এলে এসব কথা আমার মনে আসে না। আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে ক'রতে যেন আমার মনের অনেকগুলো দুয়ার খুলে যায়।"

"বন্ধ কর, বন্ধ কর! যার তার কাছে অমন হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাওয়া ভালো নয়। তোর দিদি শুনলে হয়তো খেঙরা হাতে ক'রে আসবে।"

"যান, আপনি কি যে বলেন তার ঠিকানা নেই।"

লজ্জায় মিনতির মুখখানা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। এতক্ষণে তার মনে হইল যে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরে বসিয়া আছেন। তাই সে আরও বেশী লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং সে শিশিরের দিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল শিশির একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে চাহিতেই শিশির চক্ষু নত করিল। দেখিয়া মিনতি একেবারে রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বই গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদ বলিল, "না—মিথ্যে বলিনি ভাই—তোর দিদি বড় হিংসুটে—তোর হৃদয় দুয়ার আমার কাছে এলে অত চট্ পট্ খুলে যায় শুনলে হয়তো এ বাড়ীর দুয়ার তোর কাছে একদম বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখন তোর খিলটিল গুলো বেশ ক'রে এঁটে রাখ। যার জন্যে খোলা

দুয়োরের দরকার হ'বে সে এলে সবগুলো দোর জানালা আলগা ক'রে দিস।"

"যান্ আপনি ভারি দুষ্টুমী করেন।" বলিয়া মিনতি অপূর্ব্ব লীলাছন্দ রচনা করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

বিনোদ গিয়া শিশিরের কাছে একখানা চেয়ার লইয়া বসিল!

শিশির বলিল, "তোমার এই শালীটি কি পড়েন বিনোদ?"

"দেখ, তুমি অমন শালী শালী ব'লো না, হয় তো মিনতি চ'টে যাবে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি আমার সঙ্গে এই সম্পর্কটায় খুব বেশী গৌরব বোধ করে না।"

"তাই নাকি! যাক, উনি কি পড়েন?"

"উঁহু—ওটাও চলবে না। 'ও' এবং 'উনি' এই দুটি সর্ব্বনাম যে ওর সম্বন্ধে প্রয়োগ ক'রবে সে অবশ্যই একদিন আসবে, কিন্তু তাকে আমি অন্ততঃ প্রথম প্রথম খুব আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন ক'রবো না—আমারও এক আধটুকু হিংসে আছে।"

"এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও হিংসা ক'রে লাভ? পক্কে বিল্বে কাকস্য কিম্?"

"প্রথমতঃ আমার চুয়াল্লিশ এখনও পূর্ণ হয় নি, সুতরাং আমি পঁয়তাল্লিশ নই। দ্বিতীয়তঃ কোনও বাবদেই আমি কাকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পছন্দ করি না।"

"হার মানলুম ভাই। এখন বাজে বকা ছেড়ে আমার কথাটার জবাব দেবে কি?"

"কেন সেটা কি তোমার কাছে খুব কাজের কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নাকি? ঘটকালি ক'রবো? কিন্তু তাও বলি, তোমারও বয়স তো আমার কাছাকাছিই। বেলই যদি সে হয় তবে তুমিও তো কাক।"

"চুপ কর! যা' তা বকো না। আমি সে কথা বলছি না। আমি ভাবছিলাম সে তোমার শালীটি একটি genius! এ বয়সের মেয়ের ভিতর কাব্যের এমন নিবিড় রসানুভূতি বা এমন গভীর চিন্তাশীলতা আমি কখনও দেখি নি।"

"এই রকম কথা আরও দু'চারজন বলে। কিন্তু ও সব কিছু নয়। স্ত্রীজাতির ভিতর বিশেষতঃ ওদের পরিবারে রসের ধাতটা কিছু প্রবল।"

"তাই নাকি? তা'হলে তোমার গিন্নীরও রসের ভাণ্ডার খুব পূর্ণ।"

হাঁ, তবে একটু ভিন্ন রকমে—তাঁর রস হাতে পায়ে বাত হ'য়ে ফুটে বেরিয়েছে।"

"দূর পাপিষ্ঠ! যা'ক তোমার স্ত্রীর এই ভগ্নীটি কিন্তু অসাধারণ! তুমি তাঁকে কবিতা লিখতে encourage ক'রো।"

"ওরে বাপরে! তা'হলে সর্ব্বনাশ হ'বে। বিনা উৎসাহে ও পাঁচখানা মোটা খাতা শেষ ক'রেছে! আমি যদি উৎসাহ দি, তাহলে ওর যে স্বামী হ'বে তার ছাপাখানার খরচ দিতে দেউলে' হ'তে হ'বে।"

"তাই নাকি? আমাকে দিও তো ওঁর একখানা খাতা, আমার ভারি কৌতুহল হ'চ্ছে ওঁর কবিতা দেখতে।"

"সে কৌতূহল সহজেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে। কেননা ওর একখানা খাতা আমি জবর দখল ক'রে রেখেছি।" বলিয়া বিনোদ উঠিল।

শি। "কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার প্রথম কৌতুহলটা পরিতৃপ্ত ক'রবার একটা চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।"

"কোনটা? ও মনে হ'য়েছে। ও কি পড়ে? ওর মতলব এই বারে বি-এ দেবার। কলেজে ও যায় আসে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে কলেজের মাষ্টাররা ওকে যা পড়ায় তার চেয়েও ঢের বেশী জানে।"

"এ সন্দেহ অমূলক ব'লে মনে হ'চ্ছে না। কিন্তু তোমার শ্বশুর তো দেখছি ভারি liberal—মেয়েকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।"

"ওরে হতভাগ্য, সে কৃতিত্বটা যথাস্থানে আরোপ ক'রতে তোর এত কি কষ্ট? আমার শ্বশুর ম'শায়ের এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু আমি একরকম জোর ক'রে ওকে তুলে আটকে রেখেছিলাম। তারপর ওর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে আমার বড় শালাও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো! শ্বশুর ম'শায় তার পর স্বর্গারোহণ ক'রলেন। এখন আর বাধা দেবার কেউ নেই। তা' ছাড়া আর একটা সুবিধা হ'য়েছে এই যে 'ওর বিয়ে হ'চ্ছে না। সম্বন্ধের জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণ বাড়ীতে ঘটক ঘটকীর হাট বসিয়েছেন, কিন্তু বাঙ্গলার বর গোষ্ঠীর তাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার কোনও তাড়া দেখা যায় না। যে দেখতে আসে সেই ওর রং দেখে মুখভার ক'রে মিষ্টি খেতে সুরু করে।"

"বাঙ্গালা দেশটা কি আগাগোড়াই এত আকাট মূর্খে ভরা!"

"এ সম্বন্ধে আমার একটা নিজস্ব মত আছে—সেটা ঠিক তোমার সঙ্গে মেলে না। যারা ওকে না-পছন্দ ক'রছে তারা বুদ্ধিমান ব'লে আমার বিশ্বাস।"

"তোমার এ বিশ্বাসের জোরকে খুব বাহাদুরী দিতে হয়।"

"মোটেই না। লোকে বিয়ে করে ঘর সংসার করবার জন্য। একটা জ্যান্ত কবিতা নিয়ে মাছের ঝোল রান্না কিম্বা বাজার হিসেব লেখানো যেমন অসম্ভব, তেমনি বেহিসাবী অপচয়। কেন না কবির চেয়ে পাকা রাঁধুনীর হাতের ঝোল ভাল হ'বে, এবং হিসাবের খাতায় কবিতার খসড়া না থাকলেই সেটা মানাবে ভাল। অথচ কবির পক্ষে মাছের ঝোল ও হিসাবের খাতাটা নিতান্তই শক্তির অপচয়।"

"Confounded materialist! যাক তোমার কাব্যের খাতা আমদানী কর।"

বিনোদ খাতাখানা আনিয়া কয়েকটা কবিতা পড়িয়া শুনাইল। তার পর শিশির সেটা তার কাছে ছিনাইয়া লইল। খাতাখানা খুব সুন্দর বাঁধান। তার রেসমের মোড়কের উপর সিল্ক দিয়া ফুলপাতার ভিতর নাম লেখা। আর ভিতরে মুক্তার মত সুন্দর হরূপে লেখা কতকগুলি অপূর্ব্ব কবিতা। অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশির সে কবিতাগুলি পড়িয়া গেল! যতই পড়িল ততই সে মুগ্ধ হইল।

অনেকক্ষণ পর খাতাখানা পাশে রাখিয়া শিশির বলিল, "আচ্ছা ভাই দিলীপের কি উপায় করি বল দেখি, তাকে আর বাড়ীতে রাখতে মন সরে না।"

"কেন বল দিকিনি ?"

"কথাটা বড় রূঢ়, কিন্তু ব'লতেই হ'চ্ছে। বাড়ীর প্রভাবটা তার উপর ভাল হ'চ্ছে না। উমাতে আর ঝিতে মিলে তাকে নিয়ে যে রকম টানাটানি আরম্ভ ক'রেছে, তাতে তার পরকাল খোয়া যাচ্ছে। ওদের হাতে থাকলে ওর ভিতর পৌরুষ কোনও দিনই গড়ে উঠবে না।"

"তাদের বিদেয় ক'রে ওর জন্য একটা ভাল মাষ্টার রেখে দেও। তার বয়স তো বছর বার তের হ'ল—এখন ওর পক্ষে মেয়ে ছেলের হাতে মানুষ হবার বয়েস নয়।"

"কিন্তু তাতে তার খাওয়া দাওয়ার ভয়ানক বেবন্দোবস্ত হয়। আমি কিছুদিন সংসার ক'রে দেখেছি, সে বড় সুবিধা হয় না।"

"বেশ তো, একটা ভাল দেখে সরকার রাখ, না হয় মাষ্টারটিকেই এমন রাখ যে ওর সব দিক দেখতে পারে।"

"সে লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হ'বে। আমার মনে হ'চ্ছিল ওকে যদি বিলেতের মত কোনও public schoolএ পাঠাতে পারতাম তবে বোধ

হয় ভাল হ'ত। আচ্ছা Hastings House স্কুলটা কেমন? তোমার কিছু জানা শোনা আছে?"

"না ভাই ও বড় মানুষের স্কুলের খবরাখবর বড় রাখিনা। বাহিরে থেকে যা শুনতে পাই সে বড় সুবিধা নয়। কিন্তু সে সব রিপোর্টের উপর আমার বড় আস্থা নেই। কেন না আমাদের দেশের পোনের আনা লোক শিক্ষা সম্বন্ধে খাঁটি up-to-date ideas মোটেই বুঝতে শেখেনি। যা কিছু নূতন তাই তাদের কাছে নিন্দনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়।"

"আমি ভাবছি আজ একবার স্কুলটা দেখে আসি। চল না—তুমিও চল।"

সেদিন বিনোদের সুবিধা হইল না। পরের দিন যাইবার সঙ্কল্প স্থির হইল।

তার পর শিশির আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শালীটি কি—"

"Dash it! আবার শালী! ও মিনতি, দেখ ভাই, এ ছোকরা তোকে অপমান ক'রছে। আমার কোন দোষ নেই ভাই।"

"চুপ! তুমি একটা এক নম্বরের শয়তান! থাকগে, ওই মহিলাটি কি তোমার এই খানেই আজকাল থাকেন।"

"না, তিনি পিত্রালয়ে বাস করেন। তিনি আপাততঃ নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ায় ক'য়েক দিনের জন্য আমার কুটীর ধন্য ক'রেছেন। তার ভা'য়েরা দেশে গেছে। পরীক্ষা সন্নিকট ব'লে উনি দেশে যেতে নারাজ।"

"ওঃ" বলিয়া শিশির অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শেষে চা পান করিয়া যখন শিশির উঠিল তখন রেসমে বাঁধান খাতাখানা সে হাতে করিয়া চলিল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল "একি! দিনে দুপুরে ডাকাতি! না বলিয়া পরদ্রব্য লইলে চুরী করা হয়।"

"সেওয়ায় পুস্তকাদি" বলিয়া শিশির খাতাখানা চাপিয়া বগলদাবা করিল। "কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সাতরাজার ধন মাণিক-খানা অপহরণ ক'রবো না। পড়ে' ফেরত দেবো।"

বাড়ী ফিরিবার পথে শিশির ট্রেণেই খাতাখানা আদ্যোপান্ত দুইবার পড়িয়া ফেলিল। কবিতাগুলি তাহাকে মুগ্ধ করিল। তার মনের ভিতর প্রত্যেক কবিতায় গভীর ভাবের ধারা সঞ্চারিত হইল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িত্রীর কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে তার অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিত হইল।

হঠাৎ তার অনুভব হইল যে এ কথা ভাল নয়। মনে হইল সে মিনতির কথা যে ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সে বিদ্যুতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। বিদ্যুতের কথা মনে হইতেই তার মনটা কান্নায় ভরিয়া গেল। সে অত্যন্ত অনুতপ্ত করুণ চিত্তে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া দিলীপকে সে ডাকিয়া কাছে লইল এবং অনেকক্ষণ তাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া অন্তর শান্ত করিল।

তার পর মনে হইল যে তের বছরের ছেলেকে লইয়া এমন ভাবটা করা তার ভিতর পুরুষত্বের সম্যক স্ফুরণের অনুকূল নয়। সে উমা ও মালতীর দোষ দিয়াছিল। কিন্তু এখন তার মনে হইল যে সে নিজেও ছেলেকে খুব ভাল শিক্ষা দিতেছে না।

দিলীপকে Hastings schoolএ পাঠান স্থির করিয়া সে পরের দিন কলিকাতায় গেল।

৩

মিনতির বাবা অনেক টাকা রোজগার করিতেন। তাঁর বড় দুই মেয়ে সুমতি ও প্রণতির বেশ ভাল বিবাহ দিয়াছিলেন। বড় দুই ছেলেকেও বিবাহ দিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তার পর তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং কয়েক বৎসর পর মিনতির বয়স যখন তের বৎসর তখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর মিনতির দুই দাদা বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই, ভাইদের রোজগার যৎসামান্য, তাহাতে কোনও মতে কষ্টে স্বষ্টে সংসার চলিতে লাগিল। কর্ত্তা থাকিতে দাসদাসীর বাহুল্য ছিল, এখন সে পাট উঠিয়া গেল। দুই বউ দিনরাত খাটিয়া সংসারের কাজ করে, মিনতি স্কুলের পড়া করে, আর দুই ভায়ের ছেলে পেলে রাখে। ছোট ছোট ছেলেপেলের উপর মিনতির বরাবরই টান ছিল। সে যখন খুব ছোট তখনি সে সুমতির ও প্রণতির ছেলেপেলেদের টানাটানি করিত। সাত বছরের মেয়ে, তার সাধ ছিল ছোট ছেলেটি লইয়া ঠিক দিদিদের মত বেড়াইবে, তাকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইবে, ঘুম পাড়াইবে ; এমনি সব পাকা কাজ করিবে। যখন তার নয় বছর বয়স তখন তার বড়দির খোকা হয় ; তখন সেই ছেলেটাকে সে একেবারে দখল করিয়া বসিল। ছেলে একটু কাঁদিলে সে যেখানে থাকুক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে শান্ত করে, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে তাকে কোলে পিঠে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; পড়াশুনা করে, তাও খোকার পাশে বসিয়া। মিনতির কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সকলেই হাসিত। বড় বৌ যদি কখনো ছেলেকে একটু ধমকাইতেন বা কাঁদাইতেন তবে অমনি মিনতি আসিয়া তাহাকে বকিতে আরম্ভ করিত

এবং প্রায়ই টানাটানি করিয়া ছেলে কাড়িয়া লইত। বড় বৌ হাসিয়া বলিতেন "এত সোহাগ দেখা যাবে, নিজের ছেলে হলে। তখন আর এত আদর থাকিবে না।"

মিনতি এ কথায় আগে বলিত "আচ্ছা দেখে নিও" কিন্তু যখন সে একটু বড় হইল তখন সে এ কথায় লজ্জা পাইয়া কেবল বৌ দিদিকে মারিতে যাইত।

এমনি করিয়া পর পর চারটি ছেলেকে সে মানুষ করিতে লাগিল। একটি কি দুইটি ছেলে সর্ব্বদাই তার সঙ্গে থাকিত। পাশের বাড়ীতে সে যখন তার বন্ধুর সঙ্গে খেলিতে যাইত তখন একটি তার কোলে, আর একটি তার হাত ধরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছে, আর দুইটি সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া লাফাইয়া চলিতেছে। পাশের বাড়ীর গিন্নি বলিতেন মিনতি যেন সাক্ষাৎ মা ষষ্ঠী। যখন ছেলেরা বড় হইল তখন তাদের লেখাপড়া শেখার ভারও অনেকটা মিনতির উপরই পড়িল। তার দাদারা অবশ্য কিছু দেখা শুনা করিতেন, কিন্তু ছেলেদের মিনতির কাছে পড়িয়া যত আনন্দ ছিল তত আনন্দ আর কিছুতেই হইত না। সে এই ছেলে চারটির ভার এমন সম্পূর্ণরূপে লইয়াছিল এবং ছেলেগুলিও তার এমন নেওটা হইয়াছিল যে মিনতির বিবাহের কথা উঠিলেই বড় বৌ ও মেজ বৌ এ কথা বলাবলি করিতেন যে সে শ্বশুরবাড়ীতে গেলে ছেলে কটিকে রাখাই দায় হইবে।

মিনতির মনে বরাবর বিবাহিত জীবনের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সে অনেক সময় মনে মনে স্বামী পুত্র কন্যা পরিবৃত সংসারের কল্পনা করিয়া আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিতে তার মনটা বড় খারাপ হইত।

কিন্তু মিনতির বিবাহ হইল না। তার দাদাদের বেশী গরজ ছিল না,

কেন না মিনতি একটু বেশী পড়াশুনা করে এ বিষয়ে তাদের একটু আগ্রহ ছিল। কিন্তু যখন সতেরো বৎসর বয়সে মিনতি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইল তখন আর তারা স্থির থাকিতে পারিল না। পাত্রের পর পাত্রের সন্ধান হইতে লাগিল কিন্তু মিনতির বিবাহ হইল না। মিনতির পড়াশুনায় বেশ ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিবাহেও তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তা ছাড়া তার বিবাহ লইয়া তার দাদারা বেশ একটু উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন একথাও তার চিত্তকে একটু পীড়া দিত। যখন মেয়ে দেখিতে আসিয়া লোকে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যাইত, তখন তার মন লজ্জা ও অপমানে অস্থির হইয়া উঠিত।

ক্রমে কোনও বিবাহ সভায় যাইতে মিনতি কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তার চেয়ে ছোট ছোট মেয়েদের দলে দলে বিবাহ হইতে লাগিল, অনেকের ছেলে পিলেও হইল, একথা মনে করিতে তার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইত। তার ছোট এক খুড়তুত বোন একটি দিব্য ফুট ফুটে নাদুষ নুদুষ খুকী লইয়া তাদের বাড়ীতে আসিল, মিনতি ছুটিয়া গিয়া খুকীকে বুকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহাকে আদর করিয়া চুমো খাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। সে তার মেজ বৌদিকে বলিল "তোমরা কর কি? এমনি একটা মেয়ে তোমাদের হ'তে পারে না?"

মেজ বৌদি হাসিয়া নিজের পায়ের ধূলা মিনতির মাথায় রাখিয়া বলিল "আমি আশীর্ব্বাদ করছি ঠাকুর ঝি, বছর না যেতে তোমার এমনি একটি খুকী হোক্।"

"তোমাদের আশীর্ব্বাদের ধক্ নেই বৌদি; তিন বছর আশীর্ব্বাদ করে একটি বর জোটাতে পারলে না, তার মেয়ে।"—মিনতি হাসিয়া কথাটা বলিল, কিন্তু মনের ভিতর সত্যই তাহার একটা দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া উঠিতেছিল।

মেজ বৌ বলিল "পোড়ারমুখী বর বর ক'রে ক্ষেপে উঠিছিস একেবারে। লাজ লজ্জার মাথা খেয়েছিস্। বর আসবে গো আসবে।"

"আর আসবে! বয়েসে যে ভাটি পড়ল। নাঃ, তোমাদের দ্বারা কিছু হবেনা। এইবার গৌরীর মত তপস্যা আরম্ভ ক'রব।"

"আর যাই করিস্, ওই কর্ম্মটী করিস নে। তপস্যা ক'রলেই দেবতারা বড় চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন, আর তাড়াতাড়ি একটা যা নয় তা ক'রে বসেন। এই দেখনা গৌরী এত তপস্যা করলে, তার কপালে জুটলো একটা বুড়ো বর। আর আজ কাল যে ছেলে বিয়ের জন্য বড় বেশী ছট্ ফটায় তারি ভাগ্যে জোটে এক এক কালপেঁচা।"

"সেই বুড়ো বরও তো তোমরা জুটিয়ে উঠতে পারছো না বউদি!"

"তোর বরের ভাবনা কি দিদি? তোর কি যেমন তেমন বর হ'লে চলবে? তাই বিধাতা পুরুষ নিজে ইস্তাফা দিয়ে, বিলেতে বর গড়াবার বায়না দিয়েছেন।"

যখন সে মেয়েটির মা মেয়েকে মিনতির কোল হইতে লইয়া চলিয়া গেল, তখন মিনতি মুখে কিছু বলিল না। চুপ করিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইতে লাগিল। সে বড় দাগা পাইয়া অনুভব করিল যে পরের ছেলেকে ভালবাসা কোনও কাজের কথা নয়। দুদিন সুধু তাদের নাড়াচাড়া করা যায়, তার পর যার ছেলে সে লইয়া যায়, পড়িয়া থাকে সুধু বেদনা।

তাই তার অন্তরে একটি নিজস্ব সন্তানের জন্য একটা অস্বাভাবিক বুভুক্ষা ছিল। আপাততঃ তার ছেলে পেলের বিশেষ কোনও অভাব ছিল না। কেন না, বৌদিদিদের ছেলেরা ঠিক্ প্রবল বন্যার মত না আসিলেও, বাড়ীতে ছোট ছেলের অভাবের বড় অবসর দিত না। মিনতি

নয়। আমাদের মত সব রসগ্রাহীর কল্যাণে রবি বাবুরও ভাতে ম'রতে হ'ত যদি না তাঁর বাপ যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতেন এবং কতকটা সেই কারণে, যদি তিনি নোবেল প্রাইজ না পেতেন।

শিশির। আমার মনে হয় যে সেজন্যও বিশেষ কিছু ভাব্‌তে হয় না, যদি বইগুলি এমনি ক'রে বাঁধান হয় আর এমনি ক'রে অটোগ্রাফে ছাপান হয়।

বিনোদ। অর্থাৎ বই যে দামে বিক্রী হ'বে তার তিনগুণ দামে তাকে তৈরী করা হয়। তা' হ'লে বিয়ের সময় উপহার দেবার জন্য বিক্রী হ'তে পারে—তা' তার ভিতরে কিছু থাক বা না থাক।

শিশির। আচ্ছা ভাই তুমি একটা experiment করেই দেখ না। আমার বিশ্বাস, এতে লোকসান হ'বে না।

বিনোদ। না ভাই, আমি সে experimentটা আমার ভায়রা ভাইয়ের জন্যে রেখে দিয়েছি।

মিনতি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কৌতুকভরে বলিল, "কেন মুখুজ্জে ম'শায়? তার উপর আপনার এত অহেতুক শত্রুতা কেন বলুন দিকিনি?"

বি। অহেতুক? তার চেয়ে বড় শত্রু আমার যদি কেউ থাকে তবে—সে তোর দিদি!

মি। আমি দিদিকে ব'লে দেব।

বি। দোহাই মিনু, ঐটি করিস নে। ঠাট্টা বিষয়ে তোর দিদির গম্ভীরবেদিতা একটা মিউজিয়ামে রাখবার যোগ্য, তা জানিস তো।

মি। ও এটা তবে ঠাট্টা! মুখুজ্জে ম'শায় আপনার ঠাট্টাগুলোর গায় লেবেল মেরে দিলে ভাল হয়। নইলে আমরা সব সময় হেসে উঠতে পারি না।

বি। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলে গেছেন "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" ইত্যাদি।

শি। এ কোন্ শাস্ত্রে আছে বিনোদ?

মি। অভাগা শাস্ত্রে, না মুখুজ্জ্যে ম'শায়?

বি। এমন একটা খাঁটি সত্য কথা—আর খাঁটি সংস্কৃত যদি শাস্ত্রে না থাকে তবে শাস্ত্রই অভাগা।

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। যখন শিশির উঠিয়া আসিল তখন তার মনের ভিতর ভীষণ তোলপাড় হইতেছে। তরঙ্গসমাকুল সাগর যেমন একটা ছোট ডিঙ্গিকে নাচাইয়া বেড়ায়, তার সমস্ত সত্তা আমূল আলোড়িত হইয়া তাকে লইয়া তেমনি একেবারে অসহায়ভাবে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। সে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরিল।

সে চলিয়া গেলে বিনোদের স্ত্রী সুমতি আসিয়া বসিল।

স্বামীকে সে বলিল, "স্ত্রীর নিন্দাটা লোকের কাছে ক'রতে বড্ড মিষ্টি লাগে—না?"

বিনোদ। ও সর্ব্বনাশ, তুমি বুঝি আড়িপেতে শুনেছ? তা' কি জান, ওসব একটু ব'লতে হয়। যমের হাত থেকে মৃতবৎসার ছেলেকে বাঁচাতে গেলে তার নাম রাখতে হয় তিনকড়ি এককড়ি বা এমনি একটা কিছু। সৌভাগ্য জিনিষটা এমন ঠুনকো যে তাকে অভাগ্যের চোখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তাকে লোকের কাছে তুচ্ছ ক'রতে হয়।

মিনতি। আপনার বন্ধুটি বুঝি মূর্ত্তিমান অভাগ্য।

বিনোদ। হাঁ ভাই অভাগ্য ও। নইলে ওর অমন স্ত্রীটি মারা যায়।

সুমতি। তা' আর নয়! বিদ্যুৎ তো মানুষ ছিল না, সে ছিল এক দেবতা।

তারপর বিনোদ ও সুমতিতে মিলিয়া বিদ্যুতের কথার সুদীর্ঘ

ইহাদের সব কটির মা হইয়া বেশ আনন্দেই থাকে—এবং মনের তলায় প্রতীক্ষা করে সেই দিনের জন্য যে দিন তার নিজস্ব একটি ছেলে হইবে। এক কথায়, মিনতি মা, হইয়াই জন্মিয়াছিল। শৈশবেই শিশু সন্তানদের ভার পাইয়া তার এই স্বাভাবিক মাতৃত্ব পত্রে পুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

Hastings School দেখিয়া আসিয়া দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিল। তার ভাল মন্দ সব দিক লইয়া নানারকম আলোচনা হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিশির দেখিল, ভালয় মন্দয় ইহার মত সুব্যবস্থা আর কোথাও হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন দিলীপকে এখানেই পাঠান স্থির। তখন সেসন আরম্ভ হইতে চার মাস বাকী। স্থির হইল চার মাস পরেই দিলীপকে পাঠান হইবে।

মিনতির খাতা খানা শিশির সঙ্গে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। ইতি মধ্যে সে তার কয়েকটী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেগুলি সে বিনোদকে দেখাইল। বিনোদ তাহা দেখিয়া চট্ করিয়া মিনতিকে ধরিয়া আনিল এবং তার সামনে সে অনুবাদ পাঠ করিল।

মিনতির মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,কিন্তু লজ্জায় সে মুখ নত করিল। শিশিরও মিনতির সাম্‌নে একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল।

শিশির সঙ্কোচ কাটাইবার চেষ্টায় বলিল, "আপনি এমন সুন্দর কবিতা লেখেন—এগুলো ছাপান না কেন ?"

বিনোদ চট করিয়া বলিল, "সে অপব্যয়টা যে মূর্খ ক'রবে ও সেই হতভাগ্যের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কর্‌ছে।"

মিনতি চটিয়া বলিল, "কেন মুখুজ্জেমশায় আমার কবিতা কি এতই খারাপ যে তা' ছাপাবার যোগ্য নয়।"

বি। রাম বল,ছাপাবার অযোগ্য কিবাঙ্গালা দেশেকিছু আছে ? কিন্তু ছাপলে বিক্রী হ'য়ে ছাপার খরচা উঠবে, এমন কবিতা বাঙ্গালায় আছে ব'লে আমার মনে হয় না। সেটা যে সব সময় কবিতা বা কবিরই দোষ তা

আলোচনা করিয়া গেল। বিদ্যুৎ কবে কোন কাজ করিয়াছিল, কবে কি কথা বলিয়াছিল, তার হাসি কেমন, চলন কেমন, চেহারা কেমন— এই সব লইয়া তন্ময় হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। তার কথা বলিতে বলিতে সুমতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মিনতি আগ্রহের সহিত একাগ্রভাবে সব শুনিয়া গেল। একদিনমাত্র সে বিদ্যুৎকে দেখিয়াছিল। তার সঙ্গে কোনও কথা তার হয় নাই। কিন্তু তার কথা শুনিতে শুনিতে বিদ্যুতের স্বল্পদৃষ্ট মূর্ত্তি মিনতির চোখে সজীব হইয়া উঠিল। তার মন প্রশংসায় ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের তলায় কেমন একটা হিংসা যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তার মনে হইল যে বিদ্যুতের ভিতর যে সব গুণের কথা ইঁহারা আলোচনা করিলেন তার নিজের ভিতর সে সব গুণই আছে—আর তার চেয়ে বেশী আছে তার বিদ্যা। কিন্তু এমন সৌভাগ্য সে হয় তো কোনও দিনই পাইবে না। তার ভিতর যত গুণ আছে সে গুণ সব প্রকাশ করিবার কোনও সুযোগই তার হইবে না! কেন না বিদ্যুৎ সুন্দরী, আর সে কালো, কুৎসিত।

মিনতির নিজের রূপ সম্বন্ধে যা কিছু অভিমান ছিল, তাহা বার বার নানা লোকের না-পছন্দের ফলে আপনার ভিতর পরিপূর্ণরূপে মুশড়াইয়া মরিয়া গিয়াছিল। বরং সে নিজেকে এত ভয়ানক কুৎসিত বলিয়া মনে করিতেছিল যে, তাহা মোটেই সত্য নয়, কেন না, কালো হইলেও তার শ্রীর অভাব ছিল না। আর তার রূপের সকল অভাব আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল তার অপরূপ সুন্দর ঐ চক্ষু! কিন্তু সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া সে আপনাকে ভয়ানক খাটো করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর সে ইহাও স্থির করিয়াছিল যে তার বিবাহ হইবে না। সুতরাং বিদ্যুতের মত স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী হইয়া সে লোক-সমাজে এমন একটা

খ্যাতি কোনও দিনই রাখিয়া যাইতে পারিবে না। তার ব্যর্থ নারী জীবনের এই আশঙ্কা তার চিত্তকে প্রায়ই খোঁচা দিত ; ভগ্নী ও ভগ্নীপতির মুখে বিদ্যুতের গুণ ও তার সুখ-সৌভাগ্যের আলোচনায় তার মনের এ ভাব আজ খুব তীব্র হইয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইহার পর অনেকদিন তার মনে এ কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ জগতে অল্প কয়েক দিনে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে, সবার অন্তরে সে যে স্থায়ী ছাপ মারিয়া গিয়াছে, সেটা তার কাছে পরম লোভনীয় পরিণতি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু কত শত বিদ্যুৎ যে দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনে এ যশ ও সৌভাগ্য অর্জ্জনের সুযোগই পাইল না, সে হিসাব কে করে ? ধর সে নিজে। তার যে গুণ আছে, তাতে বিদ্যুতের মত সুযোগ পাইলে, সে বিদ্যুতের যশ ও প্রতিপত্তি অন্ধকার করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ সে পাইলই না। যদি পাইত—যদি শিশিরের মত ধনবান সুচরিত্র প্রেমময় স্বামীর ঘরণী হইবার সৌভাগ্য তার হইত—তবে সে কি না করিতে পারিত ? তার কল্পনার চোখে কত সম্ভাবনা খেলিয়া যাইত। অনেকক্ষণ সে এই সব কল্পনার উত্তেজনায় ও উপভোগের আনন্দে অধীর হইয়া থাকিত। কিন্তু যখন বাস্তব জগৎ তার দারুণ সত্যনিষ্ঠা লইয়া তার কাছে উপস্থিত হইত, তখন সে প্রাণের গোড়া হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টেনিসন বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থে মনোনিবেশ করিত।

সুমতি বলিল, "হাঁগো, শিশির বাবু আর বিয়ে ক'রবেন না ?"

বিনোদ বলিল, "ক্ষেপেছ ? ও কি বিয়ে ক'রবার লোক ? কি ভালবাসতো ও বিদ্যুৎকে সে দেখেছো তো ! তা ছাড়া ওর বয়স তো বোধ হয় তেতাল্লিশ হ'ল, আর বিয়ে ক'রবে কি ?"

মিনতি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "তেতাল্লিশ! দেখে কিন্তু ওকে ত্রিশের বেশী মনে হয় না। না দিদি?"

সুমতি। তা' ঠিক। উনি যদি আজ আবার টোপর পরে' বে করতে বসেন, তবে কেউ বুড়ো বর বলতে পারবে না। চেহারাখানা তো নয় যেন কার্ত্তিক!

বিনোদ। কি রকম? আমার সামনে ব'সে তুমি অম্লান বদনে অন্য লোকের চেহারার সুখ্যাতি ক'রতে আরম্ভ ক'রলে? কেন আমার চেহারা মন্দ দেখলে কিসে?

সুমতি। শ্রীবিষ্ণু, তুমি তো শিশু কন্দর্প।

মিনতি। minus চুল plus বাঁধান দাঁত।

বিনোদ। অয়ি দুর্ব্বিনীতে, আমার চুয়াল্লিশ বছরের এমন অপমান করিস—কিনা একটু টাক প'ড়ছে আর গোটাচারেক দাঁত প'ড়েছে। আমি তোকে অভিসম্পাত ক'রেছি তোর বরটি হবে আমার চেয়ে বুড়ো! এ অভিশাপ মিথ্যা হ'বে না।

মিনতি। তাতে দোষ কি মুখুজ্জে ম'শায়? তখন আমার বয়সও তো বছর চল্লিশেক হ'বে—তার আগে তো আমার বিয়ে হচ্ছে না।

সুমতি। পোড়ারমুখীর কথা শোন!

বিনোদ। না ভাই অতটা নির্ভরসা হ'স না! তোর কোনও চিন্তা নেই—আমি কথা দিচ্ছি, তোর বি-এ'র গেজেট বের হ'বার একমাস মধ্যে আমি নিজে তোর জন্যে একটা বুড়ো বর খরিদ ক'রে আনবো।

মিনতি। তাহ'লে বীণা হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়ুন দেবর্ষি! সময় বড় সঙ্কীর্ণ, বিরাট বিশ্ব পর্য্যটন ক'রতে হ'বে। কিন্তু মুখুজ্জে ম'শায়, বুড়ো বর যে খুঁজে আনবেন, সে যদি স্বয়ং মহাদেব হ'য়ে বসে তবে আপনার কি উপায় হবে?

"দেখছো গো, বুড়ো বরের নাম শুনেই তোমার বোনটির নোলায় জল পড়েছে। তার মানে আমাকে ওর বড্ড মনে ধ'রেছে। এ অবস্থায় তোমার ওকে বঞ্চিত করাটা কি সঙ্গত ?"

মিনতি। ইস্! আস্পর্দ্ধার আর সীমা নেই। দিদি খ্যাংরা গাছটা এনে দেবো ? যাই নিয়ে আসি।

বলিয়া মিনতি পলায়ন করিল।

৫

ছোট ছোট ব্যাপারের কি বড় বড় ফল হয় তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বিদ্যুতের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে মিনতি অন্তরের গোপন কন্দরে শিশিরকে বররূপে কল্পনা করিয়া তার জীবনের স্বপ্ন গড়িতে লাগিল তা সে নিজেই ভাল করিয়া জানিতে পারিল না। শিশিরের সুদর্শন মূর্ত্তি, তার সুমিষ্ট আলাপ, আর সর্ব্বোপরি তার প্রশংসার ভাষা, মিনতিকে ধীরে ধীরে তার কাছে একেবারে অবনত করিয়া ফেলিল। সে শিশিরকে কায়মনোবাক্যে স্বামীরূপে কামনা করিতে লাগিল। ইহার পর আরও দুই একদিন শিশির বিনোদের বাড়ী আসিয়াছিল—কিন্তু আর একদিন মাত্র মিনতি তার সামনে গিয়াছিল। বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই। তার পর মিনতি নিজের বাড়ী চলিয়া গেল আর অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হইল না।

একদিন মিনতি হঠাৎ দেখিয়া অবাক হইল যে একখানা সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মাসিকে তার কয়েকটা কবিতা তার নাম নিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—তার একটা সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়! দেখিয়া তার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। শিশির সামান্য দুই চারিটি সংযত কথায় তার যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহা তাহার অন্তরে মুক্তার মালার মত গাঁথা হইয়া গেল। সে সযত্নে কাগজ-খানা তার দেরাজের ভিতরে লুকাইল।

ইহার একমাস পর সে বিজ্ঞাপন দেখিল মিনতি দেবীর নূতন কাব্যগ্রন্থ

"লেখা" বাহির হইয়াছে। সেই দিনই পরের ডাকে রেশমের উপর রঙ্গিন ছবিওয়ালা মলাটে সুন্দর করিয়া বাঁধান ছয়খানা বই তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি। শিশির লিখিয়াছেন—

"দেবি, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ধৃষ্টতা করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি ক্ষমা করিবেন। সাহিত্যের এমন অমূল্য রত্ন হইতে জগৎকে বঞ্চিত করিতে দুঃখ হইল বলিয়া বই ছাপিয়াছি।"

মিনতি বই পাইয়া পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে চিঠিখানা বারবার করিয়া পড়িল। যখন তাহা একেবারে মুখস্থ হইয়া গেল, তখন সে তাহা তার দেরাজে, তার হাতে-লেখা খাতার পাতায় যেখানে গোটা কয়েক প্যানজী ফুল চাপা দেওয়া ছিল সেখানটায় রাখিয়া দিল।

সেইদিন বৈকালে সে বিনোদের বাড়ী গেল। সন্ধ্যাবেলায় বিনোদ আফিস হইতে আসিলে সেও বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায় আমার একটা মোকদ্দমা ক'রতে হ'বে।"

"সে কিরে? কার সঙ্গে মামলা—ক্লাশের কেউ বুঝি তোর চেয়ে ভাল পোষাক ক'রেছে?"

"না গো কর্ত্তা তা নয়। মোকদ্দমা খাঁটি আইনের মোকদ্দমা—ব্যাপার চুরির সামিল। আপনার বন্ধু শিশির বাবু আমার বইখানা চুরী ক'রে ছাপিয়েছেন। আমি ড্যামেজ চাই।"

বিনোদ এ কথায় তার স্বভাবসুলভ রহস্যপ্রিয়তার সহিত উত্তর দিতে পারিল না। সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, "হুঁ তা কাজটা তার অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু এ নিয়ে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।"

মিনতি একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। বিনোদ যে এ কথাটা গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিয়া ফেলিল, ইহাতে সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া তার মুখরক্ষা করিবার চেষ্টায় সে বলিল, "এ দুপুরে ডাকাতি, মুখুজ্জে

মশায়, এই দেখুন না—আর মলাটের ডিজাইন হুবহু আমার খাতা থেকে নেওয়া” বলিয়া আঁচলের তলা হইতে বইখানা বাহির করিয়া দেখাইল।

বিনোদ সেদিকে না চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “আমি দেখেছি, শিশির আমাকে একখানা পাঠিয়েছে।”

মিনতি ভাবিল বিনোদ আজ প্রকৃতিস্থ নাই। তার উচিত ছিল একথা লইয়া খুব একটা হাসি-মস্করা করা, এবং সেই লোভেই সে আসিয়াছিল। কিন্তু ভগ্নীপতির এ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য তাহার উৎসাহ একদম মাটি করিয়া দিল। সে সামান্য আর দুই একটা কথা বলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া সুমতিকে আক্রমণ করিল।

সুমতির মুখের সামনে বইখানা ধরিয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে সে বলিল, “দেখেছ দিদি, তোমাদের শিশিরবাবুর কাণ্ডখানা। কি অন্যায় বল দিকিনি।”

সুমতি মুখ ভার করিয়া বলিল, “দেখেছি দিদি। ভারি অন্যায় এ তাঁর। আমাদেরকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নি। কে জানতো যে শিশিরবাবু এমন ক’রতে পারেন।”

মিনতি অবাক হইয়া গেল। ইহাদের কি হইয়াছে? এ ব্যাপারটাকে এরা এত ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে কি জন্য? ভগ্নী ও ভগ্নীপতির উপর তার মন ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে মুখে অন্যায় অন্যায় যতই বলুক, শিশির বাবুতো সত্য-সত্যই অন্যায় কিছু করেন নাই। যদিই বা অন্যায় কিছু হয়, এ অন্যায় যে তার মাথার মাণিক। ইহার জন্য সে শিশির বাবুকে মাথায় করিয়া নাচিতে পারে। ইহারা না শিশিরবাবুর বন্ধু? তাঁর প্রতি এমন অন্যায় অবিচার ইহারা কেমন করিয়া করিতেছে?

মিনতি এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। সে ভারী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিল। দিদি ও মুখুজ্জে মশায়ের উপর সে রীতিমত চটিয়া গেল। তার

প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাই লইয়া তাঁরা যে শিশির বাবুর উপর এ অন্যায় রাগ করিলেন, ইহাতে সে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হইল। বাড়ী ফিরিবার পথে সে গাড়ীতে একলা বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাড়ীতে আসিয়া সে আর বই সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিল না। বই ক'খানা তার দেরাজের ভিতর অনেকগুলি কাগজের তলায় লুকাইয়া ফেলিল। সে ভারী ক্ষুণ্ণমনে সমস্তদিন কাটাইল।

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়ার পর সে নীরবে আপনার ঘরে শুইতে গেল। অনেকক্ষণ তার ঘুম পাইল না। শেষে উঠিয়া সে জল খাইতে গেল। তার বড়দা'র ঘরের সামনে বারান্দায় কুঁজোয় জল থাকিত, সেখান হইতে সে জল গড়াইয়া খাইতে গেল। বড়দা'র ঘরের দরজা তখনও খোলা। সে শুনিতে পাইল বড়দা বড় বউদির সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

বড়দা' বলিলেন, "বড় কঠিন সমস্যা বড় বউ। দোজবরে' বর, তাতে একটি ছেলে আছে বয়েসও বেশী। মিনতির মত মেয়েকে এমন বরে দিতে মন সরে না! অথচ এ ছাড়া উপায়ই বা কি? আজ চার বচ্ছর ধরে তো বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে—কত লোকেই তো দেখে গেল। কেউ তো দুদিন কথাও চালালে না।"

বউদি বলিলেন, "কিন্তু তাই ব'লে দোজবরে দেওয়া! তাও বুড়ো বর।"

"বুড়ো তাকে দেখে কেউ বলবে না। দিব্যি জামাইটির মত চেহারা তার। ওই ছেলেটা না থাকলে ও তিরিশ বছর ব'লে চলে যেত।"

"হাঁ তাও, ঐ সতীন বেটার ঘরে—আর সে বাপ তো ছেলে-অন্ত প্রাণ! আমার সাহস হয় না।"

"কিন্তু ঘরে বরে এমনটীই পাব বা কোথা? এক দোজবরে। নইলে অমন বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে কে না চায়। ডেপুটি, তা'ছাড়া অবস্থা

ভাল—সুন্দর সচ্চরিত্র যতদূর যা হ'তে হয়। আমরা যা দোনোমন ক'রছি। বাঙ্গালা দেশের হাজারো মেয়ের বাপ এ সম্বন্ধ পেলে নেচে উঠতো।"

"তা তো বটেই। মেয়ের বিয়ে যে শক্ত কাজ—শিশির বাবু বিয়ে ক'রতে চাইলে মিনতির মত দুশো' মেয়ের বাপ তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তবু বাপ মা মরা মেয়ে আমাদের, তা'ছাড়া মেয়ে কিছু অবুঝ নয়—তাকে কি এমন স্থলে দিতে আছে! এতে বড় নিন্দে হ'বে।"

"মুখুজ্জে মশায় আর দিদি তো একবাক্যে মানা করলে এ কাজ ক'রতে।"

"দেখ তাঁরা অতবড় মুরব্বী লোক, তাঁদের কথাই শোনা ভাল।"

"কিন্তু এও ভেবে দেখ, আমাদের যা অবস্থা তাতে মিনতিকে বড় জোর মানানসই রকম দুখানা গয়না দিয়ে দিতে পারি। তাও হয় তো তোমাদের দু' এক খানা গয়না দিলে তবে হবে। দশ বিষ হাজার টাকা কিছু ঢালতে পারবো না। যা পারবো তাতে ঐ কালো মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ভাল পাবই বা কোথায়?"

"ভগবান জুটিয়ে দিবেন। হ'ক কালো, তবু মিনতির মত মেয়ে হাজারে একটা মেলে না।"

"সে তো তোমার আমার মত, বড় বউ। কিন্তু বাইরের লোকে যে ওর কদর ক'রবে বড় তেমন তো মনে হ'চ্ছে না।"

মিনতি কর্ণময় হইয়া সমস্ত কথা শুনিল—তার বোধশক্তি প্রায় লোপ হইবার মত হইল। এই অসম্ভব ব্যাপার কি সত্য-সত্যই সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে? শিশিরের সঙ্গে তার বিয়ে! আর দাদা বৌদি, বড়দি ও মুখুজ্জে ম'শায় তাঁরা এতে বিরোধী!

অনেকক্ষণ পর বড়দা' আবার কথা বলিলেন, "তা এখন শিশির বাবুকে কেমন করে' কথাটা লেখা যায়। তিনি উপযাচক হ'য়ে নিজে যখন প্রস্তাবটা উপস্থিত ক'রেছেন আমরা সাফ না বল্লে বড় অপমান বোধ হ'বে তাঁর। কি বলা যায় বল দেখি ?"

বড় বউ একটু ভাবিয়া পরে বলিল, "লিখে দেও যে মেয়ের ইচ্ছে নেই। এতবড় মেয়ে, এ কথা বল্লে তাঁর এক রকম মান রক্ষে হ'বে।"

কি সর্ব্বনাশ! এতবড় একটা মিথ্যা কথা ইহারা বলিবে। মিনতির ভয়ানক রাগ হইল। এমনি যদি ইহারা লিখিয়া বসে, তবে সে কি করিবে ? সে কি বৌদির কাছে গিয়া বলিবে ? না শিশির বাবুর কাছেই চিঠি লিখিবে ?

বড়দা বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ ক'রলে কি হয় ? মিনতিকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখ না।"

"জিজ্ঞেস ক'রতে চাও কর। কিন্তু তার কোনও দরকার আছে ব'লে তো মনে হয় না।"

"তবে যাও, এক্ষুণি যাও। সে ঘুমিয়েছে কি না দেখে এসো—যদি জেগে থাকে কথাটা পাড় গে।"

মিনতি বুঝিল যে বড় বউ খাট হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সে ছুট দিয়া আপন ঘরে পলাইল। তার জল খাওয়া হইল না।

একটু পরেই বড় বৌ আসিয়া তার ঘরে দেখা দিলেন। মিনতির বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে কোনও মতে আত্মসংযম করিয়া বসিয়া রহিল।

বড় বউ বলিলেন, "মিনু ঠাকুরঝি, একটা কথা জিগ্‌গেস ক'রবো, সত্যি তোর মনের কথা বলবি ভাই ?"

কম্পিত হৃদয়ে মিনতি বলিল, "কি কথা বৌদি ?"

বড় বউ মিনতির হাতে একখানা চিঠি দিলেন। ঘরের দুয়ারের পাশে লণ্ঠন ছিল, আনিয়া মিনতি পত্র পড়িল। পত্র লিখিয়াছে শিশির বিনোদকে।

শিশির লিখিয়াছে,—

"ভাই বিনোদ!

আজ তোমার কাছে ভারি একটা স্পর্দ্ধার কথা লিখছি। জানি এর উত্তর কি হ'বে। আমার বুড়ো বয়সের ধাষ্টেমির যোগ্য পুরস্কার পাব, কিন্তু তবু না লিখে পারছি না।

তোমাদের মিনতিকে দেখে অবধি আমি তার রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। আমি অনেক দিন আমার এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছি। জানি এ অতি অসঙ্গত। বিদ্যুৎকে হারিয়েও যে আমি আবার অন্য নারীর দিকে চাইতে পারছি, এ আমার নীচতা! তা ছাড়া মিনতি ছেলেমানুষ, আমার যৌবন অতীত হ'য়ে গেছে। আমার তাকে পাওয়ার স্পর্দ্ধা করা ধৃষ্টতা। এই সব ভেবে চিন্তে অনেক দিন আপনাকে সামলে রেখেছি। কিন্তু আর পারছি না।

তোমার কাছ থেকে তার খাতাখানা এনেছিলুম,ফিরিয়ে দেবার আগে সব কবিতাগুলি নকল ক'রে রেখেছিলাম। তার বইখানা ছাপিয়ে আমি আমার পূজা সার্থক করবো এই স্থির করে তা' ছাপতে দিয়েছিলাম। আজ দপ্তরীর বাড়ী থেকে বইখানা এসেছে। দু'খানা তোমাকে পাঠালাম।

কিন্তু বইখানা পেয়ে আমার মনটা আরও অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে হ'চ্ছে যে, যার মধুর হৃদয়ের পরিচয় ও বইয়ের ছত্রে ছত্রে র'য়েছে তাকে না পেলে আমার জীবন অসার্থক হ'বে। অসার্থক হবেই জানি। কেন না, আমার মত দোজবরের হাতে তোমরা তাকে দেবে না,

আর সেও আমার এ স্পর্দ্ধায় পদাঘাত ক'রবে। কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা না পেয়ে আমার অশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। তাই লিখছি, মিনতিকে তোমরা আমায় দেবে কি ?

আমি জানি তুমি ও তোমার স্ত্রী এ চিঠি পড়ে' আমায় ঘৃণা করবে। মিনতিরও আমার উপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তা' উপে যাবে। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আগুনে মরবে জেনেও ছুটে যায়, তেমনি আমি ছুটেছি। আমার পক্ষে আত্মসংবরণ অসম্ভব।

যদি পার তবে আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করো।

অভাগ্য, শিশির"

পত্র পড়িতে পড়িতে মিনতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। শিশিরের হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যথার করুণতা তাকে অভিভূত করিল। চিঠির অক্ষরের ভিতর দিয়া মিনতি দেখিতে পাইল, শিশিরের পীড়িত কুসুমকোমল চিত্তখানি। হায় রে ! মিনতি যাকে কত রাত্রিদিন বসিয়া ধ্যান করিয়াছে, দুর্লভ রত্ন বোধে সে যাকে ভাল করিয়া কামনা করিতেও সাহস করে নাই—সে মিনতির জন্য ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ব্যাকুল। মিনতির চক্ষু ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চিঠিখানা সে তিনবার পড়িয়া ভাঁজ করিয়া হাতের মুঠার ভিতর পুরিল। চট্ করিয়া কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

বড় বউ বলিলেন, "আমাদের ভুল বুঝে দুঃখ করো না ঠাকুরঝি। আমাদের কারও ইচ্ছে নেই এখানে তোমার বিয়ে দিতে। তোমার দাদা কেবল বল্লেন জবাবটা দেবার আগে তোমাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রতে, তাই জিজ্ঞেস ক'রতে এলাম। নইলে—"

একটু হাসিয়া লজ্জিত ভাবে মিনতি বলিল, "না বৌদি তোমরা মিথ্যে ভয় করছো, আমি বিয়ে ক'রবো।"

"না ভাই, কোনও দরকার নেই, তুমি এমন কিছু গলার কাঁটা হওনি যে তোমার এমনি আপনাকে বলি দিতে হ'বে।"

"তুমি ভুল বুঝেছ বৌদি। আমি অনিচ্ছায় বলিনি। আমি সত্যই মনে করি যে এঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়া আমার সৌভাগ্য!"

"কি বলিস তার ঠিক নেই। জানিস তুই শিশির বাবুকে ?"

"দেখনি চিঠিতে,তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল দিদির বাড়ীতে।"

"তা তো দেখছি—তার বয়েস জানিস ?"

"হাঁ এই মুখুজ্জে ম'শায়ের বয়সী।"

"হাঁ, এই তাঁর চেয়ে দুই এক বছরের ছোট হ'বে। ঘরে একটা ছেলে আছে, তার বয়েস তের চৌদ্দ।"

"তাতে দোষ কি ? এতদিন বিয়ে হ'লে তো আমার একটি ছেলে অন্ততঃ হোতই ও ছেলে তো আমার পাওনা।"

"ও তাই বল, তামাসা হ'চ্ছে। তুই যে দুষ্টু, তোর কোন কথা যে সত্যি, কোনটা ঠাট্টা তা' আমরা মুখ্যু মানুষ অত বুঝতে পারি না। ঠাট্টা রাখ ভাই, সত্যি বল। এ বিয়েতে তোর মত নেই।"

"সত্যি বলছি বৌদি আমার মত আছে ?"

"ওই তেতাল্লিশ বছরের বুড়োর সঙ্গে ?"

"আমার বয়েসটা হিসেব করে দেখেছ বৌদি ? ঘটক ঘটকীর কাছে যতই ভাঁড়াও চিত্রগুপ্তের খাতায় পুরো বিশটি বছর লেখা হয়ে গেছে।"

বউদি তার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "সত্যি করে বল ঠাকুরঝি, এই তবে ঠিক ?"

"ঠিক বউদি, আমি ওঁকে ছেলে সুদ্ধই বিয়ে করবো।"

বড় বউ তখন উঠিল। তার পর দুয়ারের কাছে গিয়া আবার

ফিরিল। তার বিশ্বাস হইল না। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকে ভাঁড়াস্ নে ভাই, সত্যি বল।"

"সত্যি বলছি বউদি আমি ওঁকে বিয়ে করবো, করবো করবো। তিন সত্যি ক'রলাম। এখন সুখী হ'লে।"

"মর পোড়ারমুখী তোকে তিন সত্যি ক'রতে কে ব'লেছে?"

বড় বউ চলিয়া গেলেন। মিনতি চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িল। তার পর চিঠিখানা বুকে চাপিয়া শুইয়া পড়িল। সে এখন অবাধে জাগ্রত অবস্থায় রাশি রাশি স্বপ্ন গড়িয়া গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় বড় বউ মেজ বউকে কথাটা বলিল। মেজ বউ শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িল। অনেক ভাবিয়া সে বলিল, "ও কোনও কাজের কথা নয় দিদি। ঠাকুরঝি তোমাকে ভাঁড়িয়েছে। একে এতগুলো সম্বন্ধ এসে ফিরে গেল, দেখে ওর ভারি অপমান বোধ হ'য়েছে, তার পর ও দেখেছে এই নিয়ে ওর দাদারা মহা ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে। তাইতে ও এমনি ক'রে আপনাকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। এ হ'বে না। রসো আমি দেখি।"

মেজ বউ ছিল মিনতির সমবয়সী, আর তার সঙ্গে মিনতির গলায় গলায় ভাব। সে ছুটিয়া মিনতিকে চাপিয়া ধরিল। বলিল, "বলি মুখ-পুড়ি এসব শুনছি কি? তুই নাকি তিনসত্যি ক'রেছিস্ ওই দোজবরে মিনসেকেই বিয়ে করবি?"

"কেন না ক'রবো? তোরাই বুঝি খালি বর নিয়ে ঘর করবি? আমার বুঝি আর সাধ যায় না?"

"সাধ যায় তবে ও বুড়ো ঘাটের মড়ার সঙ্গে কেন? বাঙ্গালা দেশে তো ছোকরারা সব এখনো মরে নি?"

"যারা মরেনি তারা এঘাটে এসে ডুবে মরতে মোটেই রাজী নয় যে

বৌদি। তোমার ঠাকুরঝি তো এমন কিছু পরীর বাচ্ছা নয়। তা'ছাড়া জানই তো বরাবরই আমার বুড়ো বরেরই সখ। তার জন্যে তপস্যা করবো ব'লেছিলাম মনে নেই?"

"দেখ, তোর শয়তানি আমার কাছে খাটবে না। ওসব চাল চালগে দিদির কাছে। তুই ভেবেছিস তোকে বিয়ে দিতে না পেরে তোর দাদারা ছটফটাচ্ছে, তাই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তুই এই কাণ্ড ক'রছিস! তা যদি ভেবে থাকিস তো সে একদম ভুল। তোর মেজদা' বড়দা' দু'জনেই ব'লেছেন যে তোর যোগ্য বর নইলে তোকে বিয়ে দেবেনই না।"

"কিন্তু এ বরটি অযোগ্য কিসে? তুই দেখিস নি তাই বলছিস। যদি সে কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখতিস, তবে আমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতিস্।"

"মরণ আর কি? তেতাল্লিশ বছরের কার্ত্তিক—"

"আসল কার্ত্তিকের কথা ভেবে দেখ্, তার বয়েস প্রায় তেতাল্লিশ হাজার হ'তে চল্লো।"

"সে তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল। ঝুড়ি ঝুড়ি বই পড়ে তো কেবল কথার ঝুড়িই বেঁধেছিস্।"

"কি করি বল—তা ছাড়া তোর মত জ্যান্ত মানুষের কাছে তোতা পাখির মত শেখবার সুযোগ তো আমার নেই।"

"চুলোয় যাক, তুই সত্যি সত্যি আর ওই মিনসেকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছিস নে—কেমন?"

"কেন ভাই? সে বেচারার জীবন আমাকে ছাড়া একেবারে অসার্থক হয়ে যাবে লিখেছে, এই দেখ। তোর কি একটু দয়া মায়াও নেই? আমার আছে।"

মেজ বউ তখন মিনতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মী দিদি আমার, সত্যি করে বল। সত্যি তোর মন চায় একে বিয়ে করতে ?"

"হাঁ ভাই সত্যি। যিনি আমাকে এমন সম্মান করেছেন, তিনি আমার জন্ম জন্মের দেবতা। তাঁকে আমি কোনও দিক দিয়ে ছোট ক'রে দেখতে পারিনে।" মিনতির চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মেজ বউ তখন তাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "এর পরে আর আমার বলবার কিছু নেই ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোর উমার মত সৌভাগ্য হোক।"

মিনতি নত হইয়া ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি লইয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলে নিলাম বউদি'।"

৬

শিশির যেদিন সকাল বেলায় মিনতিকে শেষ দেখিয়া ফিরিল সেদিন তার সমস্ত অন্তর উদ্দামভাবে মিনতির সহিত নির্লজ্জ অভিসার করিতেছিল। তখন তার আর কোনও বাধা মনে উঠিল না, কোনও অন্যায়ের কথা সে ভাবিল না, সে সর্ব্বান্তঃকরণে মিনতিকে কামনা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া তার মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চুঁচুড়ার এ বাড়ীখানা আদ্যোপান্ত বিদ্যুতের স্মৃতিতে এত পরিপূর্ণরূপে ভরা ছিল, যে এখানে আসিয়া তার অপরাধী চিত্ত পদে পদে আপনাকে তিরস্কৃত বোধ করিল।

স্নান করিয়া আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া চিরুণী বুরুষ দিয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তার চক্ষু নিবদ্ধ হইল তার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের ভিতর গুটিকয়েক পাকা চুলের উপর। এই ক'গাছা পাকা চুল যেন তাকে উপহাস করিয়া উঠিল। বিগত-যৌবন প্রৌঢ় সে, সে কি স্পর্দ্ধায় ওই তরুণী ললনাকে কামনা করিবার স্পর্দ্ধা করে? একথা শুনিলে মিনতি কি হাসিয়া গড়াগড়ি যাইবে না? বিনোদ ও সুমতি তাকে কাণে ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে না? সে তাড়াতাড়ি মাথা আঁচড়াইয়া চিরুণী বুরুষ ফেলিয়া খাইতে গেল।

দিলীপ তখন রমেনকে লইয়া খাইতে বসিয়াছে। তাকে দেখিয়া শিশিরের মনটা চড়াৎ করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ তার ভালবাসার এই শেষ চিহ্নটি শিশিরের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, শিশিরের কর্ত্তব্য, নিঃশেষে ইহার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। অথচ এই মিনতির সন্ধানে কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া সে ইহাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার হাসি পাইল। তের বছরের ছেলের সামনে সে কোন লজ্জায় টোপর পরিয়া

বিবাহ করিতে যাইবে ? একথা ভাবিতেও তার লজ্জা হইল। তা ছাড়া দিলীপের ঘাড়ে একটা সৎমা এবং তার স্নেহের অংশীদার বৈমাত্র ভাই চাপাইবার তার কি অধিকার আছে ?

তবে—মিনতি সাধারণ মেয়ে নয়। সে কখনও দিলীপকে অবহেলা করিবে না। বরং মাতৃহীন দিলীপের স্নেহময়ী মা হইয়া বসিবে। উমার চেয়ে মিনতি তার অনেক বেশী যত্ন করিতে পারিবে! তার নিজের ছেলে-পিলে হইলেও, দেবী সে, কখনও দিলীপকে তাহাদিগের হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবে না, নিশ্চয়।

——তবু!——

যাই হোক এ বুড়ো বয়সে এমন করিয়া ধাষ্টেমো করাটা কিছু কাজের নয়। মিনতিকে তো আর কিছু সত্য সত্যই পাওয়া যাইবে না। অমন সুন্দরী, অমন বিদূষী, অমন ভাল মেয়েকে তো আর তারা দোজবরে বিবাহ দিবে না। আর মিনতিও রাজী হইবে না; অতবড় মেয়েকে তো আর তার বিনা সম্মতিতে পোঁটলা বাঁধিয়া যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারিবে না। সুতরাং এই সব বৃথা দিবা-স্বপ্নের আন্দোলন করিয়া শিশির মিছা-মিছি দিলীপের শিক্ষা ও আনন্দবিধানে অবহেলা করিবে না। সে সঙ্কল্প স্থির করিল, আর সে মিনতির চিন্তা করিবে না—এমন কি বিনোদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইবে না।

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে আহারাদির পর কাছারী গেল। বৈকালে কাছারী হইতে ফিরিবার পথে দেখিল, দূরে রমেন স্কুল হইতে ফিরিতেছে, তার মুখে একটি সিগারেট। তার প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই রমেন তো দিলীপের সহচর, এক রকম ইহার হাতে দিলীপের আনন্দ বিধানের ভার ছাড়িয়া দিয়া তো শিশির ছুটী লইয়াছে।

তার পর দেখিল রমেনের ওপাশে দিলীপ, সে যেন পিতাকে দেখিয়া

চট্ করিয়া কি একটা ফেলিয়া দিল—সিগারেট কি ? তার মনটা হঠাৎ ভয়ানক অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। একটা অসম্ভব অন্যায় আকাঙ্ক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া সে তার কর্ত্তব্যে এতটা অবহেলা করিয়া বসিয়াছে—দিলীপকে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে যে ইহার মধ্যেই তার এতটা অবনতি ঘটিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ !

সেইদিন হইতে একমাস সে একাগ্রচিত্তে দিলীপকে লইয়া বসিল। দিলীপকে পড়ান, দিলীপের সঙ্গে খেলা-ধূলা গল্পসল্প করিয়া সে দিনের অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। আর রমেনকে খুব শক্ত শাসন করিল।

একমাস পর সে একদিন দিলীপকে লইয়া কলিকাতায় মিউজিয়ামে গেল। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে নানা তথ্য শিখাইতে লাগিল, সমস্ত জিনিষ দেখিয়া তার সম্বন্ধে দিলীপের জানিবার আগ্রহ দেখিয়া পুলকিত হইল !

ফিরিবার সময় সে একবার বিনোদের বাড়ী গেল। সে বাড়ী যাইতে তার পা একটু কাঁপিয়া উঠিল, অন্তর একটু নাচিয়া উঠিল। মিনতির সঙ্গে হয়তো আজ আবার দেখা হইবে এই সম্ভাবনা স্মরণ করিতে তার চিত্তের সকল প্রতিজ্ঞার বাঁধন যেন ধাঁ করিয়া আলগা হইয়া গেল।

চা খাইয়া সে বিনোদের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইল, মিনতি আসিল না। তার কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিশিরের ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল। অথচ তার কথা জানিবার জন্য তার মন ছটফট করিতেছিল। বিনোদও সেদিন কিছুতেই সে ধার দিয়া গেল না। তাই যখন শিশির উঠিল, তখন সে তার মনটা ভারি বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পূর্ব্বে মনকে সে যতই ভাঁড়াক, এখন সে আপনার কাছে স্বীকার করিল, যে প্রকাণ্ড আশা লইয়া আসিয়াছিল সে আশায় সে নিরাশ হইয়াছে।

দিলীপকে সুমতি বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছিল। দিলীপ রাস্তায় বাহির হইয়াই মাসিমার কথা জুড়িয়া দিল। মাসিমা কি কি বলিলেন, সে সব কথা সে বলিয়া ফেলিল।

শিশির শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ছোট মাসি কিছু বল্লে না ?"

"ছোট মাসি কে ?"

"কেন ? তোর মাসিমার বোন ?"

"না আর কেউ তো বাড়ীতে নেই।"

শিশির বুঝিল মিনতি তার বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ তার বিনোদের বাড়ীতে আসিবার কোনও দরকার ছিল না। তার মনটা ভারি ক্ষেপিয়া উঠিল।

সে অপ্রসন্নচিত্তে বাড়ী ফিরিল। এখন মিনতি তবে তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন আর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দটুকুও সে লাভ করিতে পারিবে না। এ কথা মনে হইয়া সে মিনতিকে আরও ব্যগ্রতার সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। তার সেই মুখখানা, স্বর্গের সঙ্গীতময় তার কণ্ঠ; তার কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা; আর যূথিকার মত নির্ম্মল কোমল তার চিত্তের মনোহর প্রকাশ তার কবিতা—পাগল হইয়া শিশির এই সবের ধ্যান করিতে লাগিল।

তার টেবিলের একটা ড্রয়ারের ভিতর হইতে সে একখানা খাতা টানিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর সে মিনতির কবিতাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিল। খাতাখানা বাহির করিয়া সে কবিতাগুলি পড়িতে লাগিল, আর সেই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর তার কাণে মিনতির সুমধুর-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। একটি কবিতা পড়িতে পড়িতে তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কবিতাটি এক মাতৃহারা শিশুর উদ্দেশ্যে লেখা। মা মরিয়া গিয়াছে, শিশুটি তার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে। তার পর

একজন আসিয়া তাকে মার বুক হইতে টানিয়া লইয়া গেল। শিশু করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করিয়া কবিতাটি লেখা। তার শেষে মিনতি লিখিয়াছে ;—

হেথায় ক্ষুধিত শিশু
মৃত বক্ষে বৃথা কেঁদে মরে,
সেথা দেখ পুত্রহারা
মার বুকে বৃথা ক্ষীর ঝরে।
মাতৃহারা কাঁদে শিশু
কাঁদে পুত্রহারা মাতা,
এ কি হায় কঠোর বিধান,
মা হারা পাবে না মাতা
পুত্রহারা পাবে না সন্তান ?
ও গো জননীর জাতি
প্রীতির সাগর লয়ে'
জগতে বিলাও স্নেহধারা,
চিরদিন কাঁদিবে কি
পুত্রহারা পাশে মাতৃহারা ?
নন্দন হইতে ঝরি
মন্দাকিনী বহে যদি
ধরাতলে জননী অন্তরে,
সে কি শুধু বদ্ধ রবে
অনায়ত জঠর কন্দরে।
মা ক'রে আমারে বিধি
জনম দিয়াছ যদি
এই সুধু মাগি আশীর্ব্বাদ

আমার মায়ের স্নেহে
নাহি থাকে সীমার বিবাদ
জঠরে সন্তান আসি
কেড়ে যদি লয় স্নেহ,
অপুত্রেরে দূরে দেয় ঠেলে,
আমার সন্তান দিও
হে বিধাতা, অপরের কোলে।

পড়িতে পড়িতে শিশিরের ছুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। এই কবিতার ভিতর দিয়া যেন মিনতির মাতৃত্বের আকুল আহ্বান আসিয়া মাতৃহীন দিলীপকে তার স্নেহস্পর্শে অভিসিক্ত করিয়া ফেলিল। এমন মায়ের কোলে দিলীপ যদি স্থান পায়, তবে কি তার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে না!

কিন্তু বৃথা, বৃথা এ কল্পনা! মিনতি ত শিশিরের হইবার নয়! তবে কেন এ চিন্তা?

খাতাখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শিশির তুলিয়া রাখিল। আবার বাহির করিয়া সেখানা নাড়াচাড়া করিল। শেষে সে তাহা হইতে কয়েকটি কবিতা বাছিয়া নকল করিয়া একখানা মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিল। তার মনে হইল, যে এমনি করিয়া মিনতির পূজা করিতে পারিলে তার প্রেম বুভুক্ষিত-হৃদয় কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে।

কবিতাগুলি ছাপা হইতে তিনমাস বিলম্ব হইয়া গেল। পত্রিকাখানা বাহির হইবামাত্র শিশির কম্পিতহস্তে তার মোড়ক খুলিয়া কবিতার অন্বেষণ করিল। ছুই সংখ্যায় যখন বাহির হইল না, তখন সে চটিয়া গেল। সে স্থির করিল বইখানা ছাপাইবে।

অনেক পয়সা খরচ করিয়া যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া সে বইখানা ছাপাইল। তার পর সে বসিয়া বসিয়া মিনতির খাতায় যে সুন্দর স্ূচীকার্য্য

ছিল তাহা স্মরণ করিয়া সেইরকম করিয়া একটি ছবি আঁকিল। মলাটে রঙ্গিন কালিতে সে ছবি ছাপা হইল।

বইগুলি সে যেদিন প্রথম পাইল সেদিন তার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাসিকপত্রে পূর্ব্বের কয়টি কবিতা ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সে এখন সেই কাগজে এ বইয়ের বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিল।

তার পর, এ বই কয়েকখানা মিনতিকে ও 'বিনোদকে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিল। এখন তার মনে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিল। মিনতি ও বিনোদের অনুমতি না লইয়া সে এতটা করিয়া ফেলিয়া ভাল করে নাই। তার ভয় হইল, ইহাতে তার মনের কথাটা বোধহয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। তবেই তো সর্ব্বনাশ! একথা কোনও মতে বিনোদ সুমতি বা মিনতির সন্দেহ হইলেই তো সর্ব্বনাশের কথা। তখন তো তাহারা ভয়ানক চটিয়া যাইবে।

এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে অনেকদিন বইগুলি তার সিন্ধুকে বন্ধ রাখিল। আর গোপনে দুয়ারে খিল দিয়া সেগুলি বাহির করিয়া তাদের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব অভিসার করিতে লাগিল। এ প্রক্রিয়াতেই তার চিত্তের অশান্ততায় যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল।

শেষে সে বই ক'খানা পাঠাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের কাছে চিঠি লিখিল।

চিঠি পাঠাইয়াই তার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। ছি! ছি! বুড়ো বয়সে সে একি অপকার্য্য করিয়া বসিল! এখন ত কথাটা সব জানাজানি হইয়া যাইবে। আর তো তার লোকের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। সে ভয়ানক ভয় পাইয়া গেল। সে সেই দিনই তাড়াতাড়ি কালেক্টারকে বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনের ওজুহাতে ছুটি লইল

এবং একমাস ছুটির দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া মশুরী পাহাড়ে পলায়ন করিল।

সাতদিন পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনোদের চিঠি তার কাছে মশুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মোড়কের উপর বিনোদের পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। খাম ছিঁড়িতে সহসা সাহস হইল না। অনেকক্ষণ পর কম্পিতহস্তে খাম ছিঁড়িয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তার অন্তর প্রথমে স্তম্ভিত, পরে পুলকে নাচিয়া উঠিল।

বিনোদ লিখিয়াছে, "তুমি অতি পাপিষ্ঠ! (কি সর্ব্বনাশ, বিনোদ ভারী রাগ করিয়াছে) আগে যদি জানতাম যে তোমার ভিতর এমন শয়তানি সম্ভব, তবে কি আমি খাল কাটিয়া কুমীর ঘরে আনি। (তাই তো কাজটা অতি গর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর দেশে ফেরা অসম্ভব, চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া সে দিলীপকে লইয়া এইদিকেই কোথাও পড়িয়া থাকিবে।) তুমি যে বইখানা চুরী করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যালীরত্নের মনটাও চুরি করিয়া পালিয়েছ, এ সন্দেহ আমার বা আমার স্ত্রীর একদিনও হয়নি। (একি কথা!) কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপার তাই দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা সবাই পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রেছি, যে তোমার ঘাড়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা চাপানই হচ্ছে এর উপযুক্ত শাস্তি। অতএব তোমাকে শমন দেওয়া যাচ্ছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের পনেরই তারিখ এসে তুমি তোমার মূর্ত্তিমতী শাস্তি গ্রহণ ক'রে যাবে।"

"কথাটা নিছক ঠাট্টা নয়। মিনতি তোমাকে বিয়ে ক'রতে চায়। কাজেই আমাদের রাজী না হ'য়ে উপায় নেই।"

এ কি সত্য! মিনতি তবে তার হইবে? শিশির আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। একদিন সে মশুরী পাহাড়ে অনর্থক লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া পরের দিন বাড়ী ফিরিল।

৭

চুঁচুড়ায় আসিয়া তার মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হইল। এখন তার মনে হইল কাজটা ভাল হইতেছে না—নিতান্তই স্বার্থপরের মত হইতেছে। প্রথমতঃ মিনতি তার কাছে যতই কাম্য হউক, সে মিনতির কাছে সত্য সত্যই কাম্য হইতে পারে না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, অনেকটা বয়স হইয়া গিয়াছে, বিবাহ হয় নাই, সেই জন্য বোধ হয় সে বাড়ীতে গঞ্জনা পায়। সেই গঞ্জনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া'র মত আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। শিশিরের পক্ষে এই স্বার্থত্যাগের সুযোগ লইয়া তাকে বিবাহ করাটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত কাজ হইবে। বিশ বছরের যুবতীর চিত্ত আকৃষ্ট বা তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার মত তার কিছুই আছে বলিয়া শিশিরের মনে হইল না।

তার পর সে তার অখণ্ড অক্ষত হৃদয় তো মিনতিকে দিতে পারিবে না। মিনতিকে সে যতই ভাল বাসুক, বিদ্যুতের স্মৃতি তার জীবনের পরতে পরতে ঢুকিয়া রহিয়াছে। আজ সেই বিদ্যুতের অগাধ প্রেমের প্রতি অবিশ্বাসী হইবার সঙ্কল্প করিতেই তার ভিতর সে অবজ্ঞাত প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেয়াল হইতে বিদ্যুতের ফটোগ্রাফ তাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। তার মনে হইল, যে তার জীবনের সারবস্তুকে বিদ্যুৎকে দিয়া বসিয়াছে। এখন তো মিনতিকে সে তার সেই প্রথম প্রেমের পবিত্র আবেগ লইয়া বরণ করিতে পারিবে না! তার মনের তলায় সে বিদ্যুতের স্মৃতি চিরদিনই পূজা করিবে। এমন হৃদয় লইয়া সে কেমন করিয়া মিনতির বিশ্বাসী অন্তরের সম্মুখে দাঁড়াইবে—কেমন করিয়া তাকে বঞ্চনা করিবে!

তা ছাড়া, বিদ্যুৎ স্বর্গ হইতে তাকে দেখিয়া না জানি কি ভাবিতেছে?

সে যে কতদিন বিদ্যুতের কাছে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছে, যে যদি বিদ্যুৎকে হারাইবার দুর্ভাগ্য তার হয়, তবে সে আর কোনও নারীকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। আজ দুই বৎসর মাত্র পরে সে অনায়াসে অন্য নারীকে ধ্যান করিতেছে। কি হীন কৃতঘ্নতা তার! তা ছাড়া দিলীপ! তার সমস্ত স্নেহ, সকল সম্পদের উপর দিলীপের অখণ্ড অধিকার সে হরণ করিতে বসিয়াছে। তার মাতৃ-বিয়োগ দুঃখের উপর সে বিমাতার দুর্ভাগ্য চাপাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মিনতির মত বিমাতা হওয়া দুর্ভাগ্য নহে! মিনতির সেই কবিতার কথা স্মরণ করিল। তার ভিতর তার মাতৃ-হৃদয়ের যে আকুল স্নেহাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে সে দিলীপকে অশেষ স্নেহের সহিত বরণ করিয়া লইবে নিশ্চয়। কিন্তু যদি না নেয়,—যদি কবিতা স্বধু কাব্যের খাতিরেই লেখা হইয়া থাকে,—যদি ইহা মিনতির অন্তরের কথা না হয়? আর হইলেই বা কি? মিনতি ছেলে মানুষ। বিশ বছর বয়সে চিত্তের যে অসীম উদারতা থাকে, সে যে কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনের সংঘাতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, তা তো সে নিজের জীবনেই দেখিয়াছে! বিদ্যুতের প্রতি তার যে সীমাশূন্য প্রেম অক্ষয় অব্যয় বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, আজ সে নিজে সে প্রেম প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে। যখন কবিকল্পনার মাতৃহীন-শিশু মিনতির সামনে রক্ত মাংসে গঠিত সপত্নী-পুত্র-রূপে দেখা দিবে, বিশেষ যখন মিনতির নিজের কোলে একটি ছেলে আসিয়া তার সকল স্নেহ কাড়িয়া লইবে, তখন যে কাব্যের এ মাতৃত্ব তার ভিতর সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক হিংসার ভিতর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না তার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য শিশির নিজে চিরদিনই দিলীপকে স্নেহ করিবে। আর দিলীপও পাঁচসাত বৎসরের মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিবে—তখন আর তার বাপ মার স্নেহের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। তবু—

এমনি অশেষ সমস্যা ও সন্দেহ আসিয়া তার চিত্ত আকুলিত করিয়া তুলিল। চুঁচুড়ায় ফিরিয়াও সে পাঁচ সাত দিন এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। বিনোদের সঙ্গে সে দেখা করিতে গেল না, কোনও চিঠি লিখিতে পারিল না।

তার এখন খুব স্পষ্ট ভাবেই মনে হইল, কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিকারের কথা ভাবিতে তাঁর আরও ভয় হইল। মিনতিকে হাতে পাইয়া হারাইতে তার মন কিছুতেই সরিতেছিল না। তা ছাড়া এখন সে কি করিয়াই বা পিছপা হয়? সে মিনতিকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে—তারা সম্মত হইয়াছে—এখন আবার সে প্রস্তাব ফিরাইয়া লওয়া যে দারুণ অপমানের কথা হইবে। সে কেমন করিয়া এমন কঠিন কাজ করিবে।

সাত আট দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধোন্মত্ত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বিনোদকে চিঠি লিখিল। পাঁচসাতখানা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে শেষে লিখিল :—

"আমি পাগল হয়েছিলাম। আমার এ বয়সে মিনতির মত মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছা নিতান্তই একটা স্পর্দ্ধার কথা। আমি এখন অনেক ভেবে দেখলাম এ অসম্ভব। মিনতিকে সুখী করবার মত পুঁজী আমার কিছুই নেই। সে হয়তো নিজের মন ঠিক বুঝতে পারেনি, কিম্বা মনের কোনও রকম গোপন দুঃখ বা অন্য কারণে সম্মত হয়েছে। আমি তাকে এমন ক'রে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে দিতে পারি না।"

"তাই তোমাদের সবার এ অনুগ্রহ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে আমার উন্মত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। আশা করি মিনতি যোগ্যবরের হাতে পড়ে সুখী হবে।"

পরদিন সকালে সে চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিল। তার পর সারা-

দিন সে অপরিসীম বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া কাটাইল। হাতের মুঠায় স্বপ্নের অতীত সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিশিরের চিত্ত একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

বৈকালে কাছারী হইতে আসিয়া শিশির দেখিল, বিনোদ বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। শিশিরকে দেখিয়াই তার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। শিশির তার দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে মুর্শড়াইয়া গেল।

কোনওমতে দুই একটা স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া শিশির উপরে গিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িল। তার মন দারুণ আশঙ্কায় পীড়িত হইল। না জানি বিনোদ তাকে কি বলিতে আসিয়াছে। বিনোদের কাছে যাইতে তার ভয় হইল, তবু একটা প্রবল মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে তার কাছেই ছুটিল।

চাকর রামধারী আসিয়া চা ও খাবার দিয়া গেল। শিশির অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সামান্য সামান্য কথা বলিতে লাগিল। আসল কথাটা পাড়িতে তার সাহস হইল না।

চা খাওয়া হইলে বিনোদ বলিল, "শিশির তুমি অতি পাষণ্ড।"

কথাটা পরিহাসের সুরে বলা হয় নাই। শুনিয়া শিশিরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল ; সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

"তুমি এত বড় ছেবলা একথা আমি স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবিনি। তা তুমি যাই হও, তাতে কিছু যায় আসে না। তুবি যে একটা মেয়ের অদৃষ্ট নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করবে তা আমি হতে দেবো না। তোমার এ চিঠির মানে কি ? এতই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে লিখতে গিয়েছিলে কেন ? তোমার সঙ্গে মিনতির বিয়ের প্রস্তাব করবার কথা আমাদের কারও মনে কোনও দিন আসে নি, আমরাও সে প্রস্তাব পেয়ে একেবারে তা অগ্রাহ্য করেছিলাম। কেবল

মিনতির আগ্রহ দেখে আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছায় সম্মত হয়েছিলাম। আর তুমি সে মেয়েটাকে এমনি করে অপদস্থ করে কি সাহসে তাকে এমনি অপমান করতে চাও।”

“অপদস্থ ? কি বলছো বিনোদ ?”

“তোমার এখনকার মত যদি ঠিক থাকে তবে মিনতির যা অপমান হবে তাতে সে আর জন্মে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বাড়ীশুদ্ধ সব লোক এ বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল—তার দুই বউদি' তাকে বারণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু মিনতি এক রকম সবার সঙ্গে লড়াই করে বলেছে, সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তার পর আজ যদি তোমার এ চিঠির কথা আমি প্রকাশ করি, তবে কি সে বেঁচে থাকবে মনে ক'রছো ? বেঁচে যদি থাকে, তবে সে হবে তার মরার বাড়া।”

এ কথা শুনিয়া শিশিরের সারা চিত্তে একটা অপূর্ব্ব পুলকের স্নিগ্ধ হিল্লোল বহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারুণ লজ্জা হইল। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—“আমাকে ভুল বুঝো না ভাই, আমি কেবল মিনতির ভালর জন্যেই লিখেছিলাম।—তা ছাড়া এ ত আমি জানতাম না।”

শিশিরের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

বিনোদ তখনও কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, “তবে তুমি তোমার শেষ চিঠি প্রত্যাহার করছো—বিয়ে তবে ঠিক।”

শিশির ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, তার মুখে কথা জুগাইল না।

বিনোদ বলিল, “যাক, একটা মস্ত বোঝা আমার মন থেকে নেমে গেল। তোমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমার যে কি আত্মগ্লানি হয়েছিল তা কি বলবো। কেননা মিনতির মনের এ ভাবের জন্য আমি কতকটা

দায়ী। যাক, এখন সব মিটে গেল। কিন্তু তুমি যে অস্থিরচিত্ত তোমাকে আমার বিশ্বাস নাই। পনেরই জ্যেষ্ঠ পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে রাজী নই। কাল একটা তারিখ আছে, কালই তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

শিশির একবার বলিল, "এত তাড়াতাড়ি ?"

"তাছাড়া উপায় নেই। বল রাজী ?"

শিশির সম্মত হইল। বন্দোবস্ত হইল যে শিশির সেদিন সকাল বেলায় কলিকাতা যাইবে। বিনোদের বাড়ী হইতে গিয়া বিবাহ করিয়া পরের দিন চুঁচূড়ায় ফিরিয়া আসিবে।

৮

শিশির ও বিনোদ বাহিরের ঘরে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। কিন্তু দুয়ারের কাছে আড়ি পাতিয়া ছিল মালতী।

কথা শুনিতে শুনিতে মালতী রাগে ফুলিতে লাগিল। সে বিদ্যুতের অনেক কালের ঝি—বিদ্যুতের স্নেহের দাসী। বিদ্যুতের স্থানে যে আর একজন আসিয়া তারই বাড়ীতে রাণী হইয়া বসিবে, এ চিন্তাও তার অসহ্য হইল। তাই যখন সে উৎকট আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া সে শেষে শুনিতে পাইল যে শিশির বিবাহে সম্মত, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুয়ার ছাড়িয়া নিজের ঘরে পলাইল এবং সেখানে অস্ফুটস্বরে বিদ্যুতের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তার দুঃখের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সে উপরে কাজ করিতে গেল। সেখানে উমাকে দেখিয়া সে বলিল, "শুনেছ পিসিমা, বাবু বিয়ে ক'রছেন।" তার অশ্রুর বেগ আবার প্রবাহিত হইল।

"অ্যাঁ! বলিস কি?" উমারও কথাটা ভাল লাগিল না। বিদ্যুৎ মরিয়া তার হাড় জুড়াইয়াছে, সে দাদার সংসারে কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে। আবার কোথা হইতে কে আসিয়া তার এ সৌভাগ্য কাড়িয়া লইবে, তাহা তার সহ্য হইল না।

ক্রমে ক্রমে অনেক কান্নাকাটি, বিদ্যুৎকে উদ্দেশ করিয়া নানা আকুল ক্রন্দন সহকারে মালতী যাহা শুনিয়াছিল, তাহা উমাকে জানাইল। উমার সঙ্গে মালতীর কোনও দিনই সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু ইহার পর দুজনে একপ্রাণ হইয়া শিশিরের এই অপকার্য্যের নিন্দাবাদ ও তাহাতে খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন আর কিছু হইল না। পরের দিন সকালে তাহারা আবার জটলা করিয়া বসিল; আবার কান্নাকাটি চলিল।

শিশির সেদিন খাইয়া আফিসে গেলে তারা আবার বসিল। তখন দিলীপ পিসিমার কাছে পয়সা চাহিতে আসিল।

পিসিমা সাশ্রুলোচনে দিলীপকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ও বৌদিদি গো, কোথায় গেলে গো।"

মালতীও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিল। দিলীপ একেবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। সে ছেলেমানুষ, উজ্জ্বল আনন্দে ভরা তার প্রাণ, তার মনে দুঃখ কোনও স্থায়ী আঁচড় কাটিতে পারে না। তাই সে এ দুই বছরের মধ্যে মায়ের মৃত্যুশোক এমন পরিপূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল যে, তার কাছে এই সব শোকোচ্ছ্বাস অত্যন্ত বিসদৃশ অভিনয় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহাকে লইয়া এমন অভিনয় অনেক হইয়া গিয়াছে। সে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সে মোটের উপর বেশ গম্ভীরভাবে এ সব ব্যাপারে আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া যায়। কিন্তু তবু এতদিন পরে হঠাৎ সেই পুরাতন শোকের পুনরুচ্ছ্বাসে তার গাম্ভীর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। বিশেষ, তার এখন স্কুলে যাইবার তাড়া। তাই সে অল্পক্ষণ বাদেই বলিল, "পিসিমা, আমায় পয়সা দিন, স্কুলের বেলা হ'য়ে গেল।"

"আর বাছা স্কুলে যাবি কি? এদিকে যে তোর কপাল ভাঙ্গতে ব'সেছে," বলিয়া পিসিমা আর এক ছোট হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

দিলীপ ইহাতে চমকিত হইল। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পিসিমা, কি হ'য়েছে?"

মালতী বলিল, "তোমার বাবা যে বিয়ে ক'রছে আবার খোকা বাবু!"

কথাটা দিলীপের মনে একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। কি সর্ব্বনাশ! এও কি সম্ভব? তার বাবা কি কখনও এমন অপকার্য্য করিতে পারেন? বিমাতা সম্বন্ধে তার আতঙ্ক বাঙ্গলা দেশের কোনও বালকের চেয়ে কম

ছিল না। শিশুকালে যে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনিয়াছে, ডালিম-কুমারের কথা পড়িয়াছে—রামচন্দ্রের প্রতি কৈকেয়ীর কঠোর নির্য্যাতনের কাহিনী শুনিয়াছে। কাজেই বিমাতা যে মহাশত্রু, একথা তার মনে স্বতঃসিদ্ধরূপেই বরাবর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার বাবা যে তার উপর এতবড় শত্রুতা করিবেন, বাড়ীতে বিমাতা-শত্রুর আমদানী করিবেন, একথা তার বিশ্বাস হইল না। একথা শুনিয়াই সে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু প্রথম আঘাতের বেগটা কাটিয়া গেলেই সে বলিল, "যাঃ মিথ্যা কথা। কে বলেছে? বাবা কক্ষনো বিয়ে করবেন না।"

মালতী বলিল, "হাঁ, খোকা সত্যি! আমি নিজে কাণে শুনেছি। ঐ বিনোদ বাবু এসেছিলেন সম্বন্ধ ঠিক করতে, কথা পাকা হয়ে গেছে। শীগিগরই বিয়ে হবে! মা গো কোথায় তুমি মা! তোমার সোণার সংসার কি হতে চল্ল মা, তোমার ছেলের কি উপায় হ'বে তা' দেখছো না মা!" বলিয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া বালক দাঁড়াইয়া রহিল, তার পিতার উপর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই এক কথায় একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। পিতা তার দেবতা, তার প্রিয়তম সুহৃৎ, তার সকল আনন্দের উৎস, সকল গর্ব্বের আশ্রয়! সেই পিতা তার এই? বন্ধু-বান্ধব ও অন্য লোকের মুখে মুখে সে সদা সর্ব্বদা যে কথা শুনিয়াছে তাহাতে তার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইয়া গিয়াছিল যে, যারা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে বিশেষতঃ পরিণত বয়সে, তারা পরম অশ্রদ্ধার পাত্র। এমন সব লোকের নামে কত কুৎসা সে শুনিয়াছে, সেও যে কত লোককে কত পরিহাস করিয়াছে, যে মুখে সে যোগেন মিত্তির ও নরেন দাসের নামে কুৎসা নানা রঙ ফলাইয়া বন্ধুমহলে পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, সেই মুখ সে ইহার পর লোকের কাছে দেখাইবে কেমন করিয়া?

পিসিমা বলিলেন, "আহা বাছারে আমার, তোর কপালে কত দুঃখই ভগবান লিখেছেন। নইলে এমন মা তোর, তোকে ফেলে চলে গেল! এমন বাপ, তার এমনি মতিচ্ছন্ন ধরলো।" তার পর কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর প্রবোধ লাভ করিয়া "শোন বাবা, তুই এক কাজ কর। আজ বিকেলে তোর বাবা আফিস থেকে এলে তুই বলিস্ যে, তুমি যদি বিয়ে কর, তবে আমি বিষ খাব, নয় বিবাগী হ'য়ে যাব! তা হ'লে আর সে বিয়ে ক'রতে সাহস ক'রবে না।"

ইহার পর পিসিমা ও মালতীতে মিলিয়া এই ভাবের নানা কথাবার্ত্তা তাহাকে শিখাইতে লাগিলেন।

এসব কথা দিলীপের মনের কাছ দিয়াও গেল না। ছি! সে গিয়া তার বাপকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিবে! তার করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবে! বাপমার সে একমাত্র ছেলে, চিরদিন আদরে-সোহাগে মানুষ হইয়াছে—সকল সমাদর তার অবশ্য প্রাপ্য বলিয়াই সে চিরদিন জানিয়াছে। আদর সে যাচিয়া লইবে! বাপ যদি তার মুখের দিকে না চান, তবে কি সে তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করিবে! ছিঃ!

নিদারুণ অভিমানে তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে পিতা যদি এমন কাজ সত্য সত্যই করেন, তবে সে আর তাঁর মুখ দর্শন করিবে না। নিজের উপর কোনও অকথ্য নির্য্যাতন করিয়া সে পিতাকে শাস্তি দিবে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একথা তাঁকে কোনও দিনই বলিবে না।

সে কোনও কথা না বলিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। মালতী তার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া তাকে পয়সা দিয়া, সে তাহা হাতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ছাই পয়সা! তার পুত্রত্বের সমাদর যেখানে নাই, সেখান হইতে পয়সা সে লইবে না।

সেদিন স্কুলে দিলীপ কোনও পড়াই বলিতে পারিল না। সে ক্লাশের সব চেয়ে ভাল ছেলে। তার ত্রুটিতে মাষ্টার ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর মনে হইল ছেলেটা খারাপ হইয়া যাইতেছে—সে সিগারেট খায়, এমন একটা কথা মাষ্টারের কাণে উঠিয়াছিল। তাই তিনি দিলীপকে তিরস্কার করিলেন! দিলীপ কারও কাছে তিরস্কারে অভ্যস্ত নয়, তাতে আবার সেদিন তার সমস্ত অন্তরাত্মা সারা জগৎটার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে চটাং চটাং কথা বলিয়া মাষ্টারের তিরস্কারের উত্তর দিল। মাষ্টার তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ দিলেন। দিলীপ দাঁড়াইল না। মাষ্টার বলিলেন, "বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।"

দিলীপ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আপনার দরকার হয় আপনি দাঁড়ান—I don't care a fig—"

মাষ্টার ক্ষিপ্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। দিলীপের দুই কাণ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন।

দিলীপ ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিল। চট করিয়া মাথা ঘুরাইয়া সে মাষ্টারের হাতে খুব জোরে কামড় বসাইয়া দিল। মাষ্টার চীৎকার করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

দিলীপ উঠিয়া তার বই খাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের কাছে গিয়া বই খাতা ছড়াইয়া ফেলিয়া সে সোজা মাঠের দিকে ছুটিয়া পলাইল।

ঠিক সেই সময় ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেদিন আর কিছু হইল না। কিন্তু দিলীপের এই অসমসাহসিকতা ও দুর্বিনীত আচরণে সমস্ত স্কুল শুদ্ধ ছেলে একেবারে স্তব্ধ ও অবাক হইয়া গেল। কাল যে একটা ভয়ানক কাণ্ড হইবে, সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ রহিল না—নূতন হেড মাষ্টার ম'শায় যে ভয়ানক শক্ত লোক, ডেপুটির ছেলেই হউক, আর যাই হউক,

তার হাতে দিলীপ নিস্তার পাইবে না, সবাই এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্কুল ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে দিলীপ রেলওয়ে ষ্টেসনের দিকে চলিল। অনেক দুর গিয়া ক্লান্ত হইয়া নির্জ্জন পথে একটা বাগানের ভিতর ঢুকিয়া সে বসিয়া পড়িল। তখন তার বুক ঠেলিয়া দারুণ কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া কাঁদিল।

* * * *

সেদিন শিশির খুব সকাল সকাল কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিল। একটা সুটকেসের ভিতর কিছু কাপড়-চোপড় লইয়া রামধারী খানসামার সঙ্গে তখনি সে কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

পিসীমা ও মালতী এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ব্যাপার কি ? আজই কি বিবাহ করিতে গেল নাকি ? মালতী প্রথম এ সন্দেহ প্রকাশ করিল, কিন্তু পিসিমা খানিক ভাবিয়া স্থির করিলেন, না, এ হয়না। কাল কথা হইল আজই বিবাহ, এ একটা কথাই নয়, বোধ হয় আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ কিছু হইবে। সুতরাং এখনো সময় আছে। হতভাগা ছেলেটা যদি আজ স্কুলে না যাইত, তবে এখনি তো সে বাপকে চাপিয়া ধরিতে পারিত। যাক গে' এখনও সময় আছে। সুতরাং দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন কি রকম করিয়া বিবাহটা বন্ধ করা যায়।

ফন্দীটি ঠিক যখন পাকাপাকি হইয়া আসিল, তখন তাঁরা দিলীপের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! দিলীপকে খুব করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া তালিম দিয়া ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু দিলীপটা যে ছাই আসে না। তার স্কুল কি আর মিটে না ?

রমেন স্কুল হইতে আসিলে পিসীমা বলিলেন, "কিরে, তুই একা যে ? খোকা কই ?"

"কেন ? সে আসে, নি ? সে তো আমার আগে আগে ছুটে' এসেছে। আজ সে স্কুলে যা' কাণ্ড ক'রে এসেছে !"

"কি, কি ক'রেছে ?"

রমেন সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। রমেন দিলীপের চেয়ে দুই বছরের বড় হইলেও সে দিলীপের সঙ্গেই সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িত। সুতরাং সে সমস্ত অবস্থা অবগত ছিল।

সে বলিল, "শুনলাম হেডমাষ্টার ব'লেছেন, কালকে দিলীপকে হাত বেঁধে চাব্‌কে স্কুল থেকে রাষ্টিকেট ক'রে দেবেন।"

মালতীর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সে বলিল, "ও মা! কি সর্ব্বনাশ। বাছার কি হবে গো ?"

উমা বলিলেন,"ঈস্‌! করলেই হল আর কি! কাল ওকে স্কুল যেতে দিচ্ছি আর কি ? আসুক দাদা,তার পর দেখে নেবো সে কত বড় হেড্‌মাষ্টার।"

রমেন বলিল "না মা, এ হেড্‌ মাষ্টার বড় শক্ত লোক। আর এ নাকি ডিরেক্টারের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। তাই সে কাউকে ভয় করে না। প্রিন্সিপ্যালকে পর্য্যন্ত সেদিন ধমকে দিল !"

হেড্‌ মাষ্টার সম্বন্ধে এমনি সব নানা উপন্যাস ছেলে মহলে চলিত ছিল।

"আচ্ছা দেখা যাবে কে কত বড় ডিরেক্টর ফিরেক্টর। দাদা তার ধুরধুড়ি নাড়িয়ে দেবে। তা, যাক, সে ছোঁড়া গেল কোথায় ! তার বিলম্ব দেখিয়া ক্রমে তাহারা ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে রমেন ও তিন চারটি চাকর চারিদিকে ছুটিল দিলীপের খোঁজ করিতে।"

যখন একটির পর একটি লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল যে, দিলীপকে তারা খুঁজিয়া পায় নাই, এবং মালতী থাকিয়া থাকিয়া শেষে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সেই সময় পেস্কার ললিতবাবু আসিয়া পিসিমার সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিলেন।

ললিতবাবু পিসিমাকে নিদারুণ সংবাদ দিলেন। শিশির কলিকাতায় গিয়াছেন বিবাহ করিতে। আজ রাত্রে বিয়ে, কাল সন্ধ্যাবেলায় বাবু বউ লইয়া ফিরিবেন। বাবু কারও কাছে কথাটা প্রকাশ করেন নাই, কেবল ললিতবাবুকে গোপনে বলিয়া গিয়াছেন ; উমা যেন কাল সন্ধ্যাবেলায় বউকে বরণ করিবার আয়োজন করিয়া রাখেন। কথা শুনিয়া উমা একেবারে বসিয়া পড়িল। একবার ভাবিল যে, এখনও যদি ছেলেটা আসিয়া পড়িত, তবে তাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া একটা হিল্লে করিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হতভাগা এই সময়েই এমন একটা কাণ্ড বাধাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যাক্ ! আর কি উপায় করা যাইবে। এখন আর কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই। এখন উপস্থিত ক্ষেত্রে নূতন বউয়ের সঙ্গে ভাব করিয়া তাকে হাত করিবার চেষ্টাই একমাত্র উপায়। সুতরাং তিনি এই পথে তাঁর চেষ্টা ও শক্তি পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময় দিলীপ ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তার অঙ্গ অবসন্ন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে চক্ষু ফুলাইয়াছে। সে নীরবে আসিয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। পিসিমা আর তার খোঁজ করিলেন না, এখন তিনি নূতন ভ্রাতৃবধূর আয়োজনে ব্যস্ত।

দিলীপের প্রাণটা কেবল অক্ষম রোষে পাশবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিতেছিল। সে কিছুই করিতে পারে না, কারও কোনও ক্ষতি করিতে পারে না, পিতাকে শাস্তি দিতে পারে না, মাষ্টারকেও শাস্তি দিতে পারে না। যদি সে কোনও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে পারিত, একটা মন্ত্র বা ইন্দ্রজালবলে সে হঠাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিত— তবে সে কি না করিত ?

এখন তার সম্মুখে চারিদিক অন্ধকার মনে হইল। তাহার পিতার

বিবাহের চেয়ে আপাততঃ বড় হইয়া উঠিল তার স্কুলে কৃতকর্ম। সে কোনও দোষ করে নাই, দোষ ষোল আনা মাষ্টারের এ বিষয়ে তার বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষীণ হয় নাই। তবু এখন তার একথা মনে হইল, যে কাল তার এ কাজের ফল ভোগ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম তার কৃতকর্ম্মে সে বেশ একটু পৌরুষের গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তার মন এ গর্ব্বটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অবশ্যম্ভাবী শাস্তির নিদারুণ কল্পনায়। সে যাহা করিয়াছে এখনি হয়তো তাহা সর্ব্বত্র জানাজানি হইয়া গিয়াছে, হয়তো তাহা বাবার কাণেও গিয়াছে। বাবা যখন তাকে ডাকিয়া বলিবেন, যে এ কাজ বড় অন্যায় হইয়াছে, তখন তো সে মুখ লুকাইবার পথ পাইবে না। শিশির কখনও তাকে তিরস্কারও করেন না। কিন্তু সে কোনও অন্যায় করিলে যে তিরস্কারপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চান, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। তাই সে পিতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য চুপচাপ বাড়ীতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া সে প্রতিমুহূর্ত্তে পিতার আহ্বানের আশঙ্কা করিতেছিল। আর ভাবিতেছিল কাল কি হইবে। কাল হেড্ মাষ্টারের সামনে তার যে লাঞ্ছনা হইবে, তার বিস্তারিত বিবরণ কল্পনার চক্ষে দেখিয়া গেল—তার অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর মালতী সন্ধান পাইয়া তার কাছে আসিয়া খাইতে ডাকিল। সে নীরবে উঠিয়া খাইতে গেল। তাড়াতাড়ি খাইয়া সে আবার আপনার ঘরে আসিল। মালতী পিছু পিছু আসিল।

মালতী বলিল, “আজ স্কুলে কি কাণ্ড করে এসেছ খোকা বাবু?”

“আমার যা ইচ্ছে তাই ক’রেছি তাতে তোর কি?”

“আমার নয় কিছু নাই হ’ল। তা যা’ক যা ক’রেছ। কাল আর

তোমার ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই। হেড্‌মাষ্টার কাল তোমাকে ভারি শাস্তি দেবে বলেছে।”

দিলীপের মনটা একথায় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলিল, “আচ্ছা সে দেখে নেবো, তোর সেজন্য ভাবতে হ’বে না।”

তার পর আস্তে আস্তে বলিল, “হাঁ মালতীদি, বাবা শুনেছেন ?”

গম্ভীরভাবে মালতী বলিল, “না।”

“বাবা শুয়েছেন কি ?”

“আ পোড়াকপাল ! বাবা কোথায় তোমার যে শোবে ?” মালতী কাঁদিয়া ফেলিল।

দারুণ আশঙ্কায় দিলীপ বলিল, “কেন কি হ’য়েছে ?”

“আর কি হ’য়েছে। পোড়ারমুখো আজ রাত্রে বিয়ে ক’রতে গেছে।” বলিয়া মালতী চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিলীপ ধপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার ভাবনা চিন্তা সব ভয়ানক এলোমেলো হইয়া গেল। একবার তার নিদারুণ ক্রোধ হইল, পরক্ষণেই দারুণ দুঃখের স্রোতে তার সব ক্রোধ ধুইয়া গেল। আবার দুর্জ্জয় অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল—সে এ অবিচার—এ হীনাচারের প্রতিকারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অসম্ভব অসম্ভব প্রতিকারের কল্পনা তার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই তার কাছে অসম্ভব মনে হইল না !

সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিস ভিজাইল, নিদারুণ ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেষরাত্রে সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

বিনোদকে শেষ কথা দিয়া অবধি শিশিরের মনে এক ফোঁটা শান্তি ছিল না। মিনতিকে লাভ করিবার যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা তাকে এতদিন পাগল করিয়া রাখিয়াছিল,তাহা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল নিদারুণ বিষাদে। তার এক ফোঁটাও সন্দেহ রহিল না যে, সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা দারুণ অপকার্য্য, একটা প্রকাণ্ড হীনতার কাজ। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। সে যাহা করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এখন বিবাহ না করিলে মিনতির পক্ষে একটা নিদারুণ কলঙ্ক ও অপমানের কথা। কাজেই তার আর ফিরিবার পথ নাই। তাই সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, যেন যূপকাষ্ঠের কাছে বলির পশুর মত।

আফিস হইতে ছুটি লইয়া যখন সে বাড়ী আসিল, তখন তার স্নায়ু-মণ্ডলীর অত্যন্ত তীব্র উদ্বেগের অবস্থা। তার ভয়ানক ভয় হইতে লাগিল, কখন বা দিলীপ আসিয়া পড়ে। এখন আর দিলীপের চোখের সামনে দাঁড়াইতে তার সাহস ছিল না। তাই রামধারী খানসামাকে তাড়াতাড়ি কয়েকখানা কাপড় গুছাইতে বলিয়া সে টাকাকড়ি বাহির করিয়া লইল। তার পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়িয়া গেল। তিনটার ট্রেনে সে কলিকাতা চলিল।

বিনোদ বিবাহের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সুমতি তো ছিলই, তার পর তার আর দুই বোন এবং ভাজেরা আসিয়াছিল। তারা শিশিরকে যাত্রা করাইয়া দিল এবং অনেক ঠাট্টা তামাসা করিয়া তাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া দিল। গভীর-মুখে শিশির সমস্ত উপদ্রব সহিয়া গেল।

শিশিরকে যাত্রা করাইয়া দিয়া মেয়ের দল মোটরে মেয়ের বাড়ী চলিয়া গেল, সেখানে খুব শান্তভাবে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

যখন মিনতির হাতখানা তার হাতের উপর রাখিয়া শিশির মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন তার হাতের ভিতর দিয়া এক অপূর্ব্ব শিহরণ সমস্ত শরীরের ভিতর প্রবাহিত হইল—সারাচিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার পরই দ্বিগুণ বিষাদে সে আচ্ছন্ন হইল। তার মনে হইল বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আর একদিনের কথা, যখন সে ঠিক এমনি করিয়া বিদ্যুৎকে ধরিয়াছিল। তার পর কুড়ি বৎসর বিদ্যুৎ তাহাকে কি সেবা কি স্নেহ কি প্রীতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রেমের মর্য্যাদা সে আজ এমনি করিয়া রাখিতেছে,—বিদ্যুতের ছেলের স্কন্ধে এক বিমাতা চাপাইয়া!

তার পর বিবাহান্তে বাসরে তার শ্যালী ও শালাজেরা আসিয়া অল্প কিছুক্ষণ হাসি তামাসা করিল, বেশী কিছু উৎপাত হইল না। মিনতিকে ধরিয়া মেজো বউ জোর করিয়া শিশিরের কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল, "নে তোর শিবের কোলে পার্ব্বতী হ'য়ে ব'স।"

শিশিরের বুক যেন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে বাম বাহু দিয়া মিনতিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, মেজ বৌ তাহাকে চাপিয়াই রহিল। কিন্তু শিশিরের সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটা প্রবল অশ্রুর ধারা তার মুখ প্লাবিত করিয়া দিল।

শিশিরের কান্না দেখিয়া সবাই ভড়কাইয়া গেল। তাহারা শিশিরের মনের ভিতর কোনও দ্বন্দ্বের খবর জানেনা, শিশির যে শেষ চিঠিখানা বিনোদকে লিখিয়াছিল; তার কথা পর্য্যন্ত তারা কেহ জানিত না। তারা জানিত পরস্পরকে দেখিয়া দুজনে পাগল হইয়া বিবাহ করিতেছে। কাজেই তাঁরা তাদের রহস্য করিবার বাসনা দমন করিবার কোনও চেষ্টা করে নাই। শিশির যখন কাঁদিয়া ফেলিল, তখন তাদের হঠাৎ জ্ঞান হইল যে

সে মৃতদার। তাকে লইয়া ঠিক এ সময় বেশী ঘাঁটান উচিত হইবে না।

তাই সুমতি তার ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়াদেরকে সে ঘর হইতে বিদায় করিয়া, শিশিরকে ছুটো স্নিগ্ধ কথায় শান্ত করিল। শিশিরের কান্না দেখিয়া তারও আজ কান্না পাইতেছিল বিদ্যুতের জন্য। তার স্নেহভরা বেদনাভরা সম্ভাষণে শিশিরের অন্তর কতকটা স্নিগ্ধ হইল। তার পর সুমতি চলিয়া গেল; তার আদেশে মিনতি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া মিনতি আসিয়া শিশিরের পাশে বসিয়া রহিল। শিশিরের কান্না দেখিয়া সে চমকাইয়া গিয়াছিল, শিশিরের জন্য তার দুঃখ হইতেছিল। এ কয়দিন সে এক মধুর স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটাইয়াছে। তার বাসনা যে অন্তর্য্যামী শুনিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ করিলেন, ইহাতে সে আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। সে চাহিয়াছিল স্বামী ও সুখের সংসার—চাহিয়াছিল শিশিরের মত স্বামী—চাহিয়াছিল শিশিরকে। সেই শিশির তার জন্য পাগল,এ আনন্দ রাখিবার তার ঠাঁই ছিলনা। শিশিরের ঘরের ঘরণী হইয়া, সে গৃহিণী হইবে, মা হইবে—নারীত্বের মাতৃত্বের চরম আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিবে, তার সার্থকতায় সে বিদ্যুতের গৌরবকে ম্লান করিতে পারিবে। বিদ্যুতের ছেলের মা হইয়া সে তাহাকে এত স্নেহ এত যত্নে ভরিয়া দিবে, এমন করিয়া মানুষ করিবে যে বাঙ্গলাদেশ হইতে বিমাতার কলঙ্ক চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে। আর শিশিরকে সে সুখী করিবে। তার রূপ নাই, তবু শিশির তার অন্তরের সম্মান করিয়াছে। সে সম্মানের প্রতিদান সে সারাজীবনের ঐকান্তিক সেবা ও সর্ব্বব্যাপী প্রেম দিয়া প্রতিদান করিবে। ভগবান তার সহায় হউন।

কতবার সে টেনিসনের কবিতার সেই চারটি লাইন ফিরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছে। সেই কয় ছত্র কবিতাকে আশ্রয় করিয়াই শিশিরের সঙ্গে তার

অন্তরের পরিচয়—সে কবিতা তার মাদুলীর মত করিয়া বুকের ভিতর গাঁথিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইত। দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সে তার 'লেখা'গুলি বার বার খুলিয়া দেখিয়াছে। তার সৌষ্ঠবযুক্ত ছাপা ও বাঁধাইয়ের ভিতর সে শিশিরের অতল প্রেমের রূপ দেখিতে পাইত ও মুগ্ধ হইত। তার নিজের কবিতাগুলি সে বার বার পড়িত, ও আনন্দে তার চিত্ত ভরিয়া উঠিত। সে আনন্দ যে শুধু সেগুলি তার নিজের লেখা বলিয়া তাহা নয়, তার দাম আরও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল এই জন্য যে, শিশির এ গুলির সমাদর করিয়াছে। তাই সে সেই ছাপার অক্ষরগুলি তার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিত।

আর শিশিরের সেই দুইখানা চিঠি। একখানা অতি সংক্ষিপ্ত তারই কাছে লেখা। তার কয়েকটি কথার ভিতর সে রসের অফুরাণ খনি দেখিতে পাইত। তার ছত্রে ছত্রে যেন শিশিরের লুকান প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আর বিনোদের কাছে শিশির যে চিঠি লিখিয়াছিল সে তো এক অমূল্য রত্ন। তার ভিতর যে শিশির তার সবখানি প্রেম উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। এ দু'খানি চিঠি মিনতি বার বার শতবার পড়িয়াও তৃপ্তি পাইত না।

এ কয়দিন শিশিরের ধ্যান করিতে করিতে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে শিশিরের সান্নিধ্যের লালসায় বিনোদের বৈঠকখানায় সেই আলাপ, সেই সান্নিধ্যের স্মৃতি তার চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিত আর সে বার বার মনে করিত, এখন আর একবার সে দেখিতে পায় না? এখন যদি শিশির চিঠি লেখে তার কাছে? ভাবিতে ভয় সঙ্কোচ ও আনন্দে তার প্রাণ কাঁপিত, নাচিয়া উঠিত। সে সত্য সত্যই শিশিরের কাছে একখানা চিঠির প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে চিঠির ভিতর কি লেখা থাকিতে পারে, তার সম্বন্ধে সে কতরকম কল্পনা করিত। চিঠী লিখিলে সে কি উত্তর দিবে?

ছি, কি লজ্জা! কিন্তু উত্তর দিতে তার ভারী ইচ্ছা হইতেছিল। শিশিরকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কি লিখিবে তার নানারকম মুশাবিদাও সে করিয়াছিল,—কিন্তু সবই মনে মনে।

পনেরই জ্যৈষ্ঠ তার বিবাহ হইবে একথা শুনিয়াছিল। সে এখনো প্রায় একমাস—বহুদুর। তার আগে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ হইবে—তিনি নিজে আসিবেন কি? যদি না আসেন? একমাস—এতদিন সে কি কেবল অপেক্ষাই করিবে? এমন সময় কাল বিনোদ হঠাৎ আসিয়া সংবাদ দিয়ে গেল, আজ বিয়ে—আজই শিশির আসিবে। তার বৌদিদিরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "সে কি! একদিনে কখনও বিয়ের উজ্জুগ হয়?" মিনতির ভারী রাগ হইতেছিল বৌদিদিদের এসব কথায়। যখন মুখুজ্জে ম'শায় বলিলেন, যেমন করিয়াই হউক উদ্যোগ করিতেই হইবে—তখন সে যেন বাঁচিল।

তখন হইতে সে এই মহামুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় অপূর্ব্ব পুলকে চিত্ত ভরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু—এ কি—?

যখন মেজ বৌদি তাকে শিশিরের কোলে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিল, মিনতি তখন প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল—লজ্জায়। কিন্তু আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল যখন সত্য সত্যই মেজবউ তাকে বসাইয়া দিল, তখন শিশিরের অঙ্গের স্নিগ্ধ স্পর্শে তার সমস্ত শরীরের ভিতর যে অভিনব হর্ষ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল তার অনুভূতিতে সে বিহ্বল হইয়া গেল! সে যেন কোন এক স্বপ্ন লোকের ভিতর ডুবিয়া গেল। কিন্তু শিশিরের অশ্রুপাত তাকে সে স্বপ্নের সুধাসাগর হইতে যেন চুলে ধরিয়া টানিয়া তুলিল। মিনতি ইহাতে ভীত চমকিত হইয়া গেল। এ কি—? এ তো তার স্বপ্নেও সে কখনও মনে করে নাই। স্বামীর ব্যথায় তার অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়া সে অনেকক্ষণ স্বামীর কাছে নীরবে বসিয়া রহিল এবং কয়েকবার অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল গভীর বিষাদে শিশিরের মুখ আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ মিনতি শিশিরের একটা কথার প্রতীক্ষায় রহিল। তার বুকের ভিতর অশেষ সান্ত্বনার কথা জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে কথা-গুলো গলায় ঠেকিয়া ফিরিতেছিল। শিশির একটা কথা বলিলেই তার সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে এই আশায় সে বসিয়া রহিল।

শিশিরেরও অনেক কথা মনে হইতেছিল সেও কেমন করিয়া কোন কথাটা বলিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কথাগুলি অত্যন্ত ভারী ভারী, বাসর ঘরের ঠিক উপযোগী নয়। প্রিয়ার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের যোগ্য কথা সে মোটেই নয়। তাই তার ভয়ানক বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

শেষে মিনতি বলিল, "আপনি শোবেন না ?"

শিশির বাঁচিল। "এই শুচ্ছি" বলিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মিনতি পাশে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে লাগিল। এ সেবায় শিশির বরাবর অভ্যস্ত,কাজেই ইহা তাহার চোখে বিশেষ ঠেকিল না, হঠাৎ তার ভ্রম হইল, যেন বিদ্যুৎই তার পাশে বসিয়া তার চিরাভ্যাস মত তাকে বাতাস করিতেছে। সে হাত বাড়াইয়া মিনতির হাতখানা চাপিয়া ধরিল—মিনতির সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ শিশিরের মুখ ভার হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়া দিল।

ইহাতে মিনতির অন্তরে আঘাত করিল। সে কতকটা আপনাকে সামলাইয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলিল, "আপনার বুঝি দিদির কথা মনে হ'চ্ছে ?"

"দিদি !—কোন দিদি ?"

"দিলীপের মা," বলিয়া মিনতি মাথা নীচু করিল। শিশির খানিক-ক্ষণ মিনতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,"হাঁ মিনতি, সে আমার বড় প্রিয় ছিল। তার জন্য তুমি কিছু মনে করো না মিনতি ?"

"ছিঃ, তা' কেন ক'র্‌তে যাব ?"

এই কথা ক'টায় যেন শিশিরের অন্তর অনেকটা স্নিগ্ধ হইয়া গেল; সে মিনতির মুখের দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, মিনতি তখন তার দিকে চাহিয়া ছিল, সে চক্ষু অবনত করিল। অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। অনেকক্ষণ পর মিনতি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি যদি দিদি হ'তে পারতাম !"

শিশির একথায় তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। মিনতির হাতখানা দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন একথা কেন বলছো মিনতি ?"

"এমনি মনে হ'ল। মনে হ'ল তা হ'লে আপনি এখন কত সুখী হ'তে পারতেন।"

"মিনতি, আমায় ক্ষমা কর। মনে করো না যে তোমাকে পেয়ে আমি খুব খুসী হইনি। আমার জীবন তোমাকে পেয়ে সার্থক হ'য়ে গেছে মিনু। তবু আজকের দিনে আমার তার কথা মনে হ'চ্ছে, কেন না সে তোমারই মত একদিন আমার জীবন সার্থক ক'রেছিল, আর কুড়িটি বচ্ছর সে আমার জীবন আনন্দে ভরে' দিয়েছিল।"

মিনতির চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে একটু থামিয়া বলিল, "দিদি আপনাকে যা' ক'রেছেন আমি তা' কোথা থেকে পারবো, তিনি ছিলেন দেবতা। তাঁর কথা বড়দির কাছে সব শুনেছি আমি।"

"শুনেছ—দেখেছ তাকে কোনও দিন মিনু ?"

"একদিন দেখেছিলাম বড়দির ওখানে, কি সুন্দর চেহারা ছিল

তাঁর! এত বয়েস হয়েছিল, কিন্তু যেন পরীটীর মত—আর মুখে হাসি লেগেই আছে।"

মিনতির মুখে বিদ্যুতের প্রশংসা শুনিয়া শিশিরের ভারী তৃপ্তি হইল তার মনের ময়লা ধীরে ধীরে ধুইয়া গেল। সে উৎসাহের সহিত এ আলোচনায় যোগ দিল। দু'জনে মিলিয়া বিদ্যুতের রূপগুণ, তার কাজ কর্ম্ম খুঁটি নাটি করিয়া আলোচনা করিল। পরম আনন্দে সময় কাটিল।

মিনতি বলিল, "আমার আশ্চর্য্য লাগে যে অমন অপ্সরার মত স্ত্রীর স্বামী হ'য়ে আপনি কি দেখে এ কালো পেত্নীকে, পছন্দ ক'রে ব'সলেন!"

"হাঁ পেত্নীই বটে! মিনু, তোমাদের বাড়ীতে কি আরসী নেই, নিজের মুখখানা দেখনি কোনও দিন? ওই চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখনি?" বলিয়া মিনতিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া শিশির তার দু'টি চোখের উপর দু'টি চুম্বন দিল, মিনতি আবেশ বিহ্বল হইয়া বুকের ভিতর লতাইয়া গেল। এ কি আনন্দ! কি সুখ! সে সকল প্রাণ মন দিয়া স্বামীর দেহের সুস্নিগ্ধ স্পর্শ উপভোগ করিল।

শিশির বলিল, "তাছাড়া মিনু তুমি যে তোমার সেই খাতাখানা ঘুষ দিয়ে আমার প্রাণটা কেড়ে নিয়েছিলে।"

"ছাই খাতা! তা ছাড়া আমি তো দি নি, আপনি তো চুরী ক'রে নিয়েছিলেন। যখন 'লেখা' ছাপা হ'য়ে বের হ'ল তখন আমি মুখুজ্জে মশায়ের কাছে গিয়েছিলেম, আপনার নামে নালিশ করবো বলে।"

"গিয়ে বুঝি শুনতে পেলে যে নালিশ করবার আগেই আমার সর্ব্বস্বের উপর ডিক্রীজারি করে বসে আছ।"

মিনতি মাথা নীচু করিয়া বলিল, "না তাঁরা আমাকে কিছু ভাঙ্গেন নি, আমি বাড়ীতে এসে শুনলুম। আপনি কিন্তু ভারি—ইয়ে—আপনি

মুখুজ্জে ম'শায়ের কাছে ও সব অমন ক'রে লিখতে পারলেন কেমন ক'রে। আমার ভারি লজ্জা করছিল।"

এতক্ষণে শিশির বলিল, "মিনতি, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে আছে—দেবে কি ?"

"কি ব'লছেন !"

"ওই আপনি কথাটাকে এখনি নির্ব্বাসন ক'রতে হবে তোমার মুখ থেকে।"

মিনু মুখ ঢাকিয়া বলিল, "যান আপনি বড় দুষ্টু" তার পর বলিল, "এখন পারবো না আপনি হ'য়ে যাবে।"

"কিন্তু এখনি যেতে হ'বে—এ আমার শিবের ভিক্ষে—না নিয়ে ছাড়বো না।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলিল, "আচ্ছা যান্, আপনি তুমি।"

"এই যে সেই সত্যেন দত্তের কবিতা হ'ল "দিদি তুমি তুই।" দুইজনে হাসিয়া উঠিল।

আবার কথায় কথায় মিনতির রূপের কথা উঠিল।

মিনতি বলিল, "আচ্ছা আমাকে মিথ্যে flattery করতে হ'বে না। আমার যে রূপ, তা' আমার জানা আছে। আপনার—ইয়ে—তোমার যে কি দেখে আমায় পছন্দ হ'ল তাই ভাবি। বোধ হয় খুব খিদে পেলে যেমন লোকেয় ভাল মন্দ বিচার থাকে না, আপনার—ইয়ে—তোমার সেই অবস্থা হ'য়েছিল। Any port in a storm না ?"

"আজ্ঞে না ম'শায় ! বরঞ্চ অনেক part আমার কাছে এসে পায়ে ধ'রে সাধাসাধি ক'রে গেছে, আমাকে টলাতে পারে নি। শিবের তপস্যা উমাই ভাঙ্গতে পেরেছিল।"

তার পর শিশির বলিল, "তোমাকে দেখেই আমি একরকম পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম ঠিক। কিন্তু তবু অনেক কষ্টে আপনাকে ঠিক রেখে-ছিলাম। শেষ মত স্থির ক'রলাম কিসে জান? তোমার একটা কবিতা প'ড়ে।"

"তাই নাকি? আমার কবিতার এত শক্তি? আমি তাহ'লে একজন বায়রণ শেলীর গোত্রের ব'লতে হ'বে। আচ্ছা কোন কবিতাটা প'ড়ে তোমার মনটা গ'লেছিল শুনি।"

"সেই যে তুমি লিখেছ,—

মা ক'রে আমারে বিধি
জনম দিয়াছ যদি
এই স্বধু মাগি আশীর্ব্বাদ,
আমার মায়ের স্নেহে
নাহি থাকে সীমার বিবাদ।
জঠরে সন্তান আসি
কেড়ে যদি লয় স্নেহ
অপুত্রেরে দূরে দেয় ঠেলে
আমার সন্তান দিও
হে বিধাতা অপরের কোলে।

মিনতি, আমি তোমাকে ভাল বেসেছিলাম। আমার দরকার ছিল প্রিয়ার—সে আকাঙ্ক্ষা তুমি তৃপ্ত ক'রতে পারবে জানতাম। কিন্তু আমার মাতৃহারা পুত্রের দরকার একটি মার, এই কবিতায় জান্‌তে পার্‌লাম তুমি তার মা' হ'তে পারবে। আর কোনও দ্বিধা রইলো না।"

কথাটা শুনিয়া মিনতি গম্ভীর হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে একটু ভারী গলায় সে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তার মা হবার যোগ্য হ'তে পারি।

শিশির আবার তাকে বুকের ভিতর চাপিয়া বলিল, "তা পারবে মিনু, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, আর আমাদের সামনে এসে আজ তোমার দিদিও নিশ্চয় তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন। দিলীপের মা হওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। তাকে দেখে কেউ ভাল না বেসে পারে না। সেও বড় সহজে ভালবাসার কাছে ধরা দেয়।

ইহার পর তাদের যা কথাবার্ত্তা হইল, সব দিলীপকে লইয়া। শিশির ছিল পুত্রগত প্রাণ। সে শতমুখে দিলীপের সুখ্যাতি করিয়া গেল, তার জীবনের সুদীর্ঘ বৃহৎ আলোচনা করিল। মিনতি পরম আগ্রহভরে এই আশ্চর্য্য ছেলের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া গেল। ছেলের গর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তও ভরিয়া উঠিল।

১০

বউ লইয়া শিশির যখন নীরবে বাড়ীতে আসিয়া উঠিল, তখন বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। উমা হাসিমুখে বধূকে সম্ভাষণ করিয়া লইল, তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে উঠাইল। কেবল মালতী তার আপনার ঘরে পড়িয়া আছাড়ি বিছাড়ি করিতে লাগিল—তার বুকভরা কান্নার শব্দ সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

শিশির বাড়ীর ভিতর গেল না, বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিল। বাড়ীতে ঢুকিতে তার ভারি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। দিলীপের সামনে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তার পড়িবার টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, সে তার সামনে মাথা হাতের ভিতর গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল।

বধূকে বরণ করিয়া পিসীমা দিলীপের খোঁজ করিলেন। মিনতিকে দিয়া তার কাণে মধু দেওয়াইতে হইবে, সে তার মাকে প্রণাম করিবে। মিনতিও ব্যগ্র হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখা গেল দিলীপ বাড়ী ফেরে নাই। উমা বলিলেন, "কি দস্যি ছেলে বাবা, আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলো। কাল এই এক কাণ্ড ক'রে এলো—আজ আবার কোথায় পালিয়েছে। বাড়ীতে যদি এক দণ্ড থাকবে। বাপ ওকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছেন।"

উমা আন্দাজ করিল যে সপত্নীপুত্র সম্বন্ধে এমনি কটূক্তি নূতন বধূর কাছে প্রীতিকর হইবে। কিন্তু মিনতির এ কথা ভাল লাগিল না। এ অপ্রিয়ভাষিণী ননদিনীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় সে স্বামীর কাছে ইতিমধ্যেই পাইয়াছিল। তার মুখে এই বিষোদ্গার শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় রমেন আসিয়া বলিল, "মা, খোকাকে তো কোথাও পেলাম না। সে গেল কোথায় ?"

ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, যে আজ সকালে যদিও দিলীপ রীতিমত আহারাদি করিয়া স্কুলে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, তবু সে বাস্তবিক স্কুলে যায় নাই। রমেন তার আগেই চলিয়া গিয়াছিল। তার পর দিলীপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে মালতী তাকে সাধ্যসাধনা করিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল,কেন না আজ তার শাস্তি হইবার কথা। দিলীপ কোনও কথা শোনে নাই, সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে স্কুলে যায় নাই।

রমেন তাহাকে স্কুলে না দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে শাস্তির ভয়ে স্কুলে যায় নাই। বাড়ী ফিরিয়া যখন সে শুনিল যে দিলীপ স্কুলে গিয়াছে, তখন সে কথাটা কাহারও কাছে ভাঙ্গিল না। মনে করিল, দিলীপ বুঝি কোনও বন্ধুর বাড়ী লুকাইয়া আছে। স্কুলে যে যায় নাই সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করিতে চায় না। সেই জন্য সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া খাবার খাইয়া দিলীপের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। সকল সম্ভব ও অসম্ভব স্থানে সন্ধান করিয়াও যখন তাহাকে সে পাইল না, তখন ভয় পাইয়া রমেন আসিয়া তার মার কাছে কথাটা প্রকাশ করিল।

পিসীমা শুনিয়া ভারি চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখ দিকিনি ডানপেটা ছেলের কাণ্ড। বাড়ীতে আজ নতুন বউ এসেছে, সে দিক দেখবো, না এই দস্যি ছেলের পিছনে ছোট। চুলোয় যাকগে। আসবে এখন কালকের মত রাতদুপুরে। কোন পাড়ায় টো টো ক'রতে গেছে।" বলিয়া অপাঙ্গে একবার নববধূর দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে পিসীমা সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

মিনতির কিন্তু বড় ভয় লাগিল। সে রমেনকে বলিল, "কোথাও তুমি পেলে না তাকে ? সব জায়গায় গিয়েছিলে ?"

"হাঁ মামী মা।"

"কি সর্ব্বনাশ! শিগ্‌গীর তুমি গিয়ে তোমার মামাবাবুকে বল গে।"

"মামাবাবু যে রাগ ক'রবেন। সে যে"—

"না, না রাগ ক'রবেন না, যাও তুমি তাঁকে বল গে।"

রমেন ভয়ে ভয়ে গিয়া শিশিরের কাছে কথাটা বলিল।

দিলীপকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, এ কথা শুনিয়াই শিশির লাফাইয়া উঠিল। তার মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল—সে বসিয়া পড়িল। তার পর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে রমেনকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে স্কুলে শাস্তি পাইবার ভয়ে কোথাও পলাইয়া আছে, এইরূপ তার মনে হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শিশির বাইসিকলে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নানাস্থানে সে কোনও সন্ধান না পাইয়া শেষে থানায় গেল। ইনস্পেক্টার বাবু তাহাকে মহা সমাদর করিয়া বসাইলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা চলিল। ইনস্পেক্টার বাবু কয়েকটি কনষ্টেবলকে চারিদিকে সন্ধান করিতে পাঠাইলেন।

তার পর নিরাশ-হৃদয়ে শিশির বাড়ী ফিরিল। বাইসিকেল হইতে নামিয়া সে টলিতে টলিতে কোনও রকমে আসিয়া ঘরে ঢুকিল সেখানে একখানা ইজি চেয়ারে চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িল। তার আর ভাবিবারও শক্তি ছিল না। শূন্য-দৃষ্টি লক্ষ্যহীনভাবে শূন্যে নিবদ্ধ করিয়া সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

বাড়ীর ভিতর মিনতি একলা বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। উমাকে সে কোনও কথা বলিতে ভরসা পাইল না। সে রমেনকে দিয়া মালতীকে ডাকিয়া পাঠাইল। খোকা নাই এ কথা শুনিয়াই মালতী তড়্ বড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। রমেন যখন তাকে নতুন গিন্নীর আহ্বান জানাইল

তখন তার সমস্ত মনটা বিষ হইয়া গেল। তবু মনিব—তার কথা না শুনিলে নয়। সে মিনতির কাছে গেল।

মিনতি তখন অঞ্চল দিয়া কেবলি চক্ষু মুছিতেছে। তার বুক ঠেলিয়া দুর্নিবার কান্নার বন্যা ছুটিয়াছিল, সে কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে যে হৃদয়ভরা স্নেহ লইয়া দিলীপকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে—আর এ গৃহে তার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে পুত্র কোথায় গেল? যদি তাকে না পাওয়া যায়? যদি সে ফিরিয়া না আসে? তবে কি নিদারুণ অভিশাপ লইয়া তার জীবন কাটাইতে হইবে। শিশিরের বুকে যে তাতে কি দাগা লাগিবে, সে কথা সহজেই অনুমান করিল—তার ব্যথার কথা ভাবিয়া মিনতির প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠিল। তা ছাড়া সে যদি এ বাড়ীতে এমন অমঙ্গল বহিয়া আনে, তবে সে এখানে বাস করিবে কেমন করিয়া। এমনি নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট নানা আশঙ্কায় তার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই মিনতি কাঁদিতেছিল।

মিনতিকে কাঁদিতে দেখিয়া মালতীর মনটা একটু নরম হইল। সে আসিয়া মিনতির পায়ের ধূলা লইল।

মিনতি বলিল, "মালতী, খোকা গেল কোথায়?"

মালতী কাঁদিয়া বলিল, "কি জানি মা, কোথায় সে গেল। বাছাকে আমি কত করে হাতে ধরলাম—ব'ললাম যাসনে বাছা আজ! সে শত্রুর মনে আছে আমাকে সাজা দেবে—তা সে কি শোনে?"

মিনতি বলিল, "তুমি একবার বেরিয়ে দেখ না মালতী? তুমি হয়তো খুঁজলে পাবে। তোমার ডাকে সে আস্‌বে!"

মালতীর চিত্ত মিনতির উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যাই মা! কি আর করবো, ঘুরে ঘুরে দেখি তবু।"

অনেকক্ষণ বাদে মালতী ঘুরিয়া আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে

বসিল। মিনতিও কাঁদিতে লাগিল সে কেবল বার বার বাহিরে লোক পাঠাইয়া খোঁজ করিতে লাগিল, বাবু আসিয়াছেন কিনা ? বার বার সে শুনিল শিশির আসেন নাই। তখন সে শিশিরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল। এত রাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁর নিশ্চয় অসুখ হইয়া পড়িবে, তা ছাড়া মনের এ দারুণ উদ্বেগে একলা একলা বেচারা কি কষ্ট না জানি পাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি ঘুমাইয়া পড়িল। যখন শিশির আসিল, তখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি যখন তুইটা তখন সে ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তার পাশে উমা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছেন, সে তাকে ডাকিতে সাহস করিল না। নিজেই উঠিয়া দরজা খুলিল। দরজা খোলার শব্দে উমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন "কে ?"

মিনতি বলিল, "আমি। খোকাকে পাওয়া গেছে ঠাকুরঝি ?"

"না, তা, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"উনি কোথায় ?"

"দাদা নীচের ঘরে আছেন।" মিনতি বাহির হইয়া যায়, দেখিয়া উমা উঠিয়া বলিল, "তুমি তার কাছে যেওনা বউ, আজ রাত্রে সোয়ামীর সঙ্গে দেখা করতে নেই।"

"আমি শুধু খোকার খবরটা জানতে যাচ্ছি।"

"না না সে করো না ; তাঁর অমঙ্গল হবে।" ইহাতে মিনতি থমকিয়া দাঁড়াইল। যদিও মিনতি মেয়েলী শাস্ত্রের এতশত বিধিতে বিশ্বাস করিত না, তবুও স্বামীর অমঙ্গল হইবার আশঙ্কার কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কিন্তু মালতী কোথায় ?"

"সে তার ঘরে আছে নীচে।"

রমেন ?”

“রমেন নীচে শুয়েছে।”

হায়রে, সবাই ঘুমাইয়াছে! গৃহের দুলাল দিলীপের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই, তবু সবাই ঘুমাইয়াছে! এরা কি মানুষ নয় ? শিশির নিশ্চয় জাগিয়া জাগিয়া ভাবিয়া মরিতেছেন—তাকে একটু সান্ত্বনা দিবার তাঁর সঙ্গে একটু সহানুভূতি দেখাইবার কেউ নাই। তারও হাত পা বাঁধা—যাইবার উপায় নাই।

অনেক দ্বিধার পর সে বলিল, “ঠাকুরঝি আপনি একবার যান না, তাঁর কাছে জেনে আসুন।”

“কি জানবো বল, খোকাকে পাওয়া যায়নি—দাদা এসে পাগলের মত পড়ে' রয়েছেন। আর কি জানবে ?”

সত্যই তো। আর কিছুই জানিবার নাই! মিনতির মনটা ভারি ছটফট করিতে লাগিল। স্বামীর এমন নিদারুণ মনঃকষ্টের মধ্যে সে কোনও কিছুই করিতে পারে না। তার পাশে বসিয়া একটু কাঁদিতেও পারিবে না। একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিবে না।

এমন বিপদ মানুষের হয়। সে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

উমার নাক শীঘ্রই আবার ডাকিতে আরম্ভ করিল। তার পাশে শুইয়া মিনতি শুধু কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইতে লাগিল, আর ছটফট করিয়া বাকী রাত্রি কাটাইল।

পরের দিন সকাল বেলায় উমা গিয়া শিশিরকে বলিল, "দাদা, আজ বউভাতের জোগাড় ক'রতে হ'বে। গোটা কুড়িক টাকা চাই।"

শিশির সেই ইজি চেয়ারে ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়া ছিল। সারা রাত্রির ভিতর এক দণ্ডও সে চক্ষু বুজিতে পারে নাই। ভীষণ-ভীষণ কল্পনা তাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল—থাকিয়া থাকিয়া আশা তাহাকে আশ্বাস দিতেছিল। একটা গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইলে সে চকিত হইয়া জানালা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। একবার একটা পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌকীদার চলিয়া গেল। আবার হতাশ হইয়া সে চেয়ারে শুইয়া পড়িল। এমনি করিয়া আশা নিরাশার নিষ্পেষণ ও দুঃসহ কল্পনার বিভীষিকার উৎপীড়নে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া সে পড়িয়া ছিল।

সকাল বেলায় রামধারী চা আনিয়া দিল। শিশির যন্ত্রের মত চা খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল,—দুই চুমুক চা খাইয়াই চায়ের কথা ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চা বাটীতে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এমনি অবস্থায় সে বসিয়া আছে, তখন উমা এই কথা বলিল।

চক্ষু টানিয়া ক্ষীণ ভাবে শিশির বলিল, "বউভাত, কার ?"

"সে কি দাদা ?—তোমার—কি বলছো তুমি ?"

"ওঃ হাঁ বুঝেছি। উমা ওসব আর দরকার নেই।"

"সে কি ? এ না হ'লে হয়। কিছু না হ'লেও বউকে ভাত কাপড় তো দেবে। বউয়ের হাতে দু'জন লোককে তো খাওয়াতে হ'বে। এসব কি অনাছিষ্টি কথা বলছো দাদা।"

ভয়ানক বিরক্ত হইয়া শিশির তার চাবির গোছা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, নেগে যা!"

এমন কাজ শিশির কখনও করে না। তার বাক্সের চাবী সে উমাকে কোনও দিনই দেয় নাই। তাই উমা চাবি পাইয়া অবাক হইয়া গেল সে বাক্যব্যয় না করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। শিশির নীরবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টার বাবু আসিলেন। শিশির ব্যগ্রভাবে উঠিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—বলিল, "কোনও খবর পেলেন শরত বাবু।"

ইনস্পেক্টার শিশিরের চেহারা দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি স্নিগ্ধভাবে তার গায় হাত দিয়া বলিলেন, "এখনও পাইনি স্যর, কিন্তু আপনি চিন্তা ক'রবেন না; সে ছেলে যাবে কোথায়? দু'দিন হ'ক, চারদিন হ'ক, এর মধ্যে বের করবোই তাকে। ছেলেমানুষ, কত দূরেই যাবে?"

"কিন্তু শরতবাবু, সে যদি—যদি বেঁচে না থাকে।"

"সে ভাবনা ক'রবেন না। আমি সেই সন্দেহ ক'রেই সারারাত সন্ধান নিয়েছি। কোনও accident হ'লে সে খবর পেতাম। তেমন কোনও ভয় ক'রবেন না। সে বেঁচে আছে, সেজন্য ভাববেন না। আপনি অত ভড়কাবেন না স্যর। এখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব কাজ ক'রতে হ'বে। আপনি স্থির হন। বসুন।

শিশিরকে বসাইয়া শরতবাবু এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি হুগলী জেলার সব থানায় টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। এখন খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন দিতে হইবে—ফটোগ্রাফ শুদ্ধ হইলেই ভাল হয়। তা' ছাড়া তিনি কয়েকটা জায়গায় লোক পাঠাইতে চান। কিছু টাকার দরকার।

শিশির বাড়ীর ভিতর ছুটিল ফটোগ্রাফ এবং টাকা আনিতে। সে তার

শুইবার ঘরে গিয়া প্রথম ফোটোখানা এলবাম হইতে বাহির করিল—সেই ছবিখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আপনার অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টি উঠিয়া গেল দেয়ালে টাঙ্গান বিদ্যুতের একখানা বড় ব্রোমাইড ছবির দিকে। ছবিখানায় বিদ্যুতের যে ছবি উঠিয়াছিল, তার দৃষ্টি একটু গম্ভীর একটু বিষাদময়—আর তাতে সামান্য একটা সুন্দর ভ্রূকুটির আভাস ছিল। ছবিখানা নিপুণ পটুয়ার তোলা, সে যেন ছবি নয়, জীবন্ত মানুষ।

সাশ্রুনয়নে সেদিকে চাহিয়া শিশিরের মনে হইল, তার ভিতর হইতে যেন বিদ্যুত তার দিকে চাহিয়া তিরস্কার করিতেছে। তার অঞ্চলের নিধিকে এমনি করিয়া হারাইয়া শিশির আজ বিদ্যুতের এ অভিযোগের দৃষ্টি সহিতে পারিল না। তবু সে চাহিয়া রহিল—সে ছবির দিকে চাহিতে তার চোখ পুড়িয়া গেল, তবু সে চাহিয়া রহিল। তার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বিদ্যুতের কাছে মাথা খুঁড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। অপরাধ তো শিশিরেরই। সে যদি মোহে অন্ধ হইয়া মিনতির পিছনে না ছুটিয়া দিলীপের প্রতি তার কর্ত্তব্য করিয়া যাইত, যদি সে দিনরাত দিলীপের উপর অনন্যমনা হইয়া দৃষ্টি রাখিত,তবে তো দিলীপকে আজ সে হারাইত না। কি মত্ত অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তার হইয়াছিল! বুড়া বয়সে কি দুর্ম্মতিতেই তাকে ধরিয়াছিল! সে আপনাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মিনতির উপর তার একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল। সেই তো যত অনিষ্টের মূল। শয়তান তার সামনে তো মিনতির মোহিনী-মূর্ত্তি ধরিয়াই আসিয়াছিল।—তাই সে মিনতির উপর অযথা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন শিশির বিদ্যুতের ছরিব দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে সেই সময় মিনতি শুষ্কমুখে শঙ্কিত পদে তার কাছে অগ্রসর হইয়া

আসিল। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে বলিল, "খোকার কোনও খবর পেলে না ?"

তীব্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে শিশির মিনতির দিকে চাহিল। তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলাইয়া গেল। মিনতির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, অন্তর তার দুঃখে ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে আদ্যোপান্ত বিবাহের অলঙ্কারে সজ্জিত, তার পরণে একখানা সুন্দর গোলাপী রঙের শাড়ী। আজ তার এই দুঃখের দিনে মিনতির এই সাজের জৌলুস শিশিরের অপ্রসন্ন চোখে বড় বেশী বাজিল! কেবল একবার তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া শিশির নীরবে মুখ ফিরাইল। দিলীপের ফটোগ্রাফের দিকে সে চাহিয়া রহিল, তার মনের ভিতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল মিনতির উপর একটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন আক্রোশ! সে মুখ চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মিনতি অত কিছু বুঝিল না। স্বামীর দুঃখটাই সে শুধু সারা অন্তর দিয়া অনুভব করিল, আর তাতে সমস্ত অন্তর বিষাদে ছাইয়া গেল। সে বলিল, "একবার মুখুজ্জে মশায়কে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দেও না!"

এ কথায় শিশিরের অনর্থক রাগ হইল। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "মুখুজ্জে মশায় আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবেন!" বলিয়া সে ফটোখানা বুকের পকেটে রাখিয়া টাকার জন্য বাক্স খুলিতে গেল। চাবী খুঁজিয়া না পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর যখন মনে হইল, তখন উমার কাছে গিয়া চাবী আনিল।

স্বামীর কথায় মিনতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অভিমানে তার চিত্ত ভরিয়া গেল। অঞ্চল চক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে মুখ ফিরাইল। শিশির তাহা দেখিল না। সে উমার খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

যখন শিশির চাবী লইয়া ফিরিল, তখন মিনতি কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ

করিয়াছে। সে সাহস করিয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ একটা কাজ করলে হয় না? সবগুলো রেলষ্টেশনে একটা টেলিগ্রাফ"—

"সে যা করতে হয় করঁবো। তার জন্য তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি সেজে গুজে পটের পরীটি হয়ে বসে থাকগে।" বলিয়া শিশির বাক্স খুলিয়া টাকা তুলিয়া লইল। টাকা অনেক কম বোধ হইল, কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় তার ছিল না। টাকাগুলি পকেটে পুরিয়া সে বাক্স বন্ধ করিতে যাইবে, এমন সময় তার চোখে পড়িল দিলীপের হস্তাক্ষর। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা তুলিয়া লইয়া পড়িল। পড়িয়া সে কপালে প্রচণ্ড-বেগে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর একবার রাশি রাশি বিষ ঢালিয়া মিনতির দিকে চাহিল—তার পর ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইল।

মিনতি অবাক হইয়া গেল। তার হৃদয়ের ভিতর তুমুল আলোড়ন লাগিয়া গেল। এ কি? কিসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে সে? শিশিরের ব্যবহার মিনতির বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। নির্বান্ধব সংসারে অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে একা পড়িয়া সে আপনাকে ভয়ানক অসহায় বোধ করিল।

শিশির বাক্সে চাবী বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। মিনতি যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল,তখন সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বাক্স বন্ধ করিল। যে চিঠিখানা পড়িয়া স্বামীর এত ভাবান্তর হইয়াছিল, সেখানা মাটিতে পড়িয়াছিল। সেখানা তুলিয়া সে পড়িল। চিঠিখানায় দিলীপ লিখিয়াছে ঃ—

"বাবা,

শুনিলাম আপনি আবার বিবাহ করিতে গিয়াছেন। মার স্থানে তাঁর শত্রু আসিয়া বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি মারও মান রাখেন নাই আমার মুখের দিকেও চাহিলেন না। এ

অবস্থায় আমি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারি না। আমি চলিলাম। আপনার বাক্স হইতে পঞ্চাশটা টাকা আপনাকে না বলিয়া লইতেছি, নিতান্ত উপায় নাই বলিয়া। যদি পারি ইহা একদিন পরিশোধ করিব। আপনি আমার অনুসন্ধান করিবেন না। আমি কিছুতেই বাড়ী ফিরিব না। যদি আপনি বেশী উৎপাত করেন, তবে আত্মহত্যা করিব। নিবেদন ইতি

সেবক—

দিলীপ।"

পত্র পড়িয়া মিনতি কাঁদিতে লাগিল। তার দুঃখ দুর্ভাবনায় সে কূল পাইল না, কাঁদিয়া তার আশ মিটিল না। সে কেবলি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে সে বলিল,"অবোধ ছেলে, না জেনেই আমার স্নেহের এত অপমান করে গেলে। একবার ফিরে এসে দেখ বাপ, আমি তোর শত্রু নই।" বিদ্যুতের ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাগ্যবতী, তোমার ভাগ্যে হিংসা করেছিলাম বলে কি তুমি পরলোকে বসে আমাকে এ নির্ম্মম পরিহাস করছো?" এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শিশির ফিরিয়া আসিল। মিনতি তার পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বসিল।

শিশির আসিয়া চিঠিখানা খুঁজিল। মিনতি বিনাবাক্যে চিঠিখানা তার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। শিশির একবার তার দিকে চাহিয়া কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মিনতি ডাকিয়া বলিল, "চাবীটা নিয়ে যাও।"

শিশির হাত বাড়াইয়া চাবী লইল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

ইনস্পেক্টার শরত বাবুকে চিঠি দেখাইতে তিনি বলিলেন, "এতে বেশ

বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে এ ছেলে আত্মহত্যা করবে না। খোঁজ করলে তাকে অবশ্য পাওয়া যাবে। আপনি তা হ'লে আজই ক'লকাতা গিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন গে। আর হাওড়া থেকে সব ষ্টেশনে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন গে। আমি এদিকে যা করবার করছি।"

"সব ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ! হাঁ তাইতো। সে যদি রেলে গিয়ে থাকে কোথাও না কোথাও তাকে পাওয়া যাবেই।"—তার মনে হইল এ কথা মিনতি বলিয়াছিল।

সে তৎক্ষণাৎ কাপড়-চোপড় পরিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। মিনতির বউভাত হইল না।

কলিকাতায় কয়েকদিন পড়িয়া থাকিয়া শিশির চারিদিকে নানাবিধ অনুসন্ধান করিল, কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তার পর সে স্থির করিল, সে নিজে দেশে দেশে ঘুরিয়া দিলীপের খোঁজ করিবে।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে সে ছুটি লইয়াছিল, কাজেই সে আর ছুটি পাইল না। সুতরাং সে একদম কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের দুই ধার দিয়া প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া সে সন্ধান করিতে লাগিল কোথাও কোনও সূত্র সে পাইল না। অনেকস্থানে সে এক-একটা ভূয়ো খবর পাইয়া সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আবিষ্কার করিল যে, যে সন্ধান সে পাইয়াছে, সেটা কোনও কাজের নয়।

এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে দুইমাস বাদে কাশীতে আসিয়া পড়িল। কাশীর ঘাটে ঘাটে, পথে পথে সে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া ঘুরিল। ছোক্‌রা গোছের সন্ন্যাসী ফকীর দূর হইতে দেখিয়া অনেকবার সে অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হইয়াছে।

অবশেষে সে আশা ছাড়িয়া দিল, ভাবিল, এতটুকু ছেলে, চিরদিন বাপের আওতায় মানুষ! সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কোথায় যাইবে? পথে ঘাটে কোথাও বেঘোরে মারা গিয়াছে।

জীবনে তার দারুণ বৈরাগ্য আসিয়া পড়িল। ঘরে ফিরিবার নামে তার প্রাণে আগুন জ্বলিতে লাগিল। মিনতির স্মৃতিতে তার মনে বৃশ্চিক

দংশন করিতে লাগিল, দারুণ জ্বালা অন্তরে লইয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

মনের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য সে ধর্ম্মে মন দিল। সাধু-সন্ন্যাসী-দের আখড়ায় যাইয়া সে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিত আর মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়া বেড়াইত। ইহাতে তার অশান্ত চিত্ত অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

কিছুদিন এমনি গেলে সে মিনতিকে একখানা ও বিনোদকে একখানা চিঠি লিখিল। লিখিল যে, বয়সের অযোগ্য মোহে অন্ধ হইয়া সে পাপ করিয়া ফেলিয়াছে, ভগবান তার শাস্তি হাতে হাতে দিয়াছেন। মিনতির তাতে কোনও দোষ নাই সত্য, কিন্তু অভাগ্যের সঙ্গে যখন তার অদৃষ্ট জড়াইয়া গিয়াছে, তখন তার দুঃখ ভোগ ছাড়া উপায় কি? সে মিনতিকে পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতে লিখিল। তার বিষয় সম্পত্তি যা কিছু আছে, সে মিনতির হাতে দিয়া নিজে মাত্র মাসে একশ টাকা লইবে। যদি দিলীপ কোনও দিন ফিরিয়া আসে, তাকে যেন মিনতি সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেয়, নতুবা সে সব মিনতির হইবে। বিনোদ এই সব বিষয়ে যে ব্যবস্থা আইন-সঙ্গত হয় তাহাই করিবে।

মিনতি চুঁচুড়ার বাড়ীতেই ছিল। স্বামী চলিয়া গেলে প্রথম সে এক চোট খুব কাঁদিয়াছিল। দুঃখে সে কাঁদিয়াছিল, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল। বাড়ীর আর কেহ তার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, কিন্তু মালতী তার কাছে তার চিরাভ্যস্ত সেবা লইয়া আসিয়াছিল। সে মিনতিকে সান্ত্বনা দিত, আশার কথা শুনাইত, খাওয়াইত, পরাইত। তার হৃদয়ের সকল স্নেহ ঢালিয়া সে এই বঞ্চিত তরুণীর দুঃখের বোঝা কতকটা লঘু করিত। মিনতি এই স্নেহময়ী নারীর সেবায় অনেকটা তৃপ্তি পাইত। বিশ্ব-জোড়া অস্নেহের মাঝখানে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সে মালতীকে তার ঊষর জীবনের একমাত্র সুখের আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরিল।

যখন সাত আট দিন চলিয়া গেল, দিলীপের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না, আর স্বামী একখানা চিঠি দিয়াও তাহার সংবাদ নিলেন না, তখন সে কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিল। নিদারুণ অভিমান তার সমস্ত চিত্তকে কঠোর করিয়া তুলিল। এত অপমান তার কেন? সে কি করিয়াছে? তার তো কোনও অপরাধই নাই, অথচ স্বামী তাকে অপরাধীর মত শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! সে কি ইহা কেবল মাথা পাতিয়া লইবে।

তার বড় রাগ হইল স্বামীর উপর, সপত্নী পুত্রের উপর। সে কিছু উপযাচিকা হইয়া তাদের সংসারে আসে নাই। ভালবাসিয়াছিল শিশিরকে এই তার অপরাধ, কিন্তু শিশিরকে তো সে কোনও মতে ফুসলাইয়া বিবাহ করায় নাই! শিশিরই উপযাচক হইয়া গিয়াছিল, মিনতিকে না পাইলে তার জীবন অসার্থক হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। তাই সে আসিয়াছে। আর তাকে ইহারা একটা পরীক্ষার পর্য্যন্ত অবসর দিল না; স্বামী ও সপত্নীপুত্রের উপর যে বুকভরা স্নেহ ও করুণা লইয়া সে আসিয়াছিল, তার পরীক্ষার একটা অবসর না দিয়া তারা এমনি অপমান করিল তার! কেন? সে কি একটা মানুষ নয়? তার জীবনের, তার সুখদুঃখের, তার সার্থকতা-অসার্থকতার কি একটা মূল্য নাই?

মনে পড়িল তার, কতবড় আশা লইয়া সে স্বামীর হাত ধরিয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিল—কত ভাল সে বাসিয়াছিল। সে আশায় তার ছাই পড়িয়াছে, সে ভালবাসায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে। কেন সে ভালবাসিয়াছিল, কেন বা সে সব হারাইল! এই অভিশপ্ত প্রেম না হইলে তার জীবনটা তো এমন খাক্ হইয়া যাইত না! সে পড়াশুনা করিয়া এক রকম আনন্দেই জীবন কাটাইতে পারিত। তবু—তবু তো সে ভালবাসিয়াছে।—মনে পড়িল,—

It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all,

মনে পড়িল এ দুটি ছত্রের ব্যাখ্যা লইয়া তার আলোচনা। কথাটা তার একেবারে মিথ্যা মনে হইল না। যদি তার প্রেমাস্পদকে ভগবান আপনার কোলে কাড়িয়া লইতেন তবে সে এ কথায় কতক শান্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এমন করিয়া তাকে উজাড় করিয়া দিয়া, তার জীবনের সব স্বাদ তিক্ত করিয়া যে তার প্রেমাস্পদ তার প্রেমের অপমান করিয়া গেল—মনে হইল এর চেয়ে ভালবাসার আস্বাদ না জানাও যে তার ভাল ছিল।

অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া, মিনতি শক্ত হইয়া বসিল, মালতীর সঙ্গে সে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিল। মালতীর বুদ্ধি হার মানিল। অনেক যুক্তি করিয়া সে ভাবিল স্বামীর কাছে একখানা বিনীত পত্র লিখিয়া তাঁকে ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিবে, কিম্বা তাঁর কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিবে। এটা মালতীর পরামর্শ। এ কথা সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও মিনতি স্বীকার করিল। কিন্তু শিশিরের ঠিকানা কিছুতেই জোগাড় করা গেল না! সে আজ এখানে কাল সেখানে থাকে। টেলিগ্রাফে খবর দেয়, টেলিগ্রাফে তার কাছে টাকা যায়। কাজেই এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা গেল না।

তার বড়দা তাকে পিত্রালয়ে লইতে আসিলেন, বিনোদ সঙ্গে আসিল। তারা অনেক সাধ্য-সাধনা করিল, মিনতি কিছুতে নড়িল না। সে বলিল এ বাড়ী রাখিতে হইবে এবং এ বাড়ীতে তার থাকিতে হইবে। কেন না, দিলীপ যদি কখনও ফিরিয়া আসে তো এই বাড়ীতেই আসিবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং সে এই বাড়ীতেই থাকিবে। তার এ সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সুমতি ও

তার বউদিদিও আর একবার আসিয়াছিল, তাহারাও মিনতির সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না !

শিশির সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, সে বিজ্ঞাপন কিছুদিন চলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। তার পর মিনতি বিজ্ঞাপন দিল। সে বিজ্ঞাপনে সে লিখিল—

"বাবা দিলীপ, তুমি বড় দুঃখে বাড়ী থেকে চ'লে গেছ। ফিরে এসো বাপ। তোমার পিতা দেশত্যাগী হ'য়েছেন আমার জীবন বিষময় হ'য়ে গেছে। আমি তোমার জন্য ঘর আগ্‌লে ব'সে আছি। তুমি এলেই চলে' যাব। তোমার সুখের কোনও বিঘ্নই থাকবে না, এ কথা আমি সব দেবতার নামে শপথ ক'রে বলছি।

তোমার অভাগিনী মা—মিনতি।"

এ বিজ্ঞাপনের কোনও জবাব আসিল না। কিন্তু নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তার পর মিনতি মালতীর মুখের একটা কথা ধরিয়া স্থির করিল সে তারকেশ্বরে গিয়া হত্যা দিবে। এ সঙ্কল্প শুনিয়া মালতীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বারণ করিল। সকলেই বাধা দিল, কিন্তু মিনতি বাধা মানিল না।

লোকজন লইয়া রমেনের সঙ্গে সে তারকেশ্বরে চলিয়া গেল! মালতী যাইতে চাহিল কিন্তু মিনতি তাকে সঙ্গে নিল না, বলিল, "দিলীপ যদি এ বাড়ীতে ফিরে আসে তবে তুমি ছাড়া কে তাকে আটকাতে পারবে মেয়ে ?"

তারকেশ্বরে গিয়া সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহার করিয়া সাতদিন ক্রমান্বয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিল। তার পর সে একদিন তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন

দেখিল, মহাদেব আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, "তুই ঘরে ফিরে যা, কিছু দিন পরে তোর আশা মিটবে—এখনো সময় হয় নি।" আর মহাদেবের পাশে সে অস্পষ্টভাবে এক শিশু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিল তার মুখ অনেকটা দিলীপের ফটোর মত।

এই আদেশ পাইয়া সে উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ টানিয়া তুলিল। দুটি ঝি ও রমেন তার সঙ্গে ছিল তাহারা কোনও মতে তোল্লা করিয়া তাহাকে উঠাইয়া আনিল!

হুগলীতে ফিরিয়া মিনতি মালতীর কাছে তার স্বপ্নের কথা জানাইল। তার অন্তর আশায় ভরিয়া উঠিল। দেরী থাক, কিন্তু দিলীপ আসিবে—বাবা তারকনাথের আদেশ মিথ্যা হইবার নয়। এই আশায় বুক বাঁধিয়া সে দিন কাটাইবে। মালতীও বুক বাঁধিয়া উঠিয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পর সে শিশিরের পত্র পাইল। পত্র পড়িয়া তার মনটা একদম বিষ হইয়া গেল। কি অবিচার! নিরপরাধা নারীকে এমন করিয়া লাঞ্ছনা ও অপমান করিতে একটু দ্বিধা হইল না তাঁর? তার প্রেম ও নারীত্বের এমন অমর্য্যাদা করিয়া আজ তার স্বামী তাকে সম্পত্তি দিয়া ভুলাইতে চান। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! সে-চিঠির উত্তরে সে লিখিল,

"তোমার পত্র পেলাম। এতদিন পর যে আমার কথা মনে প'ড়েছে সেজন্য ধন্যবাদ।

"তোমার ধন-সম্পদে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার কাছে পত্নীত্বের কোনও অধিকারই আমি চাই না। আমার কেবল একটী অনুরোধ, তুমি ফিরে এসো।

"আমি এখানকার বাড়ী ছাড়ি নি। যদি কোনও দিন দিলীপ ফিরে আসে এই আশায় আমি বাড়ী আগলে ব'সে আছি। বাবা

তারকনাথের কাছে হত্যা দিয়েছিলাম, তিনি আদেশ দিয়েছেন দিলীপ ফিরে আসবে কিন্তু তার দেরী আছে।

"আমার বিশ্বাস যে যতদিন আমি বাড়ীতে আছি ততদিন সে ফিরবে না। তাই তোমার পায় ধরে' অনুরোধ ক'রছি তুমি ফিরে এসো। তোমাকে বাড়ীতে না রেখে আমি কোথাও যেতে পারছি না। তুমি এলেই আমি চলে যাব। তোমার বা তোমার ছেলের পথে কোনও রকম বিঘ্নই আমি হব না। তোমার যেভাবে দিন কাটান ইচ্ছা হয়, এইখানে গঙ্গার তীরে এসেই কাটাও। দিলীপ ফিরে এলে আর যা হয় করো। আমার জন্য তুমি কোনও ভয় ক'রো না। আমি তোমার কাছেও থাকব না।"

বিনোদ শিশিরের চিঠি পাইয়া স্বয়ং সশরীরে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উপরোধ অনুরোধে যখন কিছু হইল না, তখন সে মুখ খুলিয়া গালিগালাজ করিয়া তার বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি করিয়া আসিল। তার মনটা কেবল এই অনুশোচনায় তিক্ত হইয়া উঠিল যে যখন শিশির নিজে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল তখন বিনোদই তাকে জোর করিয়া বিবাহ করাইয়াছিল। না হইলে মিনতির আজ এ দুর্গতি হইত না। তার এই বুদ্ধির ভুলের জন্য বিনোদ আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

মিনতির পত্র পাইয়া শিশির পরম ঔদাস্যের সহিত তাহা ফেলিয়া দিল! একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য চিঠিখানা পড়িয়া তার মন মিনতির উপর একটু নরম হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দিলীপের পত্রখানার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যেদিন দিলীপকে সে তাড়াইল সেদিন মিনতি আদ্যোপান্ত অলঙ্কার পরিয়া সাজিয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিল এ চিঠি আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয়। মিনতি কবি,

কথা গাঁথিতে সে জানে—বেশ গুছাইয়া একখানা চিঠি লেখা তার পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু দিলীপের জন্য তার প্রাণ কাঁদিতেছে এটা সম্ভব নয়। তাই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

মিনতিকে সে আর চিঠি লিখিল না। তার পরিবর্ত্তে দেশে তার নায়েবকে লিখিল, মাসে মাসে শিশিরের নিকট ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট টাকা মিনতির কাছে বুঝাইয়া দিবে এবং সকল আবশ্যক কার্য্যে মিনতির আদেশ লইবে। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও কথা যেন শিশিরের কাছে আর না লেখা হয়।

আরও চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। উমা অনেক দিন সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে।

দিলীপের কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই। শিশির কাশী ছাড়িয়া অন্যান্য তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মিনতি এখন পাকা গৃহিণী ও ভূম্যাধিকারিণী হইয়া বসিয়াছে। সে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে, তার তত্বাবধানে সম্পত্তির আদায় তহশিল বেশ সুচারুরূপে হইতেছে। মাসে মাসে শিশিরের কাছে নিয়মিতরূপে একশত টাকা করিয়া পাঠান হইতেছে। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সমস্তই নিয়মিতরূপে ব্যাঙ্কে জমা হয়।

রমেনের লেখাপড়া বেশী দূর হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনবার অকৃতকার্য্য হইবার পর মিনতি তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া তার সম্পত্তির ভিতর এক নায়েবিতে নিযুক্ত করিয়াছে। এখন সে মিনতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

মিনতির আবশ্যকাতিরিক্ত ব্যয় মাত্র একটি আছে—সে সাধু সন্ন্যাসীর সেবা—তারকেশ্বরে দৃষ্ট অস্পষ্ট স্বপ্নের ফল। কোনও সন্ন্যাসী আসিয়া তার কাছে ফিরিয়া যায় না। তার চুঁচুড়ার বাড়ী প্রায় একটা সাধুর আখড়া হইয়া উঠিয়াছে। সাধুদের সেবা করিয়া মিনতি প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে তারা দিলীপের মত কাহাকেও দেখিয়াছে কিনা। কোনও রকম সন্ধান পাইলেই সে সেখানে খোঁজ খবর করে। তার পর তাদের বিদায়ের সময় মিনতি তাদের অনুনয় করিয়া বলে যে যদি কোথাও তাঁরা দিলীপের সন্ধান পান তবে যেন মিনতিকে সংবাদ দেন। এই সব সাধু সন্ন্যাসী অনেক

দেশে ভ্রমণ করে, এতগুলি লোকের চেষ্টায় কোনও না কোনও সন্ধান সে একদিন পাইবে তার এমন আশা হইল।

একদিন একটি সাধু আসিল, তার সঙ্গে চারটি চেলা ছিল—তাদের বয়স খুব বেশী নয়। তার মধ্যে আঠার উনিশ বৎসরের এক যুবককে দেখিয়া মিনতির কেমন একটু সন্দেহ হইল। সে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল। মালতী অনেক করিয়া সাধুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবার বলিল এই দিলীপ, আর একবার বলিল এ নয়। রমেনকে দিয়া অনুসন্ধানেও বিশেষ কিছু ফল হইল না।

চেলাটির নাম ছিল তোতারাম। তার সুগঠিত দিব্য দেহ, তার অত্যন্ত প্রশান্ত কমনীয় কান্তি। তার চোখের ভাব অনেকটা বিদ্যুতের ফটোর মত! মিনতি লক্ষ্য করিল তার আচার-ব্যবহার সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর চেয়ে অনেকটা ভদ্র ও নম্র—সে মোটেই কাঠখোট্টা নয়।

দিলীপের চেহারার এমন কোনও বিশেষত্ব কাহারও মনে আসিল না যাহা দিয়া নিঃসন্দেহরূপে তাকে ছয় বৎসর পর চিনিয়া ফেলা যায়। আর তের বছরের ছেলের উনিশ বছরে কি চেহারা হইবে একথা কেহ বলিতে পারে না। কাজেই সন্দেহ মিটিল না। রমেন ও মালতী তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল কিন্তু সাধুবাবা হিন্দুস্থানী বুলিও ছাড়িল না, কোনও রূপে ধরা-ছোঁয়াও দিল না।

শেষে মিনতি একদিন তাকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিল।

তোতারাম নেংটির উপর বেশ সম্ভ্রান্তভাবে গৈরিকবাস জড়াইয়া মিনতির সম্মুখে আসিয়া বসিল। আর তার জলযোগের জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছিল সম্পূর্ণ বাঙ্গালী কায়দায় তার যথারীতি সৎকার করিল।

তখন মিনতি বলিল, "বাবা, তুমি তো হিন্দুস্থানী নও, বাঙ্গালীর ছেলে।"

সাধু মাথা নত করিয়া বলিল,"নেহি মাই—মৈঁ পচ্ছিমসে আয়া হুঁ।"

সাশ্রুনয়নে মালতী বলিল, "কার ঘর আঁধার ক'রে এয়েছ বাছা। তোমার তো নরম শরীর, এ কষ্টের জন্য তো এ দেহ তৈরী হয় নি।"

"মাফ কিজিয়ে মাইজী। ঘরকা খবর বোলনা সাধু লোগকো মনা হৈ।"

"বাবা আমি বড় দুঃখী, আমার মুখপানে চাও, আমায় মিছেমিছি কাঁদিও না। যদি আমার দিলীপ হও তবে বল বাবা।"

তোতারাম মিনতির মুখের দিকে চাহিল। তার চোখে জল দেখিয়া একটু বিব্রত হইয়া গেল। তার পর মাথা নত করিল। মিনতি তার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। তাহাতে সাহস পাইয়া সে তোতারামের একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "আর আমায় দগ্ধাস্‌নে বাপ, তুই-ই দিলীপ।"

সাধু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাঙ্গালায় বলিল, "মা আমি দিলীপ নই।"

মিনতি হাত ছাড়িয়া দিল, তার সমস্ত মুখে যেন কে কালী ঢালিয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলিল, "তবে তুমি কে?"

"মিথ্যা বলবো না মা, আমি বাঙ্গালী, কিন্তু আমার পরিচয় বলতে পারবো না।"

"তুমি দিলীপ।"

"না মা।"

"আচ্ছা দিলীপ হও বা না হও, আমাকে তুমি মা ব'লেছ তোমাকে আমি ছাড়বো না। তুমি যেই হও তুমি আমার ছেলে।"

সন্ন্যাসী মাথা নত করিয়া নীরব রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "মা আমাকে বাঁধবেন না, আমায় ছেড়ে দিন। আমি মোক্ষলাভ করবার আশায় বেরিয়েছি, আপনি তাতে অন্তরায় হ'বেন না।"

"এই কি তোমার মোক্ষলাভের বয়স বাবা ? তোমার এই কাঁচা বয়েস, এখনতো তোমার ভোগের সময়।"

"মোক্ষলাভের বয়স কিছু ঠিক নেই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ কত বছরে মোক্ষলাভ ক'রেছিলেন ? তা ছাড়া মোক্ষলাভ তো দুচার দিনের কথা নয় মা। সারা জীবন সাধনা ক'রে তবে লোকে মোক্ষলাভ ক'রতে পারে। কাজেই যত শীগ্‌গির আরম্ভ করা যায় ততই ভাল।"

"কিন্তু তুমি মোক্ষলাভের সন্ধানে ঘুরবে, আমার কি উপায় হ'বে ? আমার প্রাণটা তো এই জড় জগতে আটকে থেকে আছাড়ি পাছাড়ি খেয়ে মরবে। আমাকে মা বলেছ, মায়ের দুঃখ দেখবে না, একথা কোন শাস্ত্রে বলে ?"

"মাপ করুন মা, আমাকে আর লুব্ধ ক'রবেন না।" বলিয়া হাত জোড় করিয়া সাধু প্রস্থান করিল।

মিনতি রমেনকে বলিল, "এ দিলীপ না হ'য়ে যায়না। কি বল রমেন ?"

"হাঁ মামীমা, আমার তো তাই মনে হ'চ্ছে।"

মালতীকে বলিল, "তুমি কি বল মেয়ে ?"

"কি বলবো মা, কিছুই বুঝতে পারি না। তবে আমার দিকে যে তাকিয়ে দেখছিল, আমার মনে হ'ল যেন আমাকে ও চিনতে পেরেছে।"

"রমেন, ওকে কিছুতেই ছাড়া হ'বে না।"

"তাই তো, কিন্তু কি ক'রে আটকান যায় ওকে ?"

"ওর গুরুর হাত পা ধ'রে বল্‌বো, তাঁর দয়া হ'লেই হ'বে। তুমি তা'কে একবার বলগে রমেন।"

রমেন অনেক দরবার করিয়া গুরুজীর সঙ্গে কথাটা পাড়িতে পারিল। গুরুজী হাসিয়া বলিল, "আরে লড়কা, রহোগে য়হা ঘরমে—না মোক্ষ লাভকা ইরাদা হ্যায়।"

"প্রভু মুঝকো মৎ ছোড়িয়ে—মৈঁ মাফ চাহতা হু।"

"শুনা বাবুজী—য়হ চিড়িয়া সংসারকে বন্ধন ছোড়কে মুক্ত আকাশ পর ধাওয়া কিয়া হৈ, উসকো ক্যা মায়াসে বন্ধা জায়েগা ? মাইজীকো বোলিয়ে, মায়া মৎ কিজিয়ে। রামচন্দ্র সীতাপতি !"

রমেন এ কয় বৎসর জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া বিলক্ষণ বিষয়বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। সে বলিল, "প্রভু যদি দয়া করেন তবে মাইজী ভাণ্ডারার বিরাট ব্যবস্থা করিবেন, সাধু বাবার পদসেবার জন্য বিলক্ষণ প্রণামী দিতে প্রস্তুত আছেন।"

সন্ন্যাসী পুলকিত হইয়া অনেকগুলি দন্ত প্রকাশিত করিয়া বলিলেন —"হা, হা, মায়া সব মায়া হ্যায়, সব ঝুট। আচ্ছা, ভক্তকো এয়সা মনোবাঞ্ছা হোয় উসকো তুষ্ট করনা অবশ্য চাহিয়ে। বোলো বেটা তোতারাম, তু য়হাঁ রহে যাও—যব তক ন মাইকো অনুজ্ঞা হো। পর পিছে তো তুম্হারা ব্রহ্মজ্ঞান হোনেহি হোগা।"

তোতারাম গুরুজীর পা জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসী, ভাণ্ডারার আয়োজনের বহরের যেরূপ আঁচ পাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেন; এমন কি তোতারামকে গালি গালাজ করিলেন, তাহাকে ত্যাগ করিবেন এমন পর্য্যন্ত শাসাইলেন। কিন্তু তোতারাম ছাড়িল না, এবং শেষে সে ইহা বলিল যে গুরু যদি নিতান্তই তাকে বিনাদোষে ত্যাগ করেন তবে সে অগত্যা পলায়ন করিয়া অন্য গুরুর সন্ধান করিবে! কিন্তু গৃহে সে থাকিবে না।

তখন সন্ন্যাসী রমেন বাবুজীকে সমঝাইলেন যে এমন পীড়াপীড়ি করিয়া বিশেষ ফল হইবে না। সন্ন্যাসী তোতারামকে বুঝাইয়া পড়াইয়া যথাস্থানে নিশ্চয় ফিরিয়া পাঠাইবেন। 'লেকিন' ভাণ্ডারা ও প্রণামী বিষয়ে ব্যবস্থা যেন হয়।

এসব কথাবার্ত্তা শুনিয়া মিনতির আর সন্দেহ রহিল না যে এই দিলীপ। সন্ন্যাসী তো তার প্রকৃত পরিচয় অবশ্যই জানেন। যদি এ দিলীপ না হইবে তবে তিনি তাকে এখানে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন কেন ?

ভাণ্ডারার আয়োজন যথাবিধি হইল। প্রণামীতেও ত্রুটি হইল না। পরের দিন সন্ন্যাসী যখন তল্পীতল্পা বাঁধিলেন, তখন মিনতিও জিনিষপত্র গুছাইল। রমেন ও কয়েকজন দাস দাসীকে লইয়া সে এই সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দিলীপকে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মালতী চুঁচুড়ার বাড়ীতে রহিল। যদি মিনতির অনুমান মিথ্যা হয় ও তোতারাম দিলীপ না হয় এবং দিলীপ চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসে তবে সে যাহাতে পলাইয়া না যায় সেজন্য মালতী এখানে রহিল।

হুগলী হইতে সন্ন্যাসী কলিকাতায় গেলেন। সেখানে জগন্নাথ ঘাটে তাঁর আস্তানা হইল। এখানে রমেন দেখা দিল এবং তার নিযুক্ত চর নিরন্তর তোতারামের পিছু পিছু ঘুরিতে লাগিল। মিনতি আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া গেল। তোতারাম তাহাকে দেখিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ন্যাসী তার পর গঙ্গাসাগর গেলেন। রমেনের চর সঙ্গে গেল। মিনতি রমেনকে লইয়া ষ্টীমারে গঙ্গাসাগরে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ ও তার দাদারা তাকে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল। সে তাঁহাদের কাছে কিছু ভাঙ্গিল না, শুধু বলিল সে তীর্থ করিতে যাইতেছে। সকল বাধা অস্বীকার করিয়া সে গঙ্গাসাগর গিয়া হাজির হইল।

তোতারাম সেখানে নিশ্চিন্তমনে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নান করিতেছিল, হঠাৎ দেখিল সেই ঘাটে মিনতি স্নান করিতে নামিয়াছে। তোতারাম স্তোত্র ভুলিয়া গেল। মিনতিকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল। মিনতি একান্তভাবে দিলীপের সঙ্গে মিলন কামনা করিয়া সেখানে ডুব দিয়া উঠিল।

তার পর ফিরিয়া সন্ন্যাসীরা নানাস্থান ঘুরিয়া তারকেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানেও তোতারাম মিনতিকে দেখিতে পাইল। সর্ব্বত্র মিনতিকে এমনিভাবে দেখিয়া দেখিয়া সে নিশ্চয় বুঝিল মিনতি তার অনুসরণ করিতেছে। সে রমেনকে একদিন ধরিয়া বলিল, "আপনারা কেন মিথ্যে আমার পিছনে এমনিঘুরছেন,আমি আপনাদের দিলীপ নই।"

রমেন বলিল, "আমাকে সে কথা বলা মিথ্যে ভাই। মামীমা বড় দুঃখ পেয়ে একেবারে ক্ষেপার মত হ'য়ে গেছেন। ওঁর এ খেয়ালে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তা ছাড়া আমার সন্দেহ হয় যে যদি শেষ পর্য্যন্ত তুমি দিলীপ নও এই সাব্যস্ত হয় তবে হয় তো উনি বাঁচবেনই না।"

তোতারাম গম্ভীর হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তার পর চলিয়া গেল।

সেই দিন গুরুজী তাকে বলিলেন, "তুঝ্‌কো ঘর যানা ভাল হৈ বেটা। মায়া তুম্‌হারে পিছে লটক্‌ যা রহা হৈ। উসকো ঘরসে পরাস্ত করকে তব আনা চাহিয়ে।"

তোতারাম শুধু কহিল, "গুরুজী এয়সা আদেশ মৎ কিজিয়ে। ছ' বরস্‌ মৈ মহারাজকে সাথ ঘুমতা হুঁ। মুঝকে অব ন ঘুমায় দিজিয়ে।"

"ছ বৎসর!" কথাটা রমেনের কাছে তার চর রিপোর্ট করিল, মিনতি সে কথা শুনিল। তার আর কোনও সন্দেহ রহিল না!

তার পর ক্রমে সন্ন্যাসীদের পিছু ধরিয়া মিনতি মুঙ্গের পর্য্যন্ত গিয়া হাজির হইল।

মুঙ্গেরে আসিয়া মিনতির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন সে শরীরকে একদম অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে—মনটা সর্ব্বদাই একটা দারুণ

উদ্বেগ ও উত্তেজনায় অস্থির হইয়া থাকিত। তোতারামের সন্ধান পাওয়া অবধি সে আরও উদ্বেগ ও উত্তেজনায় দিন কাটাইয়াছে। আর এ কয়দিন শরীরটাকে একেবারে তছ-নছ করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। সুকুমার দেহ তার এ উদ্বেগ সহ্য করিতে পারিল না, সে অসুস্থ হইয়া পড়িল।

রমেন ভয় পাইয়া বিনোদের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া দিল। বিনোদ, সুমতি ও বড় বউ চলিয়া আসিলেন। ব্যারাম এমন কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু শারীরিক ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্নায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল।

বিনোদ আসিয়া জোর করিয়া ধরিল মিনতির ফিরিতে হইবে। মিনতি চক্ষের জলের প্রাকার রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ইহা লইয়া দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতে লাগিল।

রমেনের সঙ্গে তোতারামের রোজ দেখা হয়। রমেনের কাছে তোতারাম মিনতির খবর শুনিত। রোজ দুই বেলা সে আগ্রহ করিয়া মিনতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত।

অসুখের তৃতীয় দিনে বাবুঘাটে বসিয়া তোতারাম রমেনকে বলিল, "দেখুন মাকে বুঝিয়ে বলুন—এ আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে অনর্থক শরীর নষ্ট ক'রে তিনি আমাকে অপরাধী ক'রছেন। আমি দিলীপ নই।"

রমেন বলিল, "বিনোদ বাবু আর ওঁর দিদি বৌদি দিনরাত জপাচ্ছেন সে কথা, কিন্তু মামীমা তো সে কথা কাণেও তুলছেন না। কেবল দিনরাত কাঁদছেন। ফেরান ওঁকে অসম্ভব।

তোতারাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে পাইচারী করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি প্রমাণ দি যে আমি দিলীপ নই।"

রমেন সন্দিগ্ধ-ভাবে তার দিকে চাহিল। শেষে বলিল, "তাই যদি ঠিক হয় ভাই, তবে—তবে সে কথা এখন নাই বল্লে। এ কথা নিশ্চয় জানলে ওঁর এ অবস্থায় প্রাণ দু দিনও থাকবে না।

আবার মুখখানা অন্ধকার করিয়া তোতারাম পাইচারী করিতে লাগিল। সে গম্ভীর ভাবে সম্মুখে বিপুল-বিস্তার গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। সুদূর পশ্চিমে গঙ্গার জল-রাশি, অর্দ্ধ নিমজ্জিত পর্ব্বতের অন্তরালে দিগন্ত স্পর্শ করিয়া রক্তায়মান সূর্য্যকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণে নীল মেঘমালা গঙ্গার প্রান্তদেশে এক বিরাট প্রাকার রচনা করিয়া পড়িয়াছিল। তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তোতারাম নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে সে বলিল, "চলুন আমি একবার মাকে দর্শন ক'রে আসি।"

বাবুঘাটের কাছেই একখানা ছোট বাঙ্গালা মিনতি ভাড়া লইয়াছিল। অদূরে গঙ্গার কলকল নাদ শোনা যাইতেছিল, ঝিরঝির করিয়া গঙ্গার শীতল স্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া আসিতেছিল। বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া মিনতি একটু বেদানার রস খাইতেছিল। সুমতি ও বড় বউ পাশে বসিয়া তাহাকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় রমেন তোতারামকে লইয়া আসিল। এই সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সুমতি ও বড় বউ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিনতির মুখ সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"এসেছ বাবা, মনে প'ড়েছে মাকে? বস।" বলিয়া মিনতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

তোতারাম বলিল, "আপনি উঠবেন না মা, ব্যস্ত হ'বেন না, আপনি শুয়ে' থাকুন।" বলিয়া তোতারাম একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তার পর তোতারাম বলিল, "শরীর এখন কেমন বোধ ক'রছেন মা?"

"এখন ভালই আছি।"

সুমতি বলিল, "ভাল আছে না ছাই। ভেবে ভেবে দিন দিন তিল তিল ক'রে শরীরটা খেয়ে ফেলেছে পোড়ারমুখী।"

তোতারামের চোখের কোণ জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "মা, কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি ঘরে ফিরে চলুন।"

মিনতি বলিল, "তুমি বল্লেই যেতে পারি বাবা। আমার ছেলে আমায় ঘরে না নিয়ে গেলে আমি তো ফিরতে পারবো না।"

তোতারাম বলিল, "মিথ্যে মায়ায় কেন নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন মা?"

"কি এমন কষ্ট আমার বাবা! আমি তো দিব্যি আরামে আছি। তোমার এ কষ্ট যে আমি দেখতে পারি না। তোমার কষ্ট দেখে আমার যে আর ঘরে থাকতে মন চায় না!" মিনতি কাঁদিয়া ফেলিল।

তোতারামও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে গৈরিক বাসের অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না।

শেষে তোতারাম বলিল, "আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা, চলুন, দেশে চলুন।"

মিনতি আনন্দের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল, "সত্যি বাবা? যাবে তুমি?"

"হাঁ মা, আপনার এত স্নেহের অপমান আমি ক'রতে পারি না। যদি অপরাধ করি, তবে ভগবান আমায় ক্ষমা ক'রবেন। কিন্তু মা আমার একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বাবা, কি চাই তোমার? তোমাকে না দেবার আমার কিছুই যে নাই।"

"আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি সুধু আপনার স্নেহ আমাকে টেনে নিচ্ছে ব'লে, কিন্তু আমি ব্রত ত্যাগ ক'রতে পারবো না। ঘরে গিয়েও আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রবো।"

"এমনি করে? এ আমি প্রাণ ধ'রে তোমায় দিতে পারবো না। তুমিই যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ক'রলে তবে আমার ধনদৌলতে কি কাজ?"

সুমতি বলিল, "আচ্ছা সে আর একটা কঠিন কি ? ব্রহ্মচর্য্য পালন মানে বিয়ে থা ক'রবে না, তা যতদিন ওর ইচ্ছা তা নাই বিয়ে ক'রলো। ঘরে যদি থাকে, শরীরকে যদি কষ্ট না দেয় তবে তাতে এমনই কি ক্ষতি ?"

মিনতি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা তাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু বাবা, শরীরকে না-হ'ক কষ্ট দিতে পাবে না।"

সেই বন্দোবস্ত ঠিক হইল। তোতারাম কষ্টহারিণী ঘাটে সন্ন্যাসীর আখড়ায় গিয়া গুরুজীকে প্রণাম করিয়া আসিল। গঙ্গাকে প্রণাম করিল। প্রস্তরে অঙ্কিত রামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া সে সাশ্রুনয়নে বিদায় হইল।

দুই দিন পর মিনতি একটু সুস্থির হইলে তাহারা ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া মিনতি তোতারামকে লইয়া চুঁচুড়ায় চলিয়া আসিল।

১৪

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

মিনতির দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। তোতারামের খাওয়া-দাওয়া, তার সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানে সে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখে আর অবসর সময়ে তোতারামের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করে।

তোতারাম প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করে, স্নানান্তে অনেকক্ষণ তার মধুরকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করে। তার পর সে মায়ের কাছে আসিয়া বসে। মিনতি সংসারের কাজ করে আর তোতারামের সঙ্গে কথা কয়। তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে তার ভারী ভারী কাজ করিয়া দেয়, ঝি চাকরদের আমল দেয় না। তোতারাম তার কৃচ্ছ্রসাধন অনেক ছাড়িয়াছে, কিন্তু সে গৈরিক পরে।

দিলীপের যে ঘর ছিল সেই ঘরে তোতারাম থাকে। আহারান্তে সে সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে যায়। মিনতি সেখানে গিয়া বসে। তোতারাম সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করে। ভাবে বিহ্বল হইয়া সে পাঠ করে ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া মিনতিকে শোনায়। মিনতি মুগ্ধ হইয়া শুনিয়া যায়। মিনতি ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্য অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু হিন্দী সে মোটে জানিত না। তুলসীদাসের সুললিত দোঁহা ও চৌপাই, এবং তার ভিতরকার অর্থ ও রসের প্রাচুর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে শুনিতে তার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্যের অনেক পদ তার মনে হইত, সে মাঝে মাঝে তাহা আবৃত্তি করিয়া তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া তুলসীদাসের পদের রসব্যাখ্যান করিত, তোতারাম

অবাক হইয়া শুনিত—এমন রসবহুল ব্যাখ্যান সে তার গুরুমুখে কোনও দিন শুনিতে পায় নাই।

সন্ধ্যাবেলায় তোতারাম ভজন গায়, মাঝে মাঝে বাঙ্গলা কীর্ত্তন গায়। মিনতি এসরাজ লইয়া তার সঙ্গে সঙ্গত করে, আবার কখনও কখনও ভাবে বিহ্বল হইয়া আপনি সে গানে যোগ দেয়।

তোতারাম সুকণ্ঠ, সুগায়ক। মিনতি চলনসই রকম গান বাজনা শিখিয়াছিলেন, আর তার গলা ছিল অতি সুমধুর, তাই দুইজনে যখন কণ্ঠ মিলাইয়া ভজন বা কীর্ত্তন গাহিত তখন বাড়ীর সব লোক দরজার আশে পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত।

মিনতি হিন্দী শিখিতে লাগিল। তোতারামের কাছে সে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িত, দাদু, সুরদাস, রবিদাস প্রভৃতির ভজনের মানে করিত। আর সে ইংরাজী ও সংস্কৃত কবিতা তোতারামকে শিখাইত। তোতারাম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানে কিন্তু খুব বেশী নয়। তবে সে ভারী মেধাবী, মিনতির কাছে অল্পদিনেই বেশ শিখিয়া উঠিল।

ভজন গাহিতে গাহিতে, তুলসীদাসের রামায়ণ ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যেই মিনতির চিত্তে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের আভাস জাগিয়া উঠিল। ভক্তির জীবনে, ভগবানের কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে যে একটা আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আছে তার রসবহুল চিত্তে তার প্রথম আভাস আসিল দাদুর ভাবাস্পদ পদাবলী গাহিতে গাহিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের এতদিনকার না-খোলা সব মণিকোঠায় যেন হাজার বাতির রোশনাই জ্বলিয়া উঠিল। তোতারামের ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, এবং ধর্ম্ম-জীবনের গভীরতা তাহাকে মুগ্ধ করিল। ছেলেমানুষ তোতারাম, কিন্তু তার অন্তরের গভীরতা ছিল খুব বেশী। ইহা মিনতির অন্তরকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া যেন একটা ঘুমঘোর হইতে জাগাইয়া দিল।

সে প্রথমে শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল, তোতারামদের সম্প্রদায় বৈষ্ণব। বাঙ্গলা দেশের বৈরাগী ছাড়া যে বৈষ্ণব আছে তাহা সে জানিত না, আর বৈষ্ণবেরা যে জটাজূট ধারণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম করে তাও সে জানিত না! তোতারামের কাছে সে বৈষ্ণবের নানা সম্প্রদায়ের তথ্য শুনিল। সে বলিল তার গুরু রামানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত। সে শুনিয়া আরও অবাক্ হইল যে ইহারা বৈদান্তিক। বেদান্ত দর্শনের শাঙ্কর মত বিষয়ক দুএকখানা গ্রন্থ সে পড়িয়াছিল। দর্শন হিসাবে তার মতামত সে অনেক আলোচনা করিয়াছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তার ছিল। কিন্তু তার ভিতর সে রস পায় নাই! সে মায়াবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানিয়াছিল তাহাতে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সঙ্গে তার খুব পার্থক্য বুঝিত না। সবই যদি মায়া, তবে সবই মিথ্যা, সবই ফাঁকি, সবই শূন্য। সত্য রহিল এক ব্রহ্ম। সে ব্রহ্ম সৎচিৎ ও আনন্দ স্বরূপ কিন্তু সে আনন্দ মানে সুখ ও দুঃখের অভাব, চিৎ মানে বিকৃত শূন্য, বস্তু (object) শূন্য এক অবোধ্য জ্ঞান। ইহার সঙ্গে জড়ের বিশেষ প্রভেদ সে খুঁজিয়া পাইত না। সুষুপ্ত অবস্থায় মানুষের যে অবস্থা তাই ব্রহ্মের এই অবস্থার খুব কাছাকাছি। তার মানে ব্রহ্ম চিরদিনই ঘুমাইয়া আছেন। একথা চিন্তা করিতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। এমন সুন্দর এমন মধুর রসের এমন অফুরাণ খনি জগৎখানা, এটা এতটা মিথ্যা ধোঁয়া—আর সত্য যা' তা মৃতবৎ—একথা ধ্যান করিতে তার শ্বাসরোধ হইত।

কিন্তু বৈষ্ণব বেদান্তের যে তত্ত্ব সে তোতারামের মুখে শুনিল তাহাতে সে মুগ্ধ হইল। তোতারামের বেদান্তশাস্ত্র বেশী পড়া-শুনা ছিল না। সে যাহা গুরুমুখে শুনিয়াছে তাহা মিনতিকে শুনাইত। মিনতি সেই সব ছাড়া-ছাড়া কথা জোড়া দিয়া বৈষ্ণব বেদান্তের যে তত্ত্ব নিজের মনের ভিতর গড়িয়া তুলিল তাহা তার চিত্তকে মুগ্ধ করিল। তার একটা বিশেষ কারণ

এই যে, তার ভিতর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতের খুব সারতত্ত্ব সবই ছিল, তা ছাড়া দাদু, রবিদাস, মীরাবাই প্রভৃতি সাধকদের মতবাদের রসের ধারাটাও যথেষ্ট ছিল—কিন্তু তার অনেকটাই ছিল মিনতির সাক্ষাৎ জ্ঞানের ফল। অন্যের দৃষ্ট জ্ঞানের টুকরা টুকরা উপাদান লইয়া এ তত্ত্বটা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে নিজে।

ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়—জগৎও ব্রহ্মময়—ইহা ব্রহ্মের প্রকাশ—তাঁর লীলা। জীব লইয়া ব্রহ্মের এ খেলা। জীবকে ব্রহ্ম টানিতেছেন প্রেম দিয়া, জীব ব্রহ্মকে লাভ করিতেছে প্রেম দিয়া। এই প্রেমই এ লীলার—এ জগতের একমাত্র সার বস্তু।

এই তত্ত্বের আলোকে মিনতির চক্ষে সমস্ত জগৎটা একটা অপূর্ব্ব প্রেমলীলায় মিলাইয়া গেল। তার মনে পড়িল Coleridgeএর কবিতা—

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of love
And feed his sacred flame.

আর শেলীর অমর কবিতায় এই সত্যের একটা বৃহত্তর প্রকাশ—

All fountains mingle with the river,
And rivers with the Ocean.
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single.
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?

See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another;
No sister flower would be forgiven
If it disdained its brother:
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea—

এ সত্য শেলী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মিনতির মনে হইল তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁর সঙ্কীর্ণ প্রেমের অপ্রসর দৃষ্টিপথে। আজ মিনতি বিশ্বে যে এক বিরাট প্রেমের লীলা দেখিতে পাইল তাহাতে এই কবিতা একটা প্রকাণ্ড রসবহুল অর্থে ভরিয়া গেল।

মিনতি এই তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া তাহা তোতারামের কাছে শুনাইল। তোতারাম অবাক হইয়া শুনিল, বৈষ্ণব বেদান্তের এমন প্রাণপূর্ণ ব্যাখ্যা সে কোনও দিন শোনে নাই।

মুগ্ধচিত্তে সে মিনতির পায়ের উপর অনেকক্ষণ তার মাথাটা ঠেকাইয়া রাখিল, তার পর সে উঠিয়া বলিল,—

"মা আপনি এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলেন?"

"কেন বাবা? এ সব তো তোমারই কাছে শিখেছি।"

"কি ভ্রান্তি! আমি কি এত কোনও দিন জানি যে আপনাকে শিখাব মা? আপনি ক্ষণজন্মা, আপনার প্রতি রামচন্দ্রের অপার দয়া, তিনি আপনাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন মা।"

মিনতি একটু স্থির হইয়া ভাবিল, তার পর বলিল, "বাবা দিলীপ, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে দেখেছ। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছেন এমন কাউকে দেখেছ কি?"

মিনতি তোতারামকে দিলীপ ছাড়া আর কিছুই বলিত না, তোতারাম

তাহাতে এখন আর আপত্তি করিত না। সে বলিল, "হাঁ মা, আমার গুরুর গুরুজী আছেন—তীর্থানন্দ স্বামী মহারাজ"—বলিয়া সে মাথায় হাত ঠেকাইল—"প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় তাঁকে দেখেছি। তিনি প্রায় সব সময়ই সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। তখন তাঁর মুখ এমন আনন্দে হাসতে থাকে যে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ ক'রেছেন। গুরুজীর কাছে শুনেছি তিনি ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন।"

"কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায় বাবা?"

"তিনি এ সময় বৃন্দাবনে থাকেন। দোলপূর্ণিমার পর তিনি সেখান থেকে বের হন।"

মিনতি ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিল।

তোতারাম আসিবার পর রমেন একদিন মিনতিকে বলিয়াছিলেন যে এইবার শিশিরকে খবর দিলে হয়তো তিনি দেশে আসিতে পারেন। মিনতি অনেক ভাবনা চিন্তার পর বলিয়াছিল, এখন খবর দিয়া কাজ নাই। তোতারাম কখনই নিজেকে দিলীপ বলিয়া স্বীকার করে নাই। যদিও মিনতির মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে তোতারামই দিলীপ, তবু সে ভাবিল যে যদি সে দিলীপ নাই হয়, তাহা হইলে শিশির অনেক আশা করিয়া আসিয়া হয়তো দারুণ নিরাশার কষ্ট পাইবেন। তা ছাড়া হয়তো তিনি মনে করিবেন, মিনতি নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁকে দেশে আনাইবার জন্য এই মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এ মিথ্যা অপবাদ মিনতি সহিতে পারিবে না। তাই সে স্থির করিয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত তোতারাম আপনাকে দিলীপ বলিয়া স্বীকার না করে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে তার দিলীপত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয় সে পর্য্যন্ত সে স্বামীকে সংবাদ দিবে না।

রমেনের কাছে এ প্রস্তাব ভাল বোধ হয় নাই, কিন্তু সে কোনও আপত্তি করিতে সাহস করে নাই।

তার পর এ দুই বৎসর এ পরামর্শ সে মিনতিকে অনেক দিয়াছে। সেদিনও সুমতি আসিয়া তাকে বলিয়াছিল, "মিনু এইবার শিশির বাবুকে একটা খবর দে, সে দেশে এসে দেখুক।"

"না দিদি, ও যে এখনও স্বীকার করে না।"

"তা' যদি না করে তবে তো খুব সন্দেহেরই বিষয়—ও দিলীপ না হওয়াই তবে সম্ভব। শিশির বাবু এলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

"তিনি যে ঠিক চিনতে পারবেনই তার ঠিকানা কি ? মালতী রমেন এরা তো কেউ ঠিক নিশ্চয় ক'রে কিছুই বুঝতে পারছেনা। তারা বরঞ্চ বলে ও দিলীপই।"

"মালতী রমেন এক কথা, আর ওর বাপ এক কথা। তিনি এলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

"কিন্তু যদি তিনি এসে বলেন যে ও দিলীপ নয় !"

"তবে সেটা নিশ্চয় জানাই ভাল। ও যদি সে না হয় তবে ওকে বিদায় করে আপদ চুকিয়ে ফেলতে হ'বে। মিছেমিছি একটা পরের ছেলেকে রাজার হালে পুষবার কি দরকার।"

কথাটায় মিনতির মুখ কালো হইয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাজার হালের তো এক শেষ। কম্বল বই অন্য বিছানায় শোয় না। আর খায় যা' তা দেখলে আমার চক্ষে জল আসে।" তার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

"তবু যে হালে আছে, ও যদি একটা ফকির হয় তবে তাই ওর কাছে রাজার হাল। তা ছাড়া একটা মিথ্যা পুষে তো কোনও লাভ নেই। সত্য যত শক্ত হ'ক সেটা জানাই ভাল।"

মিনতির অশ্রুরোধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল "কিন্তু এও তো হ'তে পারে যে তিনি এসে ঠিক ক'রলেন ও দিলীপ নয়, ওকে সবাই মিলে বের ক'রে দিলে, ও মনের আনন্দে চ'লে গেল। কেন না ওর সংসারে মোটেই মন নেই। ও কেবল ঘরে আছে আমার মুখ চেয়ে। তার পর যদি জানা যায় যে তিনি ভুল ক'রেছেন, ওই সত্যি দিলীপ, তবে তো আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না বড় দি।"

"তুই যত সব অনাছিষ্টি ভাবতে পারিস। ও যদি দিলীপ হয় তবে বাপে ছেলেয় দেখা হ'লেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

মিনতি আর এ কথা চালাইতে পারিল না। সে বুঝিল সুমতি তার মন বুঝিবে না।

সুমতি কলিকাতায় ফিরিয়া বিনোদকে বলিল, "আমার বাপু এসব ভাল বোধ হ'চ্ছে না। তুমি শিশির বাবুকে লিখে দাও সে এসে দেখে যাক। ও দিলীপ কি না সন্দেহ।"

বিনোদ সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "না থাক ও ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। শেষে যদি ও দিলীপ নয় এইটাই ঠিক হয়, তবে হয় তো মিনতি একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।"

"তা বোধহয় হ'বে, মিনুর রকম সকম আমার ভাল বোধ হ'ল না। ওর চ'লে যাবার কথা উঠলেই সে যেন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ওঠে। এ সব ভাল হ'চ্ছে না।"

চমকিত হইয়া বিনোদ বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ, কি বকছো ?"

"না, বলছি না কিছু। মায়ের পেটের বোন আমার মিনু, তা ছাড়া প্রায় মেয়ের বয়সী। আমার পোড়া মুখ দিয়ে তার নামে কোনও মন্দ কথা বেরোবে না। কিন্তু তবু হাজার হ'লেও তার এখন ভরা যৌবন,

তার একটা বিশ বাইশ বছরের ছোকরাকে নিয়ে এতটা মাখামাখি করা ভাল নয়। লোকে নিন্দে ক'রবে।"

"নিন্দে করবার মত কিছু দেখছ তুমি ?"

"বালাই, তা' হ'তে যাবে কেন। আমি তাদের খুব লক্ষ্য ক'রেছি, তেমন কিছু নয়। তবে আগুনের পাশে মোম, হ'তে কতক্ষণ।"

বিনোদ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি মিনতিকে চেন না তাই ব'লছো।"

তবু ব্যাপারটা লইয়া আত্মীয়-স্বজন সবাই বেশ একটু অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। শিশিরের সঙ্গে দেখাশুনা হইয়া সব ভালয় ভালয় মিটিয়ে যায় ইহা সকলেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তাই যখন মিনতি বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিল তখন সকলেই খুসী হইল। রমেন প্রস্তাব করিল বৃন্দাবন যাইবার পথে যে কয়টা তীর্থ আছে সব সারিয়া যাওয়া যাইবে। মিনতি বলিল, যাইবার পথে নয়, ফিরিবার পথে প্রয়াগ হরিদ্বার কাশী হইয়া ফিরিবে। রমেন সন্তুষ্ট হইল কেননা শিশির তখন প্রয়াগে। সেখানে গেলে শিশিরের সঙ্গে দেখাশুনা হইয়া সব পরিষ্কার হওয়াই সম্ভব।

শুভদিন দেখিয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

বৃন্দাবনে তীর্থানন্দ বাবাজির আশ্রমে গিয়া মিনতি মুগ্ধ হইল। সেখানে মন্দির আছে, পূজার্চ্চনা আছে, পুরোহিত আছে, পুণ্য আছে, পাপ আছে, বুজরুকি ঠকামি প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানের অপরিহার্য্য যে সকল উপকরণ সবই আছে,—সে সব মিনতি চাহিয়াও দেখিল না,—সে দেখিল কেবল তীর্থানন্দকে। প্রকৃত সাধক বটে! সুখ দুঃখে তাঁর সমজ্ঞান, বাহ্যিক কোন বস্তুর প্রতিই তাঁর আসক্তি নাই। অহোরাত্র কেবল সাধন-ভজন লইয়াই আছেন—শিষ্যগণ ভজন গাহিতেছে আর মাঝে মাঝে তিনি ধ্যানস্থ হইতেছেন।

মিনতি তাঁর কাছে অনেক অনুনয় করিল। তিনি অনেক দিন ঘুরাইয়া শেষে মিনতিকে বলিলেন, "তু সকোগী মাই, তুঝকো মৈঁ দীক্ষা দুঙ্গা।"

মিনতি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিল।

ফিরিবার পথে তাহারা হরিদ্বারে গেল। সেখান হইতে প্রয়াগ। মিনতি বলিল, প্রয়াগে থাকা হইবে না, কেবল ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া এক বেলা আহার করিয়াই কাশী যাত্রা করিতে হইবে। রমেন ইহাতে অপ্রসন্ন হইল। তবু এই সুযোগ টুকুর যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিবার জন্য একবার ফাঁক পাইয়া ছুটিয়া গেল শিশিরের ঠিকানায়।

শিশির সে দিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। রমেন হতাশ হইয়া ফিরিল। রামধারী বাড়ী ছিল, তার কাছে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিয়া সে ফিরিল।

তার পর কাশী ঘুরিয়া তাহারা চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিল। আত্মীয় স্বজনদের আশা পূর্ণ হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া মিনতি পরিপূর্ণরূপে ধর্ম্মজীবনে আত্ম-সমর্পণ করিল। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সে সাধন ভজন করিতে লাগিল। বৃন্দাবন হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের এক ধাতুময়ী মূর্ত্তি সঙ্গে আনিয়াছিল, ঘরে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে তার সেবা পূজা করিতে লাগিল। অবসর সময়ে পূর্ব্ববৎ তোতারামের সঙ্গে সে ধর্ম্মালোচনা করিত।

তার দিনগুলি বেশ একরকম কাটে, কিন্তু দিদি ও বৌদিদিরা তার দশা দেখিয়া অশ্রু-মোচন করেন।

শিশিরের যে শুইবার ঘর ছিল সেখানায় তালা বন্ধ থাকিত। তাহা ঠিক পূর্ব্বের মত সাজান-গুজান ছিল। দেয়ালের উপর ছবির ভিতর হইতে ঠিক আগের মত, অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গীর সহিত বিদ্যুৎ চাহিয়া থাকিত। রোজ দুবেলা তালা খুলিয়া ঘরখানা ঝাড়া-পোঁছা হইত, তার পর আবার তাহা বন্ধ হইত। মিনতি এঘরে বড় আসিত না।

সেদিন মিনতি নিজেই ঘর খানা ঝাড়িতে গেল। সকাল হইতে তার মনটা খাঁ খাঁ করিতেছিল। শেষ রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, শিশির আসিয়া তাকে ভয়ানক তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন যে তোতারাম দিলীপ নয়, তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। ঘুম ভাঙ্গিয়া তার মনটা এই জন্য ভারী খারাপ হইয়া গেল। সে দিন সে তোতারামের রামায়ণ পাঠ শুনিতে গেল না। স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া নিজের সব ঝাড়া-পোঁচা করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিতেই বিদ্যুতের ছবিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে অশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেদিকে চাহিয়া সে আপন মনে বলিল, "ভাগ্যবতী, তোমার হিংসা ক'রেছিলাম আমি। বড় দর্প ক'রে তোমার আসনে ব'সতে এসেছিলাম

তোমার গৌরব ম্লান ক'রে দেব বলে। তাই বুঝি ভগবান নিঃশেষ করে চূর্ণ করে' দিলেন আমার সব দর্প!" অনেক ক্ষণ সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

টেবিল ঝাড়িতে গিয়া তার এক পাশে দেখিল একখানা বই পড়িয়া রহিয়াছে। তুলিয়া দেখিল, এ তারই সেই "লেখা"।

কত স্মৃতি, কত দুঃখ, কত অভিমান এই বই খানা দেখিয়া তার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবাধে তার অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। একখানা বই হাতে করিয়া সে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া সে একটি একটি করিয়া কবিতাগুলি পড়িল। শিশির যে গুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিল, সে গুলি সে বার বার পড়িল। "মাতৃহারা" কবিতাটা পড়িতে পড়িতে বার বার তার চোখ জলে ছাপা-ইয়া উঠিল।

সে বার বার সে কবিতাটা পড়িয়া গেল। যে মাতৃহৃদয়ের প্রথম আভাস সে পাইয়াছিল তার বিশবৎসর বয়সে, আজ সে হৃদয় পল্লবিত হইয়া ফুলে ফলে শোভিত হইয়াছে। কিন্তু যে একদিন এ হৃদয়ের অসামান্য সম্মান করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছিল সে আজ কোথায়? আজ তার এ মাতৃত্বের সমাদর করিবার তো কেউ নাই। তার একথা বুঝিতে বাকি নাই যে তার আত্মীয় স্বজনের ভিতর কেহই তোতারামের প্রতি তার অপরিসীম স্নেহের বিশেষ কোনও সমাদর করেন না। অনেকে বরঞ্চ একথা লইয়া তাকে গঞ্জনাই দিতে চান্।

তার মনে পড়িল যে স্বামীর কাছে যেদিন সে শুনিল যে তিনি এই কবিতা পড়িয়া স্থির জানিয়াছিলেন মিনতি দিলীপের মা হইবার যোগ্য, সেদিন তার বুক কি আনন্দে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই দিন মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল যে পরের ছেলের মা কেমন করিয়া হইতে হয়

তাহার একটা দৃষ্টান্ত সে জগতে রাখিয়া যাইবে। কিন্তু বিধাতা তার অন্তরের সে দর্প শুনিয়াছিলেন, তাই ঠিক সেই সময়েই তিনি তার সে গৌরবের অবসর হরণ করিলেন। আর যখন সে অশ্রুজলে ভিজিয়া সে অবসর সংগ্রহ করিল, যখন তার হৃদয় পরের ছেলের উপর মাতৃস্নেহে ছাপাইয়া উঠিতেছে, তখনও বিধাতা তার গৌরব সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইয়াছেন। তার এ কাজে তাকে ভাল বলিবার তো কেউ নাই।

কে বলিবে? কার গরজ? স্বামী যাকে ত্যাগ করে, স্বামী যার সমাদর করে না, সে নারী যে জগতে কারও কাছে কোনও সম্মান পায় না। তার যে কোনও মূল্যই নাই। হোক না সে বিদুষী, মহীয়সী—হোক না সে দেবী! হায় স্বামী, এত লোভ দেখাইয়া অবোধ বালিকাকে মুগ্ধ করিয়া এমন করিয়া তার সকল প্রতিষ্ঠা সব সম্পদ হরণ করিয়া লইলে? ইহাই কি ধর্ম্ম? ভগবান কি অন্ধ?

তার পর তার যেন দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। মূর্খ মূর্খ সে! কি মায়ায় অন্ধ হইয়া ভগবানকে অন্ধ বলিতেছে! এ যে লীলাময়ের লীলা। দর্পহারী যে চিরদিন এমনি করিয়া দাম্ভিকের দর্প হরণ করিয়াছেন।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—এই মোহ হইতেই জীবের যত দুর্গতি! যার এ মোহ আছে তাকে যে ভগবান চিরদনিই এমনি শাস্তি দিয়াছেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও এ শাস্তি হইতে মুক্তি পান নাই। এ যে তাঁর একটা খেলা! তাঁর প্রিয়তমা রাধাকেও যে তিনি প্রেমের অভিমানের জন্য কাঁদাইয়াছিলেন, দাম্ভিক মিনতির কেন এ শাস্তি হইবে না?

তীর্থানন্দ বাবাজী তাকে খুব অল্প উপদেশই দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একটা কথা তাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "মা, অভিমানের চেয়ে বড় শত্রু নেই, অভিমানের চেয়ে পাপ নেই। কে আমি? ভগবানের এ বিচিত্র লীলায় একটা সামান্য খেলার সামগ্রী। গোলা নিয়ে ছেলেরা খেলা

করে—খেলাটা সার্থক হয় এই জন্য যে—ছেলে গোলাকে যেমন ক'রে গড়িয়ে দেয় সে গোলা তেমনি গড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি গোলার একটা অভিমান থাকে, সে যদি মনে করে আমি নিজেই গড়িয়ে যাচ্ছি, স্পর্দ্ধা ক'রে যদি সে উল্টা পথে যায়, তবে কি হয় বল দেখি। খেলা মাটি হ'য়ে যায়, আর যে খেলে সে সেই গোলাটাকে গুঁতো মেরে ঠিক পথে টেনে নিয়ে আসে! জীবকে নিয়ে ভগবানের লীলা ঠিক এমনি। অভিমান ক'রেছ কি ম'রেছ।"

এ কথা মনে হইয়া মিনতির চিত্ত অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে হাত জোড় করিয়া ভগবানের পায় আপনার প্রণাম জানাইয়া বলিল, "আমাকে তোমার আপনার ক'রে নেও প্রভু, মুছে দেও আমার অভিমান! তোমার খেলার পুতুল আমি, আমার উপর দয়া কর প্রভু।"

সে উঠিল। বিছানা হইতে উঠিয়া সে বিছানাটা ঝাড়িয়া পাট করিয়া রাখিল। পরম আদরের সহিত সে বিছানা পাট করিল, সে একটা জীবন্ত জিনিষ। এ শয্যার উপর কত না লোভ ছিল তার, কত আশা করিয়া সে এ শয্যার পানে চাহিয়াছিল। কিন্তু একদিনও সে এ শয্যায় স্বামীর পাশে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। লীলাময়, এমনি করিয়া দীনা নারীকে শাস্তি না দিলেই কি চলিত না? আবার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তার পর ধীরে ধীরে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া সে টেবিলের কাছে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল যে শিশিরকে এখন সংবাদ দেওয়াই ভাল। সে আসিয়া একবার দেখিয়া যাক। ইহাই তার স্পষ্ট কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি তার যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয় তাও সহিতে হইবে। শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

সে ড্রয়ার হইতে একখানা পুরাতন টেলিগ্রাফের ফরম বাহির করিয়া

শিশিরের নামে একখানা টেলিগ্রাম লিখিল। তার পর অনেকটা প্রশান্ত চিত্তে বাহির হইয়া সে ঘর বন্ধ করিয়া রাখিল। চাকরকে দিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়া সে তোতারামের ঘরে গেল।

তোতারাম তখনও রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। প্রসন্ন হাস্যে তোতারাম তাহাকে অভিনন্দন করিল। মিনতি স্থিরভাবে বসিয়া শুনিয়া গেল। তোতারাম পড়িতেছিল নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ কাহিনী। শুনিতে শুনিতে মিনতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

কাশীতে বাস করা স্থির করিয়া শিশির রীতিমত কাশীবাসী হইয়া গিয়াছিল। সে গঙ্গাস্নান করে, বিশ্বনাথ দর্শন করে, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে, ভাণ্ডারা দেয়।

ক্রমে তার দুঃসহ ব্যথার ঝোঁক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সে এই সব লইয়াই বেশ মাতিয়া গেল। এ জীবনে সে এমন একটা তৃপ্তি পাইল যে তাতে আর তার ঘরে ফিরিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা রহিল না। তা ছাড়া দিলীপের প্রথম গৃহত্যাগের সংবাদের ধাক্কায় তার মনে মিনতির উপর হঠাৎ যে বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিরাগ তার মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না। মিনতির নাম স্মরণ করিতে তার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা প্রচণ্ড আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তার অসহ্য জ্বালায় সে অস্থির হইয়া উঠিত। মিনতির কোনও দোষ সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না, তাকে শাস্তি দিবার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইত না, কিন্তু তার সঙ্গে বাস করাও তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই মিনতি যখন তাহার ঘরে রহিয়াছে তখন তাহাকেই ঘর ছাড়িতে হইল।

কিছুদিন পরে শিশিরের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ক্রমে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে সে পড়াশুনা খেলাধূলা আড্ডা প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ চালাইতে লাগিল। পুত্রের অভাব দুঃখ এক এক সময় তার মনের তলা হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া আনিত। কিন্তু সেকথা এখন মনে হইত কম।

ধর্ম্মজীবনে সে খুব বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম বিষয়ে সে যথেষ্ট অবহিত হইল। সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাপ করা সে ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপে করিত। কিন্তু ধর্ম্মকে

গভীর ভাবে জীবনের ভিতর গ্রহণ করিয়া গভীর চিন্তার সহিত তার তত্ত্ব আত্মগত করিবার কোনও চেষ্টা সে করিত না। দার্শনিক সে কোনও দিনই ছিল না, তার চিত্তের গভীরতার চেয়ে প্রসার ছিল অনেক বেশী। সে রাজ্যের বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিত, কিন্তু কোনও বিষয়েরই তলা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিত না। দারুণ দুঃখে গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে তার এই ভাবটা আরও বাড়িয়া গেল। সে কোনও জিনিষেই মনটা ডুবাইয়া দিত না, জীবনটাকে উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে সে নাড়াচাড়া করিত, ভাবনা চিন্তা করিতে সে ভয় পাইত।

তার পূজা অর্চ্চনা ছিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পূজার প্রত্যেক পদের পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবের প্রতি, মন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যেক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি সে এত বেশী মনোযোগ করিত যে তার অর্থের ভিতর প্রবেশ করিবার তার অবসর হইত না। দিনে সে সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিত। কাশীর পণ্ডিতদের কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে সে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। নিখুঁত পরিশুদ্ধ ভাবে সে প্রত্যেকবার মন্ত্র উচ্চারণ করিত। কর গণনায় কোনও ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় সেদিকে তার দৃষ্টি প্রখর ছিল। কিন্তু সহস্রবার 'ধীমহি' বলিয়া জপ করিয়াও গায়ত্রীর উপাস্য দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধ্যান সে কোনও দিনই করিত না, ধ্যান করিবার কোনও প্রয়োজনই সে অনুভব করিত না।

পরিণত বয়সে এমনি অনেক ভদ্রলোক কেবলমাত্র কাশী বাস করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিবার লোভে এখানে থাকেন। শিশির তাদের দলে মিশিয়া গেল এবং দল জাঁকাইয়া তুলিল।

শিশির তার বন্ধুদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাস্থান বেড়াইয়া সে কিছুদিন প্রয়াগে গিয়া বাস করিল।

মাঝে মাঝে সে খবরের কাগজ পড়িত। একদিন একটা কাগজে সে মিনতির প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখিল। তোতারাম আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মিনতি সে বিজ্ঞাপন বরাবরই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া শিশিরের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। একবার তার মনে হইল সে মিনতির উপর দারুণ অবিচার করিয়া তার জীবনটা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। তার তো কোনও দোষ নাই, সে তো দিলীপকে তাড়ায় নাই। বরং দিলীপ তার প্রতি অবিচার করিয়া গিয়াছে—বিজ্ঞাপন পড়িয়া তার মনে হইল যে তাহাতে মিনতির অন্তরের ব্যথা অতি করুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

একবার তার মনে হইল, ভাল হইতেছে না। মিনতির কাছে তার ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। এতদিত পর তার একবার মনে হইল মিনতির অশেষ গুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতল গভীরতার কথা!—যে সব গুণে সে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে আত্মহারা হইয়াছিল সেগুলি তার মনের তলা হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। মিনতির অনেকগুলি কবিতা যাহা সে সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াছে, তাহা তার চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। একবার ইচ্ছা হইল মিনতির কাছে ফিরিয়া যায়।

কিন্তু ছি! কোন মুখে আজ সে ফিরিয়া যাইবে? বড় দম্ভ করিয়া সে মিনতিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল; প্রেমের চেয়ে কল্পিত পিতৃত্ব-গৌরবকে বড় করিয়া সে খুব একটা পৌরুষ দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ আবার সে কোন লজ্জায় দাঁতে কুটা লইয়া ফিরিয়া যাইবে। উপায় ছিল যখন মিনতি তাকে দেশে ফিরিতে লিখিয়াছিল। তখন তো সে সে-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তার উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। তার পর তো মিনতি আর চিঠি লেখে নাই, আর অনুরোধ করে নাই।

সঙ্গে সঙ্গেই তার একথাও মনে হইল যে মিনতির প্রথম পত্রের ভিতরও বিশেষ অনুনয়ের ভাব ছিল না, বরং ঔদ্ধত্যই বেশী ছিল। সে নিজের জন্য কিছু চায় নাই, ক্ষমা চায় নাই, করুণা ভিক্ষা করে নাই, শুধু লিখিয়াছিল, "তুমি ফিরে এসো আমি চলে যাচ্ছি।" কি দম্ভ! মিনতির তাকে দিয়া কোন্ প্রয়োজনই নাই! তবে? তবে কেন সে ফিরিবে? মিনতিকে দিয়া কি তারই এত প্রয়োজন? কেন? সে পুরুষ নয়?

সুতরাং তার পৌরুষের সকল গর্ব্ব লইয়া শিশির মিনতিকে অগ্রাহ্য করিল। বিজ্ঞাপনখানা তখনও তার হাতে ছিল। সে তাহা ফিরিয়া পড়িল! এখন সে তার ভিতর মিনতির স্পর্দ্ধা ও তেজটাই বেশীর ভাগ দেখিতে পাইল। তার মনে হইল, মিনতি তাকে এবং দিলীপকে অনায়াসে অপরাধী স্থির করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং অশেষ ঔদার্য্যের সহিত তাহাদিগের ধনসম্পদ ও তাহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে। ইস্, এত দর্প! কাগজখানা দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া সে ফেলিয়া দিল।

হাঁ! মিনতি কথা গাঁথিতে জানে বটে! কবির বাক্চাতুরী সে শিখিয়াছে ঠিক। মনে যে কোমলভাবের অংশও নাই সে ভাব কথার মার পেঁচে সে ফুটাইতে জানে! কিন্তু শিশিরের কাছে তার মনের কথা লুকাইবে, এতখানি চাতুরী তার নাই। শিশির মিনতির চিন্তা মন হইতে একদম মুছিয়া ফেলিল! সে যে পুরুষ—সে দিলীপের পিতা—বিদ্যুতের স্বামী! মনের ভুলে একটা মায়াবিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে সত্য। তার জন্য সে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে—আর তার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রী ও পুত্রের স্মৃতির প্রতি তার নিষ্ঠা, কখনও টলিবে না।

সুতরাং শিশিরের জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে সে খবরের কাগজ পড়িত। একদিন একটা কাগজে সে মিনতির প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখিল। তোতারাম আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মিনতি সে বিজ্ঞাপন বরাবরই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া শিশিরের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। একবার তার মনে হইল এস মিনতির উপর দারুণ অবিচার করিয়া তার জীবনটা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। তার তো কোনও দোষ নাই, সে তো দিলীপকে তাড়ায় নাই। বরং দিলীপ তার প্রতি অবিচার করিয়া গিয়াছে—বিজ্ঞাপন পড়িয়া তার মনে হইল যে তাহাতে মিনতির অন্তরের ব্যথা অতি করুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

একবার তার মনে হইল, ভাল হইতেছে না। মিনতির কাছে তার ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। এতদিত পর তার একবার মনে হইল মিনতির অশেষ গুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতল গভীরতার কথা!—যে সব গুণে সে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে আত্মহারা হইয়াছিল সেগুলি তার মনের তলা হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। মিনতির অনেকগুলি কবিতা যাহা সে সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াছে, তাহা তার চিও আলোড়িত করিয়া তুলিল। একবার ইচ্ছা হইল মিনতির কাছে ফিরিয়া যায়।

কিন্তু ছি! কোন মুখে আজ সে ফিরিয়া যাইবে? বড় দম্ভ করিয়া সে মিনতিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল; প্রেমের চেয়ে কল্পিত পিতৃত্ব-গৌরবকে বড় করিয়া সে খুব একটা পৌরুষ দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ আবার সে কোন লজ্জায় দাঁতে কুটা লইয়া ফিরিয়া যাইবে। উপায় ছিল যখন মিনতি তাকে দেশে ফিরিতে লিখিয়াছিল। তখন তো সে সে-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তার উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। তার পর তো মিনতি আর চিঠি লেখে নাই, আর অনুরোধ করে নাই।

সঙ্গে সঙ্গেই তার একথাও মনে হইল যে মিনতির প্রথম পত্রের ভিতরও বিশেষ অনুনয়ের ভাব ছিল না, বরং ঔদ্ধত্যই বেশী ছিল। সে নিজের জন্য কিছু চায় নাই, ক্ষমা চায় নাই, করুণা ভিক্ষা করে নাই, শুধু লিখিয়াছিল, "তুমি ফিরে এসো আমি চলে যাচ্ছি।" কি দম্ভ! মিনতির তাকে দিয়া কোন্ প্রয়োজনই নাই! তবে? তবে কেন সে ফিরিবে? মিনতিকে দিয়া কি তারই এত প্রয়োজন? কেন? সে পুরুষ নয়?

সুতরাং তার পৌরুষের সকল গর্ব্ব লইয়া শিশির মিনতিকে অগ্রাহ্য করিল। বিজ্ঞাপনখানা তখনও তার হাতে ছিল। সে তাহা ফিরিয়া পড়িল! এখন সে তার ভিতর মিনতির স্পর্দ্ধা ও তেজটাই বেশীর ভাগ দেখিতে পাইল। তার মনে হইল, মিনতি তাকে এবং দিলীপকে অনায়াসে অপরাধী স্থির করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং অশেষ ঔদার্য্যের সহিত তাহাদিগের ধনসম্পদ ও তাহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে। ইস্, এত দর্প! কাগজখানা দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া সে ফেলিয়া দিল।

হাঁ! মিনতি কথা গাঁথিতে জানে বটে! কবির বাক্‌চাতুরী সে শিখিয়াছে ঠিক। মনে যে কোমলভাবের অংশও নাই সে ভাব কথার মার পেঁচে সে ফুটাইতে জানে! কিন্তু শিশিরের কাছে তার মনের কথা লুকাইবে, এতখানি চাতুরী তার নাই। শিশির মিনতির চিন্তা মন হইতে একদম মুছিয়া ফেলিল! সে যে পুরুষ—সে দিলীপের পিতা—বিদ্যুতের স্বামী! মনের ভুলে একটা মায়াবিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে সত্য। তার জন্য সে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে—আর তার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রী ও পুত্রের স্মৃতির প্রতি তার নিষ্ঠা, কখনও টলিবে না।

সুতরাং শিশিরের জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

এলাহাবাদে তার অনেক বন্ধু জুটিল। দাবা, তাস ও সতরঞ্চ বেশ জমিয়া উঠিল—আড্ডা জমিল, ধর্ম্মের আচার নিষ্ঠা ষোল আনা চলিত লাগিল।

একবার সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া কাশ্মীর গেল। মহা আনন্দে সেখানে দুই মাস কাটাইয়া, হিমালয়ের দুর্গারোহ স্থান সমূহ ঘুরিয়া সে প্রয়াগে ফিরিয়া আসিল। ইহার ফলে তার একটা দেশ পর্য্যটনের নেশা লাগিয়া গেল। সে দল জুটাইয়া ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিল। তীর্থ অতীর্থ সকল স্থানে সে সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পর্য্যটন করিল। একবার এক দল বাঁধিয়া তারা তিব্বত যাত্রা করিল। তার পর নেপাল গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিল—সেই সব ধর্ম্মমতের সঙ্গে বঙ্গীয় তান্ত্রিক মতের বাহ্য সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করিয়া তার মনে হইল বাঙ্গালার তান্ত্রিক ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। সে এসম্বন্ধেও গবেষণা করিতে লাগিল।

তাহার পর সে বেলুচিস্থানে গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে গিয়া দক্ষিণাপথ পর্য্যটন করিতে করিতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল। এই ভ্রমণের ফলে সে আবিষ্কার করিল যে ভারতের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত হিন্দু নামধারী ব্যক্তিদের সামাজিক আচার ব্যবহারের অশেষ বৈচিত্র্য আছে। সে পথে যাইতে যাইতে এই সব আচারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া চলিল, কাশ্মীর হইতে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে পরিবর্ত্তন এক ধারায় চলিয়াছে, আবার সিন্ধু গুজরাট মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়া আর একটা পরিবর্ত্তনের ধারা চলিয়া গিয়া অনেকটা ধীরে ধীরে মালাবার উপকূলের মরুমকাট্টায়াম ও আল্যা সন্তানম্ বিধির ভিতর মিলাইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও আচারের এই বিবিধ

পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তার চিন্তার ধারা ভারতের লোক-ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের পথে প্রবাহিত হইল। তার মনে অনেকগুলি থিওরী গড়িয়া উঠিল। পণ্ডিতদের সঙ্গে সে এসব বিষয়ে আলোচনা করিল, আর ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিল।

যখন তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে মিনতি প্রয়াগে আসিল তখন শিশির এই সব গবেষণার ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছে। সে দিনরাত বসিয়া পড়াশুনা করে। তার তাস পাশার ঝোঁক কাটিয়া গেল—আড্ডায় তাকে প্রায় দেখাই যায় না। সে কেবল পূজার্চ্চনা ত্রিবেণী স্নান প্রভৃতির ধর্ম্মাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমস্ত অবসর অধ্যয়নে নিযুক্ত করিতে লাগিল।

রামধারী ছিল শিশিরের অনেক দিনের পুরাতন চাকর। যতদিন বিদ্যুৎ বাঁচিয়া ছিল ততদিন সে তার স্বামীর কাছে চাকর বাকর বড় ঘেঁসিতে দিত না। শিশিরের কাজকর্ম্মের অবসরে যতটুকু সময় সে বাড়ীতে থাকিত ততক্ষণ বিদ্যুৎ তাকে সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া রাখিত। স্বামীর যখন যে সেবার প্রয়োজন তাহা সে নিজেই করিত। তামাক সাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কাছারীর পোষাক ঠিক করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সবই সে করিত—রামধারী কেবল তফাৎ হইতে সে সেবার জোগান দিত মাত্র।

বিদ্যুৎ মারা যাইবার পর তার ছেলের ভার লইল মালতী, আর স্বামীর ভার আসিয়া পড়িল রামধারীর হাতে। তখন হইতে রামধারীর একান্ত সাধনা হইল বাবুর সেবা। সে বিদ্যুতের সেবা নিত্য নিত্য দেখিয়াছে;—তার সেবার সে সৌষ্ঠব ও মাধুর্য্য জোগাইবার সাধ্য তার ছিল না, কিন্তু মাইজীর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে রামধারী এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে বাবুর যখন যে সেবাটুকুর অভ্যাস তাহা সে যথাসাধ্য জোগাইবে। তাই বিদ্যুৎকে হারাইয়া যখন শিশির জগৎ অন্ধকার দেখিল, তখনই সে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইল যে এই নীরব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কদাকার পশ্চিমা ভৃত্যের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিদ্যুতের অভাবে তার দৈহিক সেবায় কোনওখানেই কোনও ত্রুটি হইতেছে না। কাজেই রামধারী ক্রমে তার কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

যখন শিশিরের পুনরায় বিবাহ করিবার প্রস্তাব হঠাৎ বাড়ীতে প্রকাশ হইয়া গেল, তখন মালতী তার পরলোকগতা পালয়িত্রীর জন্য কাঁন্দিতে বসিল, কিন্তু রামধারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কেন না রামধারী শিশিরকে

তন্ন তন্ন করিয়া চিনিত, তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তার নিত্য অক্লান্ত সেবার ভিতর দিয়া সে প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশিরের অন্তরের পরিচয় পাইত। সে জানিত যে তার প্রভুর অন্তরের অনেকটা স্থান একেবারে মরুভূমির মত শূন্য উদাস। সে বিরাট মরুভূমির তপ্ত নিঃশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ আসিয়া রামধারীকে দগ্ধ করিত। সে প্রভুর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া মরিত। সে তার সেবার নিষ্ঠা বাড়াইয়া দিল—যাহাতে শিশিরের আনন্দ, সেই বিষয়ের সন্ধান করিয়া তার আয়োজন করিতে লাগিল। দাবা খেলায় শিশিরের ভয়ানক ঝোঁক—দাবা পাইলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু দাবা তার সঙ্গে খেলিতে পারে কেবল দুটী লোক, একটি দোকানদার এবং এক উকীল। তারা রোজ আসে না, তাই আসরও জমে না। রামধারী রোজ বাবুকে কাছারী পাঠাইয়া ইহাদের সন্ধানে বাহির হইত এবং উপরোধ অনুরোধ করিয়া প্রায় রোজ ইহাদের একজনকে হাজির করিতে লাগিল। ক্লাবে গেলে শিশিরের দিনটা কাটিত ভাল তাই যেদিন বাড়ীতে আড্ডার আয়োজন হইত না সেদিন রামধারী বাবুকে সত্য মিথ্যা নানা কথা বলিয়া ক্লাবে পাঠাইয়া দিত! এমনি করিয়া তার যতদূর সাধ্য সে বাবুর আনন্দ বিধানের আয়োজন করিত, কিন্তু সে বুঝিত তার এসব চেষ্টা মরুভূমে শিশিরবিন্দুর মত।

তাই যখন সে শুনিল যে শিশির বিবাহ করিবে, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে শিশিরের ক্লিষ্ট হৃদয়ে এতদিনে অজস্র ধারায় শান্তিবারি সেচন হইবে। সে বাঁচিল। মনের আনন্দে সে বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। বাবুকে বিনোদের বাড়ী পৌঁছাইয়া সে এক ঘণ্টার জন্য ছুটি লইয়া বিনোদের বড় ছেলেকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং তার যত্ন সঞ্চিত অর্থ দিয়া সে নূতন মায়ের জন্য এক জোড়া সোণাবাঁধা শাঁখা ও একটা রূপার সিঁদুর কৌটা কিনিয়া আনিল।

বিবাহের পর সে শাঁখা জোড়া ও কৌটাটি মিনতির পায়ের তলায় রাখিয়া সে তাকে প্রণাম করিল। মিনতির প্রসন্ন হাস্য দেখিয়া সে চরিতার্থ হইল—সে বুঝিল এ মা আমার বাবুকে সুখী করিতে পারিবে।

কিন্তু খোকা বাবু যখন সব এলোমেলো করিয়া দিয়া পলায়ন করিল তখন রামধারী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাবুর রকম সকম দেখিয়া সে থ' হইয়া গেল। তার ভয় হইল, বুঝি বাবু ক্ষেপিয়া যাইবে। সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বাবুর পিছু পিছু ছুটিল।

এতদিন যে-শিশিরকে সে চিনিয়াছে,জানিয়াছে তাহাকে সে যেন আর খুঁজিয়া পাইল না। এতদিন যে-সেবায় তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে সে-সেবায় এখন শিশির বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদিন শিশিরের কাছে যে-কথা শুনিয়া সে অভ্যস্ত এখন আর সে-কথা শুনিতে পায় না, যে-কাজ করা তার অভ্যাস সে-কাজ শিশির করে না। শিশিরের আহারাদির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বিদ্যুতের যত্নে কতকগুলি অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। নিয়মিত সময়ে আহারাদি না হইলে সে অসুবিধা বোধ করিত। অভ্যস্ত বস্তু খাইতে না পাইলে তার খাওয়া হইত না। তার খাওয়া দাওয়ার ভিতর প্রচুর পরিমাণে সৌকুমার্য্য ছিল। তাই অনেক দেশ ঘুরিয়া অনেক কষ্ট সহিয়া যখন তারা গয়ায় আসিয়া উঠিল তখন রামধারী তার মনের মত করিয়া খাওয়ার আয়োজন করিয়া তার সামনে পরিবেশন করাইল। কিন্তু সে যত্নরচিত খাদ্য দেখিয়া শিশির ক্ষেপিয়া উঠিল। সে খাবারের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কিছু ছাতু ও গুড় খাইয়া উঠিল। সুরচিত শয্যা ছাড়া শিশিরের ঘুম হইত না, সে এখন ভূমির উপর মাদুরে শুইয়া রাত কাটায়। আগে শিশিরের মুখে রূঢ় কথা কেউ কোনও দিন শোনে নাই, এখন সে দিনরাত রামধারীর উপর খেঁচ খেঁচ করে।

অনেক দিন রামধারী বাবুর এ নূতন খেয়ালের থই পাইল না। সে সকল দেবতার কাছে মানত করিতে লাগিল, বাবুর সুমতি হউক। একবার বাড়ী ফিরিতে পারিলে নূতন "মাইজির" সেবায় যে তার মতিগতি ফিরিয়া যাইবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল বাবু দেশে ফিরুন। খোকাবাবুকে পাওয়া যায় সে ভাল কথা, কিন্তু পাওয়া যাক বা না যাক, শিশিরকে একবার মিনতির হাতে লইয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে রামধারী বাঁচে।

যখন বছর কাটিয়া গেল, রামধারীর সকল অনুরোধ তুচ্ছ করিয়া বাবু কাশীতে স্থায়ী হইয়া বসিয়া গেলেন, তখন রামধারী একেবারে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল পাইল না। একদিন সে রাগ করিয়া বাবুকে বলিল, "এ সব কি ক'রছেন আপনি? ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আপনি এখানে পড়ে র'য়েছেন, যত সব ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাঁ ক'রে পড়ে থাকছেন, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, কাজ কর্ম্ম নেই, এতে আপনার শরীর টিকবে কেন?"

শিশির বলিল, "আর শরীর টিকবার দরকার কি রামধারী?"

"বালাই, ও কথা বলবেন না, ছি! আপনার দুঃখ কিসের? ধন দৌলত আছে, ঘর বাড়ী আছে, লক্ষ্মী মাইজী আছেন—এক ছেলে গেছে, আর কত ছেলে হবে"—

ভয়ানক ধমক দিয়া শিশির বলিল, "চুপ রও হারামজাদা—বড় আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে তোর—শয়তান!"

রামধারী একেবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। প্রথমতঃ সে কখনও শিশিরের কাছে এমন গালি খায় নাই। তা' ছাড়া গালি খাইবার মত কি কথা সে বলিয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে

মুখখানা চূণ করিয়া নীরবে রহিল এবং একটু পরে স্থানান্তরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া সে স্থির করিল যে বাবুর আর কোনও আশা ভরসা নাই। সে আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুর দুর্দ্দশা দেখিতে পারিবে না। সে মাইজীর কাছে ফিরিয়া যাইবে। পরের দিন তার এ সঙ্কল্প টিকিল না। সে চলিয়া গেলে যে শিশিরের পক্ষে অচল হইয়া উঠিবে ইহা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে তবু বাবুকে কতকটা খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখে—এবং যত রাজ্যের কাশীর গুণ্ডা ছাই মাখিয়া বাবুর উপর বাণিজ্য করিতে চায়, তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখে। সে চলিয়া গেলে শিশিরকে সবাই ছিঁড়িয়া খাইবে। তাই সে রহিয়া গেল।

এখন রামধারীর অবসরের অন্ত নাই। বাবুর সেবা শুশ্রূষার বেশী দরকার হয় না, তিনি বাড়ীতেও বেশীক্ষণ থাকেন না। কাজেই রামধারীর সময় আর কাটে না। সে রোজ একবার বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া বাবুর সুমতির জন্য মাথা খুঁড়িয়া আসে, মাঝে মাঝে জ্যোতিষী ও সামুদ্রিকদের কাছে পয়সা দিয়া বাবুর মতিগতি সম্বন্ধে গণনা করায়, আর বসিয়া বসিয়া গল্প গুজব করে। তার এক দোস্ত জুটিয়া গেল। সে পাণওয়ালা ; শিশিরের ঘরের নীচের তলায় তার বৃহৎ পাণের দোকান—তার নাম ভিখনলাল।

যখন সময় কাটে না তখন রামধারীর ভিখনলালের দোকানে বসিয়া গল্প-সল্প করে, এক আধটা খরিদ্দারকে পাণটা সিগারেটটা হাতে করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধিটা আসটা খায়, কখনও বা দু এক ছিলাম "কড়া তামাক" খায়।

ভিখনলালের কাছে রামধারী মনের দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে। তার গল্পের প্রধান বিষয় তার বাবু। রামধারীর সঙ্গে আলাপের এক সপ্তাহের মধ্যে ভিখনলাল শিশিরের সমস্ত জীবনের খুব বিস্তারিত ধারণা সংগ্রহ

করিয়া লইল। তার পর তাদের শিশির সম্বন্ধে আলোচনার আর কোনও অন্তরায় রহিল না। ভিখনের কাছে রামধারী সকল লোক ও সকল বিষয় সম্বন্ধে খুব স্বচ্ছন্দ মতামত প্রকাশ করিত, এবং ভিখনলালও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইত।

একদিন রামধারী বলিল, "বলো তো ভাই, এতো ছেলে নয় ডাকু। ছেলে ছিল রামচন্দ্র। বাপ বল্লে আর অমনি সে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল আর তুই শালা করলি কি ? বাপ বেটা ছেলে—পুরা জোয়ান, বউ ম'রে গেছে সাদী ক'রেছে—কি মন্দটা ক'রেছে বাপু ? তুই শালা অমনি ঘর ছেড়ে চলে গেলি ? আরে শালা, যে বাপ তোকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রলে, তোর মুখ চেয়ে চেয়ে বেঁচে থাকে যে, তাকে এমনি ক'রে তুই মারবি তাই। ছেলে ! ঝাড়ু মার অমন ছেলের মুখে ! অমন ছেলে আমার হ'ত তো গলা টিপে তাকে মারতাম।"

ভিখনলাল বলে"বেশক্ বেশক্। এমন ছেলে তো ছেলে নয় দুষমন্ !"

রামধারী বলে, "আর তুই বেটা, সুখী মানুষ এত দিন সুখে সুখে থেকেছিস, তোর কি এই সাজে। ঘরে এমন বহু আছে এত ধন দৌলত ! কিসের দুখঃ তোর। এক ছেলে গেছে এখনো তোর দশ ছেলে হ'বার বয়স আছে। ঘরে যা, 'খা' দা' 'বহু' নিয়ে স্ফূর্তি ক'রে থাক। তা নয় এই বিদেশে এসে না খেয়ে দেয়ে যত শালা শয়তান গুণ্ডা ছাই মেখে গাঁজা খেয়ে টং হ'য়ে আছে সবার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবি ; এ তোর পোষাবে কেন বল দেখি ?"

শিশিরের মতিগতি যখন কতকটা বদলাইয়া গেল তখন রামধারী অনেকটা আশ্বস্ত হইল, কিন্তু বাবু বাড়ী ফিরিবার নামও করে না দেখিয়া সে অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। এখন যেসব বন্ধু বান্ধব বাবুর কাছে আসিতে লাগিল, তাহাদেরকেও রামধারী প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিত পারিল না।

"আরে বেটা, ঘরে তো দুঃখ কিসের। সেখানে কত সব আমীর লোক তোর কাছে আসে, কত খাতির তোর! তা না এখানে যত সব লজ্ঝড়্ নিষ্কর্ম্মা ইয়ার জুটিয়ে তাদের নিয়ে হৈ হৈ, আজ দিল্লী কাল কাশ্মীর পরশু গুজরাট—কোথায় বোম্বাই, কোথায় কন্যাকুমারী—হৈ হৈ ক'রে ছুটে বেড়াস্! কিসের দুঃখে রে বাপু? আর পড়ছেন। বই আনছেন আর পড়ছেন। পড়ে পড়ে হাড় কালি হ'য়ে গেল। আরে তোর সুখের শরীর তাতে এত সইবে কেন? এই শালা রামধারী না থাকতো তো এতদিন শুঁটকী লেগে মরে থাকতিস। ঐ সব ইয়ার বন্ধুদের কেউ ফিরে দেখতে আসতো না। তখন বুঝতিস বেটা।"

এলাহাবাদের তামাকুওয়ালা ওসমান মিঞার কাছে সে এই মর্ম্মে নানা রকম নালিশ করিয়া তার দোকানে বসিয়া দুই-চার ছিলিম পোড়াইত।

তার নালিশ ছিল সমস্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে, স্বয়ং 'মাইজি' মিনতিও তাহাতে বাদ পড়িত না। সে প্রায়ই বলিত, "আর তোকেও বলি, ধন্যি মেয়ে মানুষ তুই। এমন সোণার সোয়ামী তোর ভেবে ভেবে না খেয়ে দেয়ে শুকিয়ে মরছে, আর তুই হারামজাদী কোন সুখে বাড়ীতে ব'সে আছিস। ধন দৌলত নিয়ে ডুবে আছেন—আরে বেটী বাবুই যদি ফোত হয়ে যায় তবে ধন দৌলতে তোর কি হবে বল। তখন তো এক বেলা ভাত খেয়ে সাদা থান প'রে কাটাতে হবে! এ সোজা আক্কেলটুকু তাকে দেননি ভগবান! মেয়েমানুষ, তাদের কতটুকুই বা আক্কেল বল। নইলে সে যদি আস্‌তো বাবুর কাছে ঘর-দুয়ার সকল ফেলে যদি বাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়তো, তবে সব মিটে যেতো। তা' সে হারামজাদার বেটীর তো এদিকে আসবার নামটাও নেই। এত বচ্ছর হ'য়ে গেল, একটাবার মনে হ'ল না—দেখে আসি সোয়ামীটা কি হালে আছে? কলিকাল ভাই

কলিকাল। সীতা-দেবীর দিন থাকতো মিঞা, তবে কি এমনি হ'তে পারতো ? আর এই বাঙ্গালী বাবুদের জাতটাই মেয়েদের সব খারাপ ক'রে দিয়েছে আদর দিয়ে দিয়ে। আমার ঘরে এমন হ'ত তবে জুতা মেরে শালীকে ঢিট বানিয়ে দিতাম।"

ওসমান বলিত, "বেশক। এতে আর কি কথা আছে।" এবং সে নিজে যে তার দুই দুইটা স্ত্রীকে কি অপূর্ব্ব পৌরুষের সহিত জুতা মারিয়া ঢিট করিয়া রাখিয়াছে সে কথা বিশদরূপে বর্ণনা করিত।

একদিন সে ওসমানের সঙ্গে উমার সম্বন্ধে এইরূপ স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতেছিল। "সে বেটী আছে আসল শয়তান। বাবুর ঘাড়ে বসে বেটী তার রক্ত শুষে খায়। আর চুরি ক'রে ক'রে পেট মোটা ক'রে ফেলেছে। সে পারতো সব ঠিক ক'রে দিতে। আরে তোর তো বুদ্ধি আছে—তুই কোন বহুটাকে নিয়ে বাবুর কাছে এলি ? তা নয়—সে বেটী বাড়ী ঘর আগলে বসে আছে—খেয়ে খেয়ে খালি পেট মোটা ক'রছে—একটা বেটা আছে—তার পেট মোটা ক'রছে—আর বাড়ীতে ব'সে আছে। ভাইটা ম'রছে তাতে তার কি আসে যায় ?—আসল শয়তানি ! কি বলবো ভাই, এই মেয়েমানুষ জাতটার উপর আমি বেজায় চটে গেছি। আর সেই শালা —তার বেটা"—

এমন সময় রমেন আসিয়া বলিল, "এই যে রামধারী ভাই ? মামা বাবু কোথায় ?"

রামধারী বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া উঠিল। রমেনের সম্বন্ধে তার মতামত চট করিয়া বদলাইয়া গেল। যা' হ'ক এ তো অন্ততঃ বাবুর একটা খবর করিতে আসিয়াছে। না করিবে কেন ? এরা মায় পোয়ে তো বাবুর খাইয়াই মানুষ। মানুষ তো ? এর কি একবার না মনে হইয়া যায় যে, যে তাদের অন্নদাতা সে বেচারা এই কষ্টে আছে।

সে মহাসমাদরে রমেনকে ঘরে লইয়া বসাইল। তাহাকে জল খাওয়াইল—খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিল।

বাবু বিন্ধ্যাচল বেড়াইতে গিয়াছেন শুনিয়া রমেন দমিয়া গেল। কিন্তু সে সব কথা খুলিয়া বলিতে সাহস করিল না। তার কাছে রামধারী শুনিল যে মিনতি প্রয়াগে আসিয়াছে। সে উৎফুল্ল হইল, বলিল, "চল বাবু তাঁকে গিয়ে এখানে নিয়ে আসি। আপনার ঘর থাকতে তিনি পাণ্ডার ঘরে কেন থাকতে যাবেন।"

"আমরাও তো তাই ভেবেছিলাম ভাই? কিন্তু বাবু নাই, তিনি কি মনে করবেন জানি না, তাই আনতে ভরসা হয় না।"

"আর কি মনে ক'রবে? মনে ক'রলেই হ'ল আর কি মাইজী আসুন এসে এখানে সুস্থ হয়ে থাকুন, আমি আজ দুপুরের গাড়ীতে গিয়ে বাবুকে নিয়ে আসছি। দেখা শুনা হ'ক।"

"না রামধারী, সে হ'বে না। বাবু না বল্লে মামীমা আসবেন না।"

"হুঁ" বলিয়া রামধারী গম্ভীর হইয়া গেল। সে কতকটা বুঝিল। মিনতি যখন কষ্ট করিয়া এতটা দূর আসিয়াছে তখন আর রামধারীর তার উপর রাগ রহিল না। সুতরাং মিনতির এ অভিমান সে বুঝিল—বুঝিয়া মিনতিকে দোষ দিতে পারিল না! স্বয়ং জানকী মাইওতো অভিমান করিয়াছিলেন। কেনই বা মিনতি না করিবে অভিমান?

সে বলিল, "হুঁ বুঝেছি। আচ্ছা দেখি! মাইজী কোথায় আছেন?"

রমেন বিস্তারিত ঠিকানা লিখিয়া দিল। রামধারী তাহা তার আঙ-রাখার পকেটে রাখিয়া দিল।

তারপর রমেন বিদায় হইয়া গেলে রামধারী দরজায় চাবী লাগাইয়া তার লোটা লইয়া পাগড়ী বাঁধিয়া ষ্টেসনে চলিয়া গেল।

বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়া সে সহজেই বাবুর সন্ধান পাইল। বাবু তখন তার বন্ধুদের লইয়া বনভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত।

শিশিরকে নিভৃতে ডাকিয়া রামধারী বলিল, "মাইজী এসেছেন, আপনি এখন চলুন, দুই ঘন্টা বাদে গাড়ী আছে।"

শিশির খবরটা শুনিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর সে বলিল, "তুই সেই গাড়ীতে ফিরে যা' তাঁদের দেখা শোনা করগে' যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। আমি আজ ফিরতে পারবো না।"

রামধারী অবাক্ হইয়া গেল। সে একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সে ভাল হয় না বাবু—"

ধমক দিয়া শিশিব বলিল, "দেখ তুই আমাকে ভালমন্দ শেখাতে আসিস্ না। চুপ ক'রে—যা বলছি তাই ক'রে যা। মুনিবের কথার উপর কথা কইতে সাহস করিস্ না।"

রামধারীর মাথা কাটা গেল। এমনটা যে হইবে, সে তাহা কল্পনা করে নাই। এবং এজন্য পূর্ব্ব হইতে সে কোনও ভাবনা চিন্তাও করে নাই। উপস্থিত বুদ্ধির বলে কোনও অপ্রত্যাশিত অবস্থার যোগ্য কথা বলা বা যোগ্য কাজ করিবার জন্য রামধারী বিখ্যাত ছিল না। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে একেবারে অকূলে পড়িয়া গেল। সে ঝোঁকের মাথায় বলিয়া বসিল যে, সে বাবুকে সঙ্গে না লইয়া ফিরিবে না।

শিশির ভয়ানক চটিয়া গিয়া তাকে গালিগালাজ করিয়া উঠিল এবং যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, যদি সে তা' না পারে,—তবে সে বিদায় লইয়া শিশিরের দৃষ্টি বহির্ভূত হউক। পরে সাদা বাঙ্গলায় শিশির বলিল "বেরো বেটা। বেরো এখান থেকে।"

রামধারী খুব চটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে তখন স্থির করিল যে সে বাড়ী ফিরিয়া তার তল্পী-তল্পা লইয়া মাইজীর সঙ্গে চুঁচুড়ায়

ফিরিয়া যাইবে। এমন অমানুষ মুনিবের কাছে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিবে না।

বাড়ীতে ফিরিয়া কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শিশিরকে ফেলিয়া যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, তাহা সে বুঝিল ;—কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার বিফল দৌত্যের লজ্জা লইয়া কালামুখ মাইজীর কাছে দেখাইতে আর ইচ্ছা হইল না।

শিশির বিন্ধ্যাচলে ইচ্ছা করিয়া দুদিন দেরী করিয়া ফিরিল। বাড়ীতে আসিয়া উঠিতে তার সঙ্কোচ বোধ হইল। মিনতি হয়তো আছে। সে যখন এতটা পথ আসিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই শিশিরের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইবে না। দেখা হইলে শিশির কি করিবে? কেমন করিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইবে? কি কথা তাকে বলিবে? এখন মিনতির সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় তার মনে নিজের সাফাই করিবার মত কোনও কথাই জুটিল না।

মিনতি তাকে কি কথা বলিবে তার সে নানারকম মুশাবিদা করিয়া ঠিক করিল। কিন্তু যে কথাই সে মনে করিল তার কোনওটার উত্তরে তার নিজের বলিবার মত কোনও কথাই তার মনে হইল না। এখন তার মনে হইল যে মিনতিকে বিবাহ করা অবধি এপর্য্যন্ত তার সমস্তটা ব্যবহারই অত্যন্ত গর্হিত ও অমানুষিক হইয়াছে। কিন্তু এখন সে আর কি করিতে পারে? এখন মনে হইল যে সব দিক রক্ষা হয় যদি মিনতি ঠিক আদর্শ সতীসাধ্বী বঙ্গ-রমণীর মত কোনও কথাবার্ত্তা না কহিয়া অতীত সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না করিয়া চুপচাপ এখানে থাকিয়া তার সেবা করিতে লাগিয়া যায়। তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইয়া মিনতিকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তার সন্দেহ হইল মিনতি সে শ্রেণীর মেয়ে নয়। তাহা যদি সে হইত তবে ইহার অনেক পূর্ব্বে সে আসিত। একখানা চিঠি মাত্র সে লিখিয়াছিল, তাতেও সে আপনাকে নত করে নাই। তার উত্তর না পাইয়া এপর্য্যন্ত সে আর চিঠি লেখে নাই, কোনও সংবাদই সে দেয় নাই। এত বড় যার প্রতিজ্ঞার জোর, এত দর্প যার, সে যে একদম চুপচাপ, যেন কিছু

হয় নাই এমনভাবে তার গৃহস্থালীর ভার লইয়া বসিয়া যাইবে এমন সে মনে করিতে পারিল না। তাই সে আসন্ন সাক্ষাতের ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ভাবে সঙ্কুচিত পদক্ষেপে সে উপরে উঠিয়া আসিল। রামধারী একপাশে জড় সড় হইয়া বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। বারান্দায় বসিয়া মুখ হাত ধুইয়া শিশির সঙ্কুচিত হইয়া তার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে কেহ নাই দেখিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঘরে চারিদিকে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে রাশি রাশি বই ছিল, তার মাঝে একখানা ময়লা চাদর পাতা বিছানা ও তাকিয়া। সেখানে বসিয়া সে বইগুলি লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল, আর বার বার সে পাশের শুইবার ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

রামধারী আসিয়া বলিল, "বিকালে কি রুটী হ'বে না কয়েকখানা লুচি বানাব ?"

কি জ্বালা ! একথা এ হতভাগা তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন ?

শিশির বলিল, "লুচিই কর।"

রামধারী অদেশ পাইয়া বাজারে চলিল। শিশিরের বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। এখন তো এ শূন্য গৃহে সে ও মিনতি ছাড়া আর কেহ নাই। এখনি বোধ হয় মিনতি আসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। সে বেশ সোজা ভাবে খুব গম্ভীর হইয়া বসিল—একখানা মোটা বই খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।

ছাই মনোযোগ ! তার মন সহস্র আশঙ্কায় পীড়িত হইয়াও সারা বাড়ীময় কেবল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল একটা পায়ের শব্দ, একটু চুড়ির ঠুন্‌—। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া না পাইয়া শিশির বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিল। ক্রমে সে উঠিল এবং নিঃশব্দে পায় পায় তার শুইবার ঘরের

দিকে অগ্রসর হইল। অত্যন্ত সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া সে ঘরের চারিদিক দেখিল—মিনতির চিহ্নমাত্রও নাই!

সে তখন ঘরটা একরকম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল—কোথাও এমন কিছুই দেখিতে পাইল না যাহাতে এ ঘরে কোনও স্ত্রীলোক আসিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।

তার পর শিশির বাহির হইয়া গেল। এই দুটি ঘর ছাড়া এ বাড়ীতে ছিল শুধু রামধারীর থাকিবার একটা ঘর এবং নীচে রান্নাঘর। নীচের অবশিষ্ট ঘর সব দোকান। শিশির ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া আসিল।

অবসন্ন হইয়া সে তার পড়ার ঘরে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

মিনতির সঙ্গে সাক্ষাতের আশঙ্কায় সে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তার মন প্রসন্ন হইল না। সে ভয়ানক দমিয়া গেল। রামধারীর কাছে শুনিয়া মিনতি নিশ্চয় রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—হয় তো বা কাঁদিয়া গিয়াছে। এ কথা ভাবিতে তার ভয়ানক অনুশোচনা হইল।

রামধারী ফিরিয়া আসিলে তার মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল তার কাছে মিনতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে। কিন্তু কোন্ লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিবে? জিজ্ঞাসা করিলে রামধারী ভাবিবে কি? সে হয় তো একটা শক্ত কথাই বলিয়া বসিবে।

অনেক কষ্টে সে তার উদ্বেগ দমন করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে মন তার ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে চিন্তা করিয়া দেখিল মিনতির সঙ্গে সে নিজের কার্য্যে এতবড় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে কোন মতেই সে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

রাত্রে খাইবার সময় অনেকবার বলি বলি করিয়া, অনেকবার ঢোক

গিলিয়া শেষে শিশির জিজ্ঞাসা করিল, "এ রা সব কখন চলে গেল রে রামধারী ?"

রামধারী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "পরশু দিন।" আর কিছু বলিল না।

বস্, ফুরাইয়া গেল। আরও তার অনেক কথা জানিবার আছে—মিনতি কি বলিয়াছে, কি করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক 'জিজ্ঞাস্য আছে ; কিন্তু কেমন করিয়া সে-কথা জিজ্ঞাসা করিবে ?

অনেক কষ্টে শেষে শিশির বলিল, "তা, হ'লে মাত্র একদিন ছিল এখানে ?"

রামধারী পূর্ব্ববৎ বিরক্ত ভাবেই বলিল, "তা' হ'বে। আমি জানি না, তাঁরা তো এ বাড়ীতে উঠেন নি।"

এ বাড়ীতে উঠেন নি ? বটে ? মিনতি ভাবিয়াছিল সে এখানে আসিলেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাকে আদর করিয়া আনিবে। আর সে আদর সে করে নাই বলিয়া অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুদিন তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াও যায় নাই। এত তেজ ! এত দর্প ! কেন ? মিনতি তাকে ভাবিয়াছে কি ? স্বামী সে, স্ত্রীর উচিত তাকে প্রসন্ন করা, স্বামী যদি রাগ করে তবে নত হইয়া তাকে জয় করা।—তাহা করা দূরে থাকুক, মিনতি যখন দেখিল যে শিশির বাড়ী নাই, সে একটা দিন অপেক্ষাও করিল না, রামধারীর মুখের একটা কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল ! ঈস্! এত দর্প ভাল নয়। কেন ? সে কি পুরুষ মানুষ নয় ? মিনতিকে ছাড়া তার এতদিন চলিল, আর জীবনের বাকী কয়টা বৎসর চলিবে না ?

শিশির ধরিয়া লইল যে রামধারী আসিয়া, তার সঙ্গে শিশিরের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা মিনতির কাছে বলিয়াছে, এবং তাহাতেই মিনতির রাগ হইয়াছে। সে বিষয়ে সে রামধারীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা

পর্য্যন্ত করিল না। রামধারীর উপর সে ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গেল—সে হতভাগার ত সব কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী চটিল মিনতির উপর—তার এত রাগ দেখিয়া।

রামধারী ইহাতে বাঁচিয়া গেল। তার মনে এ বিষয়ে অনেকটা অনুশোচনা ছিল। তার মনে হইতেছিল যে সে যদি বিন্ধ্যাচলে না গিয়া মিনতির সঙ্গে দেখা করিত, তবে মাইজীকে শিশিরের অবস্থার কথা বলিয়া কহিয়া মন ভিজাইয়া সে তাহাকে বাড়ীতে আনিতে পারিত। তার পর দিন বাবু আসিলেই সব মিটিয়া যাইত। তার মনে হইতেছিল যে তার চালের ভুলেই মিনতি এত কাছে আসিয়াও ছিটকাইয়া দূরে চলিয়া গেল। সে এ কথা ভাবিয়া অনেকবার আপনাকে তিরস্কার করিয়াছে। শিশির তার কাছে এসব কথা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে যে কিরূপে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার লাফাই গাহিবে তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই! তাই শিশির এসব কথা না জিজ্ঞাসা করায় সে বাঁচিয়া গেল।

ইহার পর শিশিরের মনটা কয়েকদিন ভারী খারাপ অবস্থায় রহিল। কিন্তু তার ফলে সে একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া তার কাজ কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিল।

দুই মাস পর শিশির Thomas Cook & Co র ব্যাঙ্ক হইতে একখানা রেজেষ্টারী চিঠি পাইল। চিঠিখানা তার হুগলীর ঠিকানা ঘুরিয়া আসিয়াছে।

চিঠি পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া শিশির তাহা খুলিল। তার ভিতর একখানা পঞ্চাশ টাকার চেক ও সঙ্গে একখানা চিঠি পাইল: চিঠি লিখিয়াছে টমাস কুক কোম্পানী। তার মর্ম্ম এই যে কোম্পানী মিঃ ডি মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিশিরকে এই পঞ্চাশ টাকা তাঁর ঋণশোধ বাবদ পাঠাইতেছেন। এবং মিঃ মুখার্জ্জী তাঁহাকে এ সংবাদও জানাইতে

বলিয়াছিলেন যে তিনি ভাল আছেন এবং তাঁর অবস্থা এখন বেশ ভাল। এ পত্রের কোনও উত্তর আবশ্যক করে না।

অনেকক্ষণ আবিষ্টের মত চেক ও চিঠির দিকে শিশির চাহিয়া রহিল। সে তার যেন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

অনেকক্ষণ পর সে অর্থ পরিগ্রহ করিল। দিলীপ যাইবার সময় ৫০৲ টাকা শিশিরের বাক্স হইতে কোনও উপায়ে বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং যাইবার সময় যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে জানাইয়াছিল যে, দিন পাইলে সে ইহা পরিশোধ করিবে। আজ সে স্নেহময় পিতার সেই সামান্য অর্থের তুচ্ছ ঋণ পরিশোধ করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করিতেছে।

নিদারুণ ক্ষোভে শিশিরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দিলীপকে সে হারাইয়াছে এবং তার কোনও অমঙ্গল হইয়াছে যত দিন শিশিরের মনে এই ধারণা ছিল, ততদিন সে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিল। এবং যখনই তার কথা ভাবিয়াছে তখনই শিশির আপনাকেই এ ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণ দোষী করিয়াছে। দিলীপের উপর কোনও অভিযোগ অনুযোগ সে এক দিনের তরেও করে নাই।

আজ সে জানিল দিলীপ ভাল আছে, সে পয়সা উপায় করিয়া বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় আছে। আর সে তার অর্জ্জিত অর্থে পিতার ঋণ পরিশোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে। শিশিরের সমস্ত অন্তর পুত্রের উপর অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল। হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ পুত্র পিতার যে অপরিসীম স্নেহ লাভ করিয়াছে—এই তার প্রতিদান! তার তো কোনও ক্ষতিই হয় নাই। সে ভাল আছে, সুখে আছে। তার চক্ষে তার পিতারও ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা—সেই পঞ্চাশ টাকা সে তাকে ফেরত পাঠাইয়াছে। উন্মত্ত রোষে শিশির চেক এবং চিঠি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তেরটি বৎসর জীবনের সকল স্নেহ দিয়া, সে অশেষ যত্নে দিলীপকে মানুষ করিয়াছিল। বিদ্যুৎ ও শিশির দুজনের অপরিসীম স্নেহ দিয়া তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, শরীরের প্রত্যেকটি অণু গঠিত। একমুহূর্ত্তের ক্রোধে সেই পুত্র তার সে সকল স্নেহের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত করিয়া পিতার হৃদয়ে যে তুষানল জ্বালিয়া গেল, এতদিন তিল তিল করিয়া শিশির তাহাতে পুড়িয়াছে। তার সমস্ত জীবনটা ছাই হইয়া পুড়িয়া গিয়াছে পুত্রের হাতে এই মর্ম্মান্তিক শাস্তি পাইয়া। তার আশা ভরসা উবিয়া গিয়াছে, জীবনের আনন্দ উজাড় হইয়া গিয়াছে—সে জীবনের সব হিসাব চুকাইয়া আজ পঞ্চাশ বছর বয়সেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—কেবল আদরের দুলাল দিলীপের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে বলিয়া! আর সেই পুত্র—একটি দিনও তার একথা মনে হয় নাই—একটা খোঁজও সে লওয়া আশুক মনে করে নাই—পিতার যে কি দশা হইল সে কথা একটি বার ভাবে নাই। সে জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া এই পুরস্কার পিতাকে পাঠাইয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় সে পিতার সমস্ত জীবনের ভস্ম দিয়া গড়া সেবা ও স্নেহের ঋণ শোধ করিয়াছে।

অসহ্য বেদনায় শিশির ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। সে ঘরে বসিয়া ছিল, উঠিয়া পড়িল—ছুটিয়া নদীর ধারে গিয়া খুব নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। এই পুত্র! ইহার জন্য সে তার জীবনটা নষ্ট করিয়াছে—মিনতিকে জীবন্ত সমাধি দিয়াছে, তার আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলের হৃদয়ে অশেষ ব্যথা দিয়াছে! ইহারই জন্য! এই তার জীবন-যজ্ঞের পুরস্কার!

পুত্রের এ নির্ম্মম অপমানে চারিদিক দিয়া তার ব্যর্থ জীবন হাহাকার করিয়া উঠিল। তার মনে হইল কত সুখে তার জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, কত সুখের আশা লইয়া সে যৌবনে উপচীয়মান সুখ সম্ভোগ করিয়াছিল। মনে পড়িল তার প্রথম জীবনের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

পড়া শেষ করিয়া সে চাকরী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিল—অন্নের জন্য নয়, প্রতিপত্তির জন্য নয়,—অন্নের তার অভাব ছিল না, প্রতিপত্তির অন্য পথ তার বিস্তৃত ছিল—সে কেবল আশা করিয়াছিল যে ডেপুটীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে দরিদ্রের উপকার করিবে, লোকের সেবা করিবে। চাকরী আরম্ভ করিবার পরই সে তার জীবন সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিল বিদ্যুৎকে। পরিপূর্ণরূপে বিদ্যুৎ তার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল। গৃহে বিদ্যুৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল অফুরান সুখের আয়োজন, হাসি দিয়া সে তার জীবন ভরিয়া রাখিয়াছিল। আবার সচিবরূপে সে তার সর্ব্ব কর্ম্মে সহায় ছিল। সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায় তাদের চিত্ত ছিল এক সুরে বাঁধা। সেবা ছিল দুজনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নানা দেশে ঘুরিয়া নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া তারা দুজনে কাজ করিয়াছে, দুঃখীর দুঃখমোচন করিয়াছে, নিরন্নকে অন্নদান করিয়াছে, অত্যাচারিতকে রক্ষা করিয়াছে, আর্ত্তকে ত্রাণ করিয়াছে। যেখানে গিয়াছে সেখানেই তারা নানারকম লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে; রাজদত্ত অধিকার নির্ভয়ে পরিচালন করিয়া শিশির রাজশক্তিকে প্রজার রক্ষা ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ত নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে গিয়াছে সেখানেই তারা লোকের হৃদয় ক্রয় করিয়াছে,—তাদের দুজনকে বিদায় দিতে সব স্থানেই লোক কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। এই সার্থকতার আনন্দে তারা পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া গণ্য করে নাই, ত্যাগকে পরমলাভ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে—জীবন তাদের আনন্দের, আশার রঙ্গিন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া কাটিয়াছে।

তার পর বিদ্যুৎ হঠাৎ বিদায় লইল! তার লক্ষ্মী চক্ষের নিমেষে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। সেই বিদায়ের ব্যথা আজ আবার নিবিড় হইয়া শিশিরের হৃদয় মথিত করিল। তার মনে পড়িল বিদ্যুতের বিদায়-কাতর চক্ষের সেই শেষ করুণ দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যে শিশিরের অন্তরের ভিতর তীক্ষ্ণ

ছুরিকার মত বিঁধিয়াছিল। তার একটু পূর্ব্বে বিপুল চেষ্টায় বিদ্যুৎ বলিয়াছিল খোকাকে আনিতে। খোকা অসিলে শিথিল মুষ্টিতে তার হাত ধরিয়া সে আকুল নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, কি জানি বলিতে তার মন আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কিন্তু তার সে মধুর কাকলী যে চির দিনের তরে তখন রুদ্ধ হইয়াছে! তাই কেবল বিস্ফারিত চক্ষুর আকুল করুণ দৃষ্টি দিয়া সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ছিল—তার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই দৃষ্টি দিয়া শিশিরকে কত কথাই বুঝাইয়াছিল। সে বুঝাইয়াছিল—দিলীপ রহিল, বাপ মা হইয়া শিশির যেন তাকে পালন করে। বুঝাইয়াছিল, "আমি গেলাম, কিন্তু দিলীপ রইলো। এর মুখ চেয়ে তুমি আমার জন্য দুঃখ শান্ত করো।" বুঝাইয়াছিল, দিলীপকে মানুষ করাই তাদের দুজনের জীবনের ব্রত ছিল, সে ব্রত যেন শিশির পালন করে। আরও কত কথা বুঝাইয়াঝিল। সুধু কথায় তার সব প্রকাশ করা যায় না, দিলীপকে আশ্রয় করিয়া মুগ্ধ পিতামাতার যত আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের অন্তরে অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় একটা সংযোগ, তাদের সমস্ত জীবন-মরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—সে সমস্ত ঐ এক শেষ দৃষ্টির ভিতর ঢালিয়া দিয়াছিল।

সেই দৃষ্টির স্মৃতিতে অনেক দিন শিশির আপনাকে সঙ্কুচিত অনুভব করিয়াছে। অনেক দিন সে আপনাকে অপরাধী মনে করিয়াছে—বিদ্যুতের সে বিশ্বাস, তার সে চরম অনুনয়ের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া শিশির মনে মনে মরিয়া গিয়াছে।—কিন্তু আজ সে সঙ্কুচিত হইল না, আজ আর তার আপনাকে অপরাধী মনে হইল না। আজ মনে হইল যে শিশির যাহা করিবার করিয়াছে। সামান্য যে বাহ্যিক ত্রুটি হইয়াছিল, সমস্ত জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া সে তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এ কয় বৎসরের সঞ্চিত অশ্রুর ডালি

লইয়া আজ সে নির্ভয়ে বিদ্যুতের আত্মার সম্মুখে দাঁড়াইল—অসঙ্কোচে সে তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার যা করিবার করিয়াছি—কিন্তু তোমার ছেলে হইয়া দিলীপ আমার স্নেহের এই অপমান করিয়াছে।" পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সে আজ বিদ্যুতের কাছে অভিযোগ করিল। আজ যেন তার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল বিদ্যুতের সহানুভূতি, তার করুণার্দ্র সান্ত্বনার বাণী। বিদ্যুৎ যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন যখনি শিশির কোনও ব্যথা পাইয়াছে তখনই ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছে বিদ্যুতের কাছে—আর বিদ্যুৎ তার অপরিসীম প্রীতি দিয়া সান্ত্বনা বিলাইয়া তার মনের সকল ব্যথা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াছে। আজও তার তেমনি মনে হইল। মনে হইল, বিদ্যুৎ যেন তার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিতেছে,, "কোনও দুঃখ নাই প্রিয়তম! তোমার কাজ তুমি করিয়াছ, অকৃতজ্ঞ অল্পবুদ্ধি বালক তার মর্য্যাদা রাখে নাই, সে তারই দুর্ভাগ্য, তোমার কিছু নয়।" শিশিরের মনে হইল যে আজ যদি বিদ্যুৎ বাঁচিয়া থাকিত তবে সে শিশিরের মাথা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া ঠিক এই কথাই বলিত। বিদ্যুতের এ আশ্বাসবাণী সে অন্তরের ভিতর অনুভব করিয়া তার নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় আশ্চর্য্যরকম শান্তি অনুভব করিল।

সে উঠিল। মনটা অনেকটা ঠাণ্ডা করিয়া বাড়ী ফিরিল। তবু মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর রুদ্ধ অভিমান দারুণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। দিলীপের উপর সে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিল।

দিলীপের চিঠি অনেক দিন ধরিয়া শিশিরের চিত্তের তলায় বিষক্ষরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছুই করিল না। একবার তার মনে হইয়াছিল যে টমাস কুক কোম্পানীর কাছে অনুসন্ধান করিয়া দিলীপের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিবার চেষ্টা করে—কিন্তু

পর মুহূর্ত্তে সে ঘৃণার সহিত এ চিন্তা দূরে সরাইয়া দিল। সেই স্থির করিল দিলীপের সঙ্গে আর সে কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না।'

ইহার চার মাস পরে সে হঠাৎ মিনতির টেলিগ্রাম পাইল, "দিলীপ ফিরিয়া আসিয়াছে, তুমি ফিরিয়া এসো।"

এই টেলিগ্রাম পাইয়া তার সমস্ত অন্তর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এখন দিলীপ ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখাইতে আসিয়াছে যে সে পিতার উপর কঠিন প্রতিশোধ লইয়াছে। বাপকে ত্যাগ করিয়া গিয়া তার কোনও ক্ষতি হয় নাই, সে মানুষ হইয়াছে—তার জন্য বাপের সাহায্যের কোনও দরকার হয় নাই, এই কথাটা দর্প করিয়া দেখাইবার জন্য সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এ কথা ভাবিতে শিশিরের অন্তরে যে জ্বালা উপস্থিত হইল তাহাতে সে দারুণ অশান্তি বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি চাদর লইয়া বাহির হইয়া গেল। তিন মাইল দূরে এক উকীল বাবুর বাড়ী গিয়া দাবা খেলিতে বসিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দাবা খেলিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

রাত্রে সে ছটফট করিয়া কাটাইল—তার কাছে সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিল অকৃতজ্ঞ পুত্রের এই অশোভন দম্ভ। ইহা তার বঞ্চিত জীবনের স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এমন তপ্ত বিষ ঢালিয়া দিল যে তার জীবন অসহ্য বোধ হইল।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে নিদ্রাহীন শয্যাত্যাগ করিয়া সে রামধারীকে উঠাইল। তল্পী তল্পা বাঁধিতে হুকুম করিল। ভোরের ট্রেণে সে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল, টিকিট করিল পেশাবরের।

যাইবার সময় মিনতিকে সে লিখিয়া গেল,—

"দিলীপ আসিয়াছে, বেশ কথা। এখন তোমরা দুজনে বন্দোবস্ত করিয়া যে ভাবে তোমাদের থাকিবার সুবিধা বিবেচনা কর তাই কর

তুমি যেখানে থাকিতে ইচ্ছা কর সেখানেই থাকিতে পার, যত টাকা তোমার দরকার তাহা সম্পত্তি হইতে লইতে পার।

আমি এতদিনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। দিলীপ এখন বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে পারিবে, এখন আর সংসারে আমার কোনও কাজ নাই। আমি এখন চলিলাম। আমি কোথায় থাকি কি করি সে সম্বন্ধে কোনও খোঁজ তোমরা করিও না। খোঁজ করিলেও পাইবে না। জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন সব ভুলিয়া একটু শান্তিতে কাটাইতে চেষ্টা করিব।"

শিশিরের এই পত্র পাইয়া মিনতির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এ কি হিতে বিপরীত করিয়া বসিল সে। এতদিন যা' হ'ক শিশির একরকম আনন্দে স্বচ্ছন্দে ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ অজ্ঞাতবাসে সে যে কোথায় কি কষ্ট পাইবে তার কোনও ঠিকানা নাই। ভাবিতে ভয়ে মিনতির কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল।

সে চিঠি পাইয়া ছুটিয়া গেল তোতারামের কাছে। তোতারাম শুনিয়া একটু বিষণ্ণ হইল, মিনতির দুঃখ দেখিয়া। কিন্তু সে বলিল, "মা এর জন্য দুঃখ ক'রছেন কেন? তাঁর দুঃখ পাওয়াই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে জানবেন এ-ত তাঁর লীলা, আনন্দময়ের এ এক আনন্দ, এতে বিচলিত হওয়া তো আপনার উচিত নয়।"

মিনতি বলিল, "কিন্তু এ কি সৃষ্টিছাড়া কথা বাপু! কোথায় আমি তাঁর কাছে ছেলে বুঝিয়ে দিয়ে পালাব, না তিনি আমাকে এমনি ক'রে যন্ত্রণা দিচ্ছেন। তোরা বাপ বেটায় কি আমাকে দুঃখ দিতে এতই ভালবাসিস?"

দুঃখের আবেগ ও গভীরতায় মিনতির অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছিল —তার মনটার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল।

তোতারাম বলিল, "আমাকে কেন ব'লছেন মা, আমি তো আপনার কাছে অপরাধ করি নি।"

মিনতির হঠাৎ জ্ঞান হইল যে, তোতারামের উপর অভিমান করিলেও সে কখন তল্পী তল্পা লইয়া উধাও হইবে তার ঠিক নাই। তাই সে

তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবা, তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে। তোমার উপর আমার কোনও অভিযোগও নেই।"

কিন্তু তোতারামের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মিনতির কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইল না। সে কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তার মাথার ভিতর সব তাল-গোল পাকাইয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রমেনকে লইয়া কলিকাতায় গেল।

বিনোদকে যখন মিনতি গিয়া পায় জড়াইয়া ধরিল, তখন বিনোদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। এই চিরপ্রফুল্ল সুরসিক লোকটী হঠাৎ একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সস্নেহে সে মিনতিকে ধরিয়া উঠাইল। তাকে সান্ত্বনা দিয়া আস্তে আস্তে তার কাছে সব কথা শুনিল। তখনকার মত সে কিছুই বলিল না। ভাবিয়া দেখিবার সময় লইল। তার পর তারা স্বামী স্ত্রীতে মিনতিকে প্রফুল্ল করিবার জন্য চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা বেলায় মিনতি বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায়, এখন কি করি বলুন।"

বিনোদ বলিল, "এত তাড়া দিলে চলবে কেন দিদি? এত বড় জটিল সমস্যা—এর কি এত তাড়াতাড়ি মীমাংসা হয়? সেই ইংরাজী কথাটা জানিস তো, তাড়াতাড়ি কাজ ক'রলে ধীরে সুস্থে পস্তাতে হয়। একবার জীবনে তাড়াতাড়ি একটা বড় কাজ ক'রেছিলাম। সেই থেকে পস্তাচ্চি। আর তাড়াতাড়ি আমার দ্বারা হ'বে না।"

"কিন্তু আমার তো আর সময় নেই মুখুজ্জে ম'শায়। আমার মনে হ'চ্ছে এখুনি একটা কিছু না ক'রলে যেন একটা শুভ মুহূর্ত্ত আমি জন্মের মত হারাব। আচ্ছা, যদি আমি ধাঁ ক'রে প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হই, তবে কি হয়?"

"কিছুই হয় না, কেন না সে প্রয়াগে নেই—এই দেখ টেলিগ্রাম।"

মিনতির কাছে কথাটা শুনিয়াই বিনোদ প্রয়াগে জরুরী টেলিগ্রাফ

করিয়াছিল। সে টেলিগ্রাফের জবাব আসিয়াছে—শিশির প্রয়াগে নেই, কোনও ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু বাড়ীতে তালা দিয়া গিয়াছে; হয়তো শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারে। রামধারী সঙ্গে গিয়াছে।

মিনতি এ টেলিগ্রাম পড়িয়া একদম মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

"তবে আর কোনও উপায় নেই!" বলিয়া সে এলাইয়া পড়িল।

বিনোদ বলিল, "উপায় খুব ভাল আছে ভাই, কিন্তু সে কথা আমি তোর কাছে এখন বলতে সাহস পাচ্ছি না।"

ব্যগ্রভাবে মিনতি বলিল, "কি উপায় মুখুজ্জে ম'শায়, বলুন, যা হয় হোক। আমি সব শুনতে প্রস্তুত।"

বিনোদ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, "এখন থাক ভাই, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বলবো।"

"কিন্তু আমার যে এখনি ফিরে যেতে হ'বে মুখুজ্জে ম'শায়। এখন না ফিরলে আবার ছেলে সেদিকে কি ক'রে ব'সবে তার ঠিক নেই। আমার তো বিপদ একটা নয়।"

"না তা নয়, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বৃত্তি হ'চ্ছে চারিদিকে মায়ার জাল ছড়িয়ে আপনাকে বিপদ দিয়ে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে ফেলা, যেমন গুটি-পোকা আপনাকে ঘিরে ফেলে। সে বৃত্তি তোর ষোল আনা আছে।"

"মায়া বলেন একে মুখুজ্জে ম'শায়? এই যে সত্য এই যে আনন্দ, এরই ভিতরই ভগবানের লীলা! এই স্নেহ প্রীতি আছে ব'লেই মানুষ বেঁচে আছে, আর তার বাঁচা সার্থক হ'চ্ছে। এ না থাকলে কিছুরই কোনও মানে থাকতো না।"

"তা সত্যি। অথচ তলিয়ে দেখলে এসবের ভিতর কিচ্ছুই নেই। জীবনটা, এবং তার সমস্ত ভালবাসাবাসি এ একটা ধোঁয়ার মত একদিনে মিলিয়ে যায়, তখন আর এর কোনও মানে থাকে না।"

"সব শেষ হ'য়ে যায়, কেন না লীলার স্বভাব হ'চ্ছে ক্ষণিক! কিন্তু তার মানে থাকে না সেটা সত্য নয়। একটা লীলা ফুরিয়ে যায় কিন্তু তার থেকে আর এক লীলার আরম্ভ হয়! সমস্ত বিশ্ব এমনি একটা লীলাস্রোত! এটা যে স্রোত, এ যে বয়ে যাচ্ছে এই তো লীলা,—এতেই এর সার্থকতা, এইটাই সত্য।"

"এ নেহাৎ বাজে কথা মিনু! Heracleitus সেকালে ব'লেছিলেন এ কথা, আর আজ সেটাকে নূতন ক'রে বলছেন Bergson, শাশ্বত চিরন্তন কিছুই নাই, একমাত্র শাশ্বত সত্য হ'চ্ছে ঘটনাস্রোতে—flux—becoming। কিন্তু এ কেবল কথার মার-পেঁচ মিনু। মনকে চোখ ঠারা। সত্য বলতে মানুষ চিরকালই বোঝে এমন একটা কিছু যা চিরস্থায়ী, যা নষ্ট হয় না। তেমন কিছু নেই বলা মানে এই যে জগতে সত্য কিছুই নাই সব মায়া,—সব ধোঁয়া। এর মত অশান্তিকর মতবাদ আর হ'তে পারে না।"

"ও ভাবে ধ'রলে এতে শান্তি পাবেন না সেটা ঠিক। কিন্তু যদি এইটা একবার বিশ্বাস করেন যে এ সবই এক লীলাময়ের লীলা—এর আদি নেই, অন্ত নেই, অনাদিকাল থেকে এ লীলা চলছে, অনন্তকাল এ চলবে,—আমাদের প্রত্যেকটী জীবন এই শাশ্বত লীলাপ্রবাহের এক একটা তরঙ্গ মাত্র, একবার মাথা তুলে আবার সেই শাশ্বত লীলাস্রোতের মধ্যে, সেই অফুরান রসধারার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে আপনাকে বিলুপ্ত করে সেই বিশ্বের রসপ্রবাহে ডুবে যাচ্ছি, তবে কি আনন্দ ভেবে দেখুন। যাকে ভালবাসি, তার জন্য প্রাণ চায় কি? প্রাণ চায় সেই প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে। আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে বিলুপ্ত করে দিয়ে তার পায়ের তলায় অণুকণার ভিতর মিলিয়ে যেতে। লীলাময়ের প্রেম যার মনে সত্য হ'য়ে জেগেছে সে নিজের জন্য এর চেয়ে কি

বড় সার্থকতা চাইতে পারে বলুন! আমি বিলুপ্ত হ'য়ে যাব, মিলিয়ে যাব সেই অনাদি অনন্ত রূপ-রসধারার মধ্যে ; এর চেয়ে আর কি আনন্দ আছে! সে আনন্দের সামান্য একটু স্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে জীবন আর বন্ধন থাকে না, ভালবাসায় কোনও ব্যথা থাকে না, সে সমস্ত কাজে সকল কথায় সেই লীলা রস সাগরের নর্ত্তন অনুভব করে, সারাটা জীবন সেই রসবোধের আনন্দে বিভোর হ'য়ে কাটিয়ে দেয়। এর চেয়ে শান্তির কথা, আনন্দের কথা আর আছে মুখুজ্জে ম'শায় ?"

মিনতির সমস্ত মুখ চোখ এক অলৌকিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনোদ অনুভব করিল যে এ সব কথা মিনতির কেবল বুদ্ধির অধিগম্য মতবাদ নয়, ইহা তার অন্তরের সাক্ষাৎ অনুভূতি, আর এ অনুভূতির আনন্দে মিনতি বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তার মুখের দিকে চাহিয়া, তার মুখে এ তত্ত্বকথা শুনিয়া বিনোদের চিত্তও এক অপূর্ব্ব রসে ভরিয়া উঠিল। ক্ষণভঙ্গুর-বাদকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া এমন সরস করিয়া কেহ কোনও দিন বলিয়াছে বলিয়া বিনোদের মনে হইল না। সে মুগ্ধ হইয়া শুনিয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তাই যদি হয় মিনু, তবে তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিলি কেন ? এ সবই তো তবে সেই লীলার অঙ্গ! এই খেলা তোকে খেলতে হ'বে। Be a sportsman, play the game !"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মিনতি বলিল, "ঠিক ব'লেছেন মুখুজ্জে ম'শায়। Play the game. এই কথাটাই জীবনের মূল সূত্র। কথাটা সব সময় মনে থাকে না এই যা' মুস্কিল। খেলা খেলে যেতে হ'বে—কিন্তু একথা ভুললে হ'বে না যে এটা খেলা, আর এ খেলার মালিক আমরা নই। যিনি খেলছেন তার হুকুম মাথা পেতে নিতে হ'বে।

"উঁহু, তাকে ঠিক playing the game বলে না। এইটা যদি তুমি ঠিক বুঝে থাক যে ভগবান তোমাকে নিয়ে একটা খেলা খেলছেন, তবে তোমাকে সে খেলায় পুরোপুরি যোগ দিতে হ'বে ; ছেলে খেলা করলে চলবে না। মনে কর তুমি আর আমি, এই ধর তাস খেলতে ব'সেছি। আমি যদি কেবলি ইচ্ছে ক'রে হেরে যাই আর তোমাকে জিতিয়ে দি, তা হলে খেলাটা একেবারেই মাটি হ'বে। তোমারও তা ভাল লাগবে না। কেন না জেতাটাই খেলার সার নয়—সার হ'চ্ছে লড়াই ক'রে জেতা। সুতরাং সংসারটা যদি ভগবানের জীবের সঙ্গে খেলাই হয় তবে যে জীব সে খবর জানে তাকে ষোল আনা পণ ক'রে খেলতে হ'বে জিতবে ব'লে, তার যতদূর শক্তি লড়তে হ'বে—খেলাকে খেলা ব'লে অগ্রাহ্য ক'রবে না—সমস্ত শক্তি দিয়ে খেলতে হ'বে। তবেই না জমবে খেলা। তাকেই বলি playing the game. আমি তোমাকে তাই ক'রতে বলছি।"

"তা কি করছি না আমি ? আর আমায় কি ক'রতে বলেন ? আমার নিজের সুখ দুঃখ ভুলে গেছি—যে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি তাতেই ডুবে র'য়েছি—আর আমায় কি ক'রতে বলেন ?"

"করতে বলি কি সেটা যদি বুঝতে চাও ভাই, তবে একটা বছর মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আট বছরের পুরানো চশমা দিয়ে একবার দেখতে হ'বে। মনে পড়ে কি মিনতি তখন কি আশা আকাঙ্ক্ষা তোর ছিল ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিনতি বলিল, "হাঁ তখন তো অনেক আশাই ছিল।"

এখন একবার পারিস না কি মনের ভিতর সেই সব আশা আকাঙ্ক্ষা আবার জাগিয়ে তুলতে ? কেন পারবি না ? কি হ'য়েছে তোর ? তখন

তোর চিন্তা ছিল নিজের জীবনটা সার্থক ও সফল ক'রে তোলবার, একটা বড় কিছু ক'রবার, একটা কাজের মত কাজ করে নাম রেখে যাওয়ার। সে সব হিসাবের মধ্যে তখন অন্য কেউ ছিল না, কেবল ছিলি তুই নিজে। বিয়ে হ'য়েছে ব'লে কি তোর সে সব ভুলে যেতেই হ'বে। তোর স্বামী তোকে ছেড়ে গেছে ব'লে তুই এতটা মুশড়ে যাবি কেন? তুই তো সাধারণ মেয়ে ন'স, যাদের স্বামী ছাড়া সত্তাই নেই, কোনও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই নেই!"

"নেই মুখুজ্জে ম'শায়—সংসারে নেই। সে কথা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। যে দিন থেকে তিনি চ'লে গেছেন সেই থেকে যে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি—সেই দিন থেকে বুঝতে পেরেছি বিবাহিতা নারীর স্বামী ছাড়া প্রতিষ্ঠার অন্য ক্ষেত্র নেই।"

"তোর মুখে এ কথা সাজে না মিনতি। এ কথা বাজে লোকের কথা।"

"তা হ'লে বাজে লোকেই সংসার ঠাসাঠাসি হ'য়ে আছে। সংসারের কি দেখতে পাই মুখুজ্জে মশায়? যার ধনী কি পণ্ডিত ব'লে কি অন্য কোনও রকমে সংসারে প্রতিষ্ঠা আছে, তার স্ত্রীকে অমনি সঙ্গে সঙ্গে লোকে মাথা পেতে নেয়। মহারাজার স্ত্রী হয় মহারাণী, আচার্য্যের পত্নী হয় আচার্য্যানী, সমাজনেতার স্ত্রী হয় সমাজনেত্রী—তা' হ'ক না মূর্খ, নীচাশয়—হ'ক না সে অতি হীন। আর যে নারী আপন চরিত্রবলে মহীয়সী রাণী হ'বার যোগ্য তারও কোনও প্রতিষ্ঠা থাকে না। দরিদ্র কেরাণীর স্ত্রীর পায়ের ধূলার যোগ্য না হ'য়েও ডেপুটি বাবুর স্ত্রী তাকে অনায়াসে কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন—আর সমস্ত সমাজ এ ব্যবস্থা মাথা পেতে নেয়। আর ডেপুটি বাবুর স্ত্রী যদি হাজার গুণবতী হন, তার স্বামী যদি আমার স্বামীর মত তাকে পরিত্যাগ করেন, তবে কীটাণুকীট যে

সেও তাকে অগ্রাহ্য করে। আমাদের সমাজের এই ব্যবস্থা, স্বামীর প্রতিষ্ঠায় স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর প্রতিষ্ঠার কোনও ক্ষেত্রই আমি খুঁজে পাই না—কেবল ধর্ম্মজীবনে ছাড়া।”

“এসব তোর অত্যন্ত সেকেলে কথা মিনতি। আজকালকার শিক্ষিত মেয়ের মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোর মুখে আমি এ কথা শুনতে চাই না। তোর প্রতিষ্ঠা তোর নিজের হাতে। স্বামী যদি তোমাকে অগ্রাহ্যই করে, তোমারও তো তাকে অগ্রাহ্য করে' স্বতন্ত্র পথে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার উপায় আছে। সেইটা তোমার করতে হ'বে—তাদেরকে দেখাতে হবে যে তারা যে স্পর্দ্ধায় তোমাকে অপমান ক'রতে চায় তোমার গৌরবের কাছে সে স্পর্দ্ধা লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়ে ফিরবে। বুঝতে পারছিস আমার কথা? একবার তোর মনের ভিতর এই স্পর্দ্ধাটা জাগিয়ে তোল যে আমি কারও চেয়ে ছোট নই, কারও জীবনের সার্থকতার উপাদান মাত্র নই, আমার একটা স্বাধীন সত্তা আছে—সেই সত্তাকে সার্থক ক'রতে হ'বে—স্বামী হউক, পুত্র হউক, যেই হউক তার এই স্বাধীন আত্মার স্বতন্ত্র পরিণতি লাভে বাধা দেবার অধিকার নেই। একবার মাথা ঝাড়া দিয়ে বলতে হ'বে, আমি স্বাধীন, আমার অদৃষ্ট আমার নিজের হাতে! বস্ তখন দেখতে পাবি কোনও কিছুতেই তোকে লজ্জা দিতে পারবে না, নিজের আত্মার দৈন্য ছাড়া। তখন প্রতিষ্ঠার জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকতে হ'বে না, পরের প্রসাদে গর্ব্বিত হ'তে হ'বে না, পরের লাঞ্ছনা তুচ্ছ ক'রে অবজ্ঞার ভরে পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে পারবে।”

বিনোদের কথাগুলি মিনতির শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া মিনতিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, তার মনে হইল, ইহাই সত্য, এই তার পথ। এতদিন কেবলি সে পরের মুখ চাহিয়া চলিয়াছে,পরের অবহেলায় পীড়িত

হইয়াছে, পরের মুখ চাহিয়া আপনার কর্ম্ম নিয়োজিত করিয়াছে। সে জীবনে এই পণ করিয়াছে যে স্বামী ও সপত্নী-পুত্র তার মাতৃত্বের যে অপমান করিয়াছে সেটা যে মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিবে। এ কয় বৎসর সে সেই অসত্যটাকে পরাজিত করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। এ কথা তার কোনও দিন মনে হয় নাই যে যেটা নিতান্তই অসত্য তাকে আবার পরাজিত করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। একথা তার কোনও দিন মনে হয় নাই যে যেটা নিতান্তই অসত্য তাকে পরাজিত করিবার চেষ্টার দরকার কি? সে এ অপমানে লজ্জিত লাঞ্ছিত বোধ করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখে নাই যে তার লজ্জার কোনও হেতুই নাই —লজ্জার হেতু হইয়াছে তার স্বামী ও দিলীপের। সে এই তুচ্ছ পরের মতটাকে এত বড় করিয়া নিজের ভিতরকার বৃহৎ আত্মার অপমান করিয়াছে।

আটটি বৎসর সে বৃথা অপচয় করিয়াছে এই দুইটি অন্যায়কারীর প্রসাদ অর্জ্জন করিবার জন্য। এ আট বৎসরে সে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীন ক্ষেত্র খুঁজিয়া কাজ করিত তবে সে কি না করিতে পারিত?

স্বামী তাকে বিনা দোষে ত্যাগ করিয়াছেন, তাতে একটা মুশড়াইয়া পড়া তার পক্ষে ঘোরতর দুর্ব্বলতা হইয়াছে। বেশ হইয়াছে—স্বামী তাকে চান না, তবে তো সে স্বাধীন। এখন সে কেন স্বাধীনভাবে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ না করিবে?

সে খুব ভাবিতে লাগিল। বিনোদের কাছে তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া সে চুঁচুড়ায় ফিরিল। পথে সে খুব উত্তেজিতভাবে ভাবিতে লাগিল, কোন্ পথে সে জীবনে সার্থকতার সন্ধান করিতে পারে। প্রথমেই তার মনে হইল ধর্ম্মজীবনের কথা। সে মুক্ত—সম্পূর্ণ স্বাধীন—কারো কাছে তার কোনও দেনা পাওনা নাই। সে কেন মীরাবাইর মত ধর্ম্মের কাছে

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিবে ? তীর্থানন্দ স্বামীর কাছে সে যে ধর্ম্মের মহাবার্ত্তার সন্ধান পাইয়াছে সেই ধর্ম্মের সাধন করিবে, জগৎকে সে বার্ত্তা শুনাইবে। মীরাবাইর মত গান গাহিয়া সে জগৎকে প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া দিবে। তার পর তার মনে হইল সেই মাতৃহীন শিশু দেখিয়া তার অন্তরে মাতৃত্বের সেই প্রথম আভাস। সেই কবিতায় সে ভগবানকে অনুযোগ করিয়াছিল এত বড় মায়ের হৃদয় দিয়া ভগবান তাহাকে সব মাতৃহারাকে বক্ষে টানিয়া লইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া। জগতে মাতৃহারা তো অনেক আছে—তার শক্তিও তো কিছু আছে—সে কেন সেই মাতৃহারা শিশুদের মা হইয়া সেবা করিবে না ? যতদূর তার ক্ষুদ্র শক্তি ততদূর সে না করিবে কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে তার কল্পনার চোখে তার জীবনের এই মহাকর্ত্তব্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। সে গুরুর পাদপদ্মে শিক্ষা লাভ করিয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়া ধর্ম্মের এ চিরপুরাতন, চিরনবীন বার্ত্তা প্রচার করিবে ; আর যেখানে যে মাতৃহারা অনাথ শিশু আছে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। সেখানে মাতৃহীন মায়ের অভাব ভুলিবে, তারা সমুচিত শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া জগতে বরণীয় হইতে পারিবে।

সে স্থির করিল, আর বিলম্ব নয়। বাড়ী গিয়া সে তোতারামের কাছে ছুটি চাহিবে। সে তো থাকিতে চায় না, তাকে বাঁধিয়া রাখিয়া লাভ কি ? তার পর সে তীর্থানন্দ স্বামীর সন্ধান করিয়া তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া নবজীবনের সূত্রপাত করিবে।

যখন সে চুঁচুড়ার বাড়ীতে ফিরিল, তখন তার মনে হঠাৎ আশঙ্কা হইল সে সমস্ত দিন যে বাড়ী ছাড়িয়া আছে, কি জানি যদি তোতারাম ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়া থাকে ? এমনি একটা অযথা আশঙ্কা তার প্রায়ই

হইত। কোথাও গেলেই সে ভয়ানক চঞ্চল চিত্তে বাড়ী ফিরিত, ভয় হইত, যদি ফিরিয়া তোতারামকে না দেখিতে পায়!

যখন বাড়ীতে ঢুকিয়া সে দেখিল, তোতারাম অপ্রসন্ন চিত্তে বাহিরের ঘরে পায়চারী করিতেছে, তখন তার খুব একটা শান্তির ভাব মনে আসিল। তার অন্তর তোতারামের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্নেহে ভরিয়া উঠিল।

তোতারাম বলিল, "কি মা, এত দেরী হ'ল আপনার? আমি তো ভেবেই ম'রছিলাম, না জানি কি হ'ল?"

সেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হাসিয়া মিনতি বলিল, "না বাবা, কি হ'বে আমার। হুগলী থেকে ক'লকাতা গেছি এতেই এত ভাবা বাবা—তবে এতদিন কোন দূরে কোথায় কেমন ক'রে প'ড়েছিলে আমায় ফেলে।"

তোতারাম বলিল, "এখন আর বোধ হয় পারবো না।"

তার পর মিনতি শুনিল যে সন্ধ্যার গাড়ীতে মিনতি না আসায় তোতারাম ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তার সায়ং সন্ধ্যা ও পাঠাদি কিছুই হয় নাই, সে খায়ও নাই, কেবল ছট্ ফট্ করিয়া ঘর ও বাহির করিয়াছে।

মিনতির সারা চিত্ত অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল। পথে আসিতে আসিতে সে যে সব সঙ্কল্প গড়িয়াছিল এখন সে সব চাপা পড়িয়া গেল। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোতারামের খাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মিনতির সঙ্কল্পগুলি ইহার পর মাঝে মাঝে মাথা খাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তোতারামকে লইয়া সে সংসারে এত ডুবিয়া গেল যে তার কিছুই করা হইল না।

কিন্তু বিনোদের কথায় তার উপকার হইল। সে চিত্তে অনেকটা শান্তিলাভ করিল। শিশিরের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সে বিষয়ে সে অনেকটা নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছে। তার এক কারণ এই যে এটা তার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে সে মনকে বাস্তবিকই এখন স্বতন্ত্রতার দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিশিরের ভালয় মন্দয় তার কিছু আসে যায় না এ ভাব সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে এখন আপন মনে সাধন ভজনে নিযুক্ত হইল।

আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। মিনতি ধর্ম্মাচরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিল। তার ধর্ম্মাচরণে যেমন নিষ্ঠা ছিল তেমনি কঠোর নির্ম্মম আত্মজিজ্ঞাসা ছিল। তাই সে তার ধর্ম্মাচরণে ত্রুটির অন্ত পাইল না। যতই সে ত্রুটি দেখিত ততই সংশোধনে যত্নবতী হইত। এমনি করিয়া সে সাধন-পথে দ্রুত অগ্রসর হইল।

তার একটা কথা প্রায় মনে হইত। তার জীবনের আদর্শ করিয়াছিল সে মীরাবাইকে। মীরাবাইয়ের মধ্যে সে সব চেয়ে বড় কথা দেখিতে পাইল,—তার পরিপূর্ণ গভীর প্রেম ও আত্মসমর্পণ! সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল যে তার নিজের ভিতর প্রেমের সে গভীরতা নাই। সে ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক অধ্যয়ন করিয়াছে—তার চেয়ে বেশী সে জানিয়াছে আপনার মনে চিন্তা করিয়া। তার কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব সমস্ত জগতের এ

বিপুল রহস্য চিন্তা করিলেই এত সহজ সরল হইয়া যাইত যে সে তাহাতে বিস্মিত হইত। খুব জটিল সব সমস্যা একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে তার কাছে আশ্চর্য্যরূপে সহজ হইয়া যাইত। এত সহজে সব দুরূহ গভীর তত্ত্ব তার কাছে পরিস্ফুট হইয়া যায় যে সে ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। তার মনে হইত স্বয়ং নারায়ণ তার চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সব সত্য তার চক্ষের সন্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন। তাই সে তার ধ্যানের সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিত। কিন্তু তবু তার মনে হইত যে তার বুদ্ধি যতই দৈবশক্তিতে আলোকিত হউক অন্তর তার সেই পরিমাণে প্রেমে সরস হয় না। তার ভগবৎ প্রেমের সে ঐকান্তিকতা, সে গভীর রসবাহুল্য নাই যাহাতে মীরাবাইর জীবন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল। সে কখনও ভগবানের সাক্ষাৎকার অনুভব করিতে পারে না—তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে পারে না। এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত। তার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম সজীব হইয়া জাগিয়া উঠে না এ কথা ভাবিয়া সে অন্তরে বড় দৈন্য অনুভব করিত।

সে এক দিন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে এক কীর্ত্তন রচনা করিয়া ফেলিল, এবং আপনি তাতে সুর দিয়া তোতারামের কাছে গাহিল। সে গাহিল,

(ওগো) সাগর ছানিয়া আনিয়াছি মণি,
এনেছি রতন উজাড়িয়া খনি,
রেখেছি পরাণে ভরিয়া।
স্বর্ণ অলঙ্কারে শোভে মরকত
হীরক মুকুতা তারকার মত,
আমার মন্দির ঘিরিয়া!

ওগো সকলি বিফল হ'ল
সব আয়োজন বিফল হইল,
আঁধারে ডুবিয়া গেল ;
আমার বিভব মহিমা রতন গরিমা
আঁধারে ডুবিয়া গেল ।
মণি-মালা শোভা অতি মনোলোভা
আঁধারে ডুবিয়া গেল ;
রতন ভূষণ মণিকাঞ্চন
গরিমা মরিয়া গেল,
(ওগো) অভিমানভরা গরব আমার
লাজে মরিয়া গেল ।
সকলি বিফল হল ।
ওগো সব সাজ মাঝে লাজ সার হ'ল
আঁধার রহিল হিয়া ;
কালিয়া পীরিতি প্রদীপের ভাতি
জ্বলেনি স্থধু বলিয়া ।

অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবেগভরে মিনতি গাহিয়া গেল, তোতারাম মুগ্ধ গদ্গদচিত্তে শুনিল এবং মাঝে মাঝে সঙ্গে ধূয়া ধরিতে লাগিল ।

গান শেষ হইলে তোতারাম মিনতির পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মাগো, তোমার প্রাণে যদি কালিয়ার পীরিতি না থাকে তবে সে জগতে কোথাও নাই ।"

মিনতি বলিল, "না বাবা সে নাই । যদি সে পীরিতি থাকতো তবে কি আমি এমন হ'তাম ? তবে কি সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় আমাকে ছুঁতে পারতো ? তবে কি লোকের কথা আমি গণ্য ক'রতাম ?" বলিয়া মিনতি অধীর হইয়া পড়িল । সে কেবলি কাঁদিতে লাগিল ।

তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

এ সব মালতীর আর সহ্য হইল না।

মিনতি যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে আসিল সেদিন মালতী তাকে সুচক্ষে দেখিতে পারে নাই। সে ছিল বিদ্যুতের স্নেহের দাসী, বিদ্যুতের স্থানে যে আর একজন আসিয়া জুড়িয়া বসিবে এ কথা তার মোটেই সহ্য হইতেছিল না, তাই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল। কিন্তু মিনতির ব্যবহার এবং তার দুর্ভাগ্য দুয়ে মিলিয়া তাহাকে মিনতির দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন দারুণ দুঃখে মিনতি অধীর, তখন মালতী মায়ের মত স্নেহ দিয়া তাহার সেবা করিয়াছিল, তার আহত হৃদয়ে নিরন্তর সেবা জোগাইয়াছিল।

তোতারাম যেদিন প্রথম আসিল সেদিন মালতী তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং এই যে খোকা সে বিষয়ে তার বিশেষ কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই সে তোতারামের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে দুঃখ করিয়া তোতারামকে বলিল "হাঁ খোকা বাবু, কি ছিলে তুমি, যত সব ভবঘুরের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কি হ'য়ে এসেছ? তোমার এ কি ব্যভার? দিনরাত ঘরের কোণায় চুপটি মেরে ব'সে থাকবে—এ কি বেটাছেলের মত কথা। আচ্ছা বাপু ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রতে হয় কর, কিন্তু বাইরে যাও, খেলাধূলা কর কাজ কর্ম্ম দেখ—আর অবসর সময় পুজা-অর্চ্চন কর। তা নয় দিনরাত ঘরের ভিতর ব'সে ঐ এক ঘ্যান্ ঘ্যান্—এতও ভাল লাগে বাপু!"

অন্য লোকের কাছেও সে দিনরাত এই অভিযোগ করিত। খোকা যে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে বসিয়াছে তাহাতে তার দুঃখের অন্ত ছিল না। সে বলিত, বাপ মিন্সে বিবাগী হ'য়ে পড়ে আছে, ওকে এখন দেখে

কে বল। এ বয়সে বাপের চোখ নইলে কখনও ছেলে মানুষ হয় ? যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

শেষ পর্য্যন্ত সে স্পষ্টভাবে সন্দেহ করিতে লাগিল যে এ খোকা নয়। হাজার হউক খোকাকে সে তো কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছে—সে খোকা কি কখনও এমনি হইতে পারে ? হাজার হ'লেও সে ছিল একটা মদ্দা ছেলে—এত মিনমিনে ঘ্যানঘেনে মেয়েমানুষ সে হইতে পারে না।

অতঃপর সে স্থির করিল যে এ ব্যক্তি দিলীপ কিছুতেই নয়। কোথাকার এক হাঘরের ছেলে এখানে এসে রাজার হালে আছে তাই আর নড়বার চড়বার নাম নেই। সে ভারি বিরক্ত হইয়া গেল। তোতারামের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তার যেটুকু সেবা করিতে হয় তাহাতে সে গরগর করিতে লাগিল, মিনতির উপর পর্য্যন্ত চটিয়া গেল—এবং আকারে ইঙ্গিতে সে নানাপ্রকারে কথাটা প্রকাশও করিতে লাগিল।

এক দিন মিনতি তাকে তোতারামের জন্য মাষ্টার বাবুর বাড়ী হইতে একটা বাতাবী নেবু আনিতে বলিয়াছিল। মাষ্টার বাবুর বাতাবী নেবু সে পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ। মালতীর প্রথমতঃ রাগ হইল যে তোতারামের জন্য এখন তাকে এত রাস্তা হাঁটিয়া সেই নেবু আনিতে হইবে। তার পর সে নেবু চাহিয়া আনিতে হইবে, কেন না মাষ্টারগিন্নী নেবু বেচেন না। সে বড় মানুষের বাড়ীর ঝি, কারও কাছে কিছু চাওয়াটা ভারী অপমানের কথা মনে করিত। এই চাওয়ার হীনতায় সে বড় কষ্ট বোধ করে, অথচ তাকে দিয়াই মিনতির বার বার এই কাজ করানই চাই।

গর্‌গর্‌ করিতে করিতে মালতী চলিয়া গেল। মাষ্টারগিন্নী নেবু দিলেন না, বলিলেন, আর নেবু নাই, এবং মালতী স্পষ্ট বুঝিল কথাটা মিথ্যা। তার আর অপমানের সীমা রহিল না। সে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে

বাড়ী ফিরিয়া মিনতির কাছে বলিল, "ওগো মা, দিলে না নেবু। যত সব ছোট লোকের কাছে তোমার হাত পাতাই চাই।"—বলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেল।

তার পর রমেনকে পাইয়া সে তার কাছে মনের যত বিষ খুব সুস্পষ্ট ঝাঁঝাল অনভিধানিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিল যে, "ওই হাঘরের বেটা কোথ্ থেকে এসে জুটেছে—খোকা তো এ সংসারে আগুন লাগিয়েই গেছে—এখন এই শতেক খোয়ারীর বেটা একে পাঁশ বানিয়ে তবে ছাড়বে।"

রমেন হাঁ করিয়া বলিল, "কি বলছো তুমি মালতী দি? চুপ, চুপ!"

"কেন গো, কিসের ভয়ে চুপ করবো। মালতী কাউকে ডরায় না"—

"শুনতে পেলে দিলীপ"—

"মুখে আগুন দিলীপের, ও মিন্সে যদি খোকা হয় তবে আমার"—

"আরে চুপ চুপ, মামীমা শুনলে অনর্থ ক'রবে—ও কথাও নয়।"

অনেক করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া রমেন তাহাকে শান্ত করিল। রমেন নিজেও এখন মালতীর সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তোতারাম যে দিলীপ নয় সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহই নাই। তবু মিনতির সামনে এ কথার সামান্য আভাস মাত্র করিতেও তার সাহস নাই। বাড়ীর সবাই প্রায় স্থির করিতেছিল যে তোতারাম জাল ও ভণ্ড, উহাকে লইয়া গৃহিণী অনর্থক এতটা মাতামাতি করিতেছেন। কিন্তু মিনতি তাকে লইয়া এতটা মত্ত এবং তার প্রতি সেবা যত্নে কারও সামান্য একটু ত্রুটি দেখিলে সে এত ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে যে সকলে চুপ করিয়া যায়, আর অন্তরালে যাইয়া ফিসফিস করে।

মালতীকে যখন রমেন বুঝাইল তখন সে বেশ বুঝিয়া গেল। ইহার পর যখন তোতারামকে দেখিয়া তার মুখটা বিষাইয়া উঠিত এবং তার যত্ন আত্তি

দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠিত তখনই সে চেষ্টা করিয়া চাপিয়া যাইত। মনে মনে বলিত, "আমার কি বাপু! যাদের ঘর সংসার তারাই যদি সব ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তবে আমি কেন ভেবে মরতে যাই। সে আঁটকুড়ে মিন্সে যদি মাগ ছেড়ে সংসার ছেড়ে হৈ হৈ করে রাজ্যি ঘুরে বেড়াতে পারে—পারুক।" তবু মাঝে মাঝে অমরাবতীতে এই দৈত্যের তাণ্ডব দেখিয়া সে মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া উঠিত। চোখা চোখা কথা তার জিভের ডগায় আসিয়া ফিরিয়া যাইত।

একটা কথা তার মনে হইয়া মনটার ভিতর খচ্ খচ্ করিয়া উঠিত। মালতী সতীসাধ্বী বলিয়া লোকের কাছেও কোনও দিন জাঁক করিত না, এবং তার যে ছেলেটি পোনের বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে, তার জন্ম যে মালতী বিধবা হওয়ার তিন বৎসর পর হইয়াছিল তাহা সকলেই জানিত—সে বিষয়ে মালতীরও খুব বেশী লজ্জা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী—বিশেষ বিদ্যুতের স্থলবর্ত্তী যে—সে যে বিপথ-গামিনী হইবে এ কথা ভাবিতে তার গা' কাঁটা দিয়া উঠিত। অথচ রকম সকম দেখিয়া তার এই সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকদিন সে গোপনে তোতারাম ও মিনতির উপর নজর রাখিয়াছে, কিছুই তার নজরে পড়ে নাই। তা ছাড়া ছেলেটা মিনতিকে 'মা' বলে, মিনতিও তাকে 'বাবা' বলে। এটা যে খুব একটা বড় অন্তরায় তাহা মালতীর মনে হইল না, তবু কথাটায় ধোঁকা লাগে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ভাবের আবেশে যখন মালতী তন্ময় হইয়া তোতারামের দিকে যায় আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তোতারাম তার দিকে চাহিয়া থাকে তখন তার চক্ষে সে দৃষ্টিটা ভাল ঠেকে না। তার মনে হইল যে যদিও এখন ইহাদের ভিতর দূষণীয় কিছু সে লক্ষ্য করে নাই, তবু তেমন একটা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর হয় তো হইতে বেশী দেরীও নাই।

এই কথা ভাবিয়া সে ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এমন একটা কিছু ঘটিয়া গেলে যে একটা ভীষণ কলঙ্ক হইবে এবং তাহার মহা-সম্মানিত মুনিব গৃহিণীর নাম লোকের মুখে মুখে একটা গ্লানির সঙ্গে জড়িত হইয়া যাইবে—এ কথা ভাবিতে সে ক্ষেপিয়া উঠিত। এখনি যে বাহিরে এসব কথা লইয়া অনেক কাণাঘুষা হইতেছে—মিনতির সন্ন্যাসীকে লইয়া যার যা খুসী বলিতেছে—তাহা এ পর্য্যন্ত মালতীর শ্রুতিগোচর হয় নাই। কিন্তু সত্য সত্যই যদি একটা কিছু ঘটে তবে যে লোকের মুখ ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না তাহাতে তার সন্দেহ ছিল না।

অনেকদিন দারুণ অশান্তিতে কাটাইয়া মালতী একদিন গঙ্গার ঘাটে এমনি একটা কথাই শুনিয়া ফেলিল। একটি রসিকা অপর এক যুবতীকে তামাসা করিয়া বলিতেছিলেন, "এখন তুই আর কি করবি—ডিপুটিগিন্নীর মত একটা সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী জোগাড় কর! এ তো এখন রেওয়াজ হয়ে গেছে।"

মালতীকে বক্ত্রী দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মালতী কথাটা শুনিতে পাইল। সে রাগে ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু অনেক কষ্টে কোন্দলের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া বাড়ী ফিরিল। কেন না সে জানিত যে কথাটা যত বড় মিথ্যাই হোক ইহা লইয়া সে যদি একটা সোর গোল করিয়া বসে তবে ইহা দুদিনের মধ্যে বাজারময় রটিয়া যাইবে।

মনটা রাগ ও কান্নায় বোঝাই করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। মিনতিকে দেখিয়া তার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! কালামুখী মিছামিছি কর্ত্তার পর্ব্বত-প্রমাণ মান ও প্রতিষ্ঠা ভাসাইয়া দিতেছে একটা অপদার্থ হাঘরের বেটার জন্য—ইহাতে রাগ হয় না? কিন্তু এত রাজ্যের চোখাচোখা কথা তার মুখের কাছে আসিয়া জড় হইল যে কিছুই বলিতে পারিল না। অসুখ বলিয়া সে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা বেলায় উঠিয়া সে উপরের ঘর সারিতে গেল। দেখিল মিনতি আপনি ঘর সারিয়া শেষ করিয়াছে এবং এখন তোতারামের কাছে বসিয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে! তার গা জ্বলিয়া উঠিল। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া কেবলি ফুলিতে লাগিল। "'পীরিতি পীরিতি'। শতেক খোয়ারীর বেটার কথা শোন। তোর মুখে ঝাড়ু মেরে আজ তোর পীরিত না ছুটিয়েছি তো আমার নাম মালতী নয়।"

কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে অগ্রসর হইল। সে শুনিল মিনতি বলিতেছে, "তার লোক লজ্জার বড় ভয়"। মনে মনে সে বলিল "আর ভয় কি ঠাকুরুণ? লোকলজ্জার আর বাকী আছে কি?"

ব্যাঘ্রীর মত হিংস্রভাবে সে গিয়া দুজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রথমে তোতারামকে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিল এবং তার পর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে মিনতিকে বলিল, "হাঁ মা তুমি ভালমানষের মেয়ে, তোমার এ কেমন রীত। আপনার দিকে না চাইতে মন চায় তো সোয়ামীর মানের দিক তো চাইতে হয়। বাবুর আমার এমন সম্মান, এই একটা হাড় হাবাতে ডেঁপো ছোকরার জন্য তুমি তার নাম হাসাবে! ছি! ছি! মুখে আগুন তোমার পীরিতের—ঝাঁটা মার পীরিতির মুখে"—

"মালতী! বেরো ঘর থেকে—"

তীব্রকণ্ঠে এ পরুষ তিরস্কার শুনিয়া মালতী স্তব্ধ ও চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল আহত সিংহীর মত মিনতি চক্ষু লাল করিয়া তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তার সমস্ত মুখ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপালের সব কটি শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে। ওষ্ঠাধর অকথিত রোষে ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে—দৃপ্ত তেজস্বিনী সে মূর্ত্তি দেখিয়া মালতী ভয় পাইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

"বেরো এক্ষুণি"—আবার মিনতি গর্জ্জিয়া উঠিল—মালতীর সর্ব্বাঙ্গ

সহসা ঝাঁকিয়া উঠিল, তার মনে হইল এখনই বুঝি মিনতি তাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ মিনতির মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে দ্বারপথে অগ্রসর হইল।

মিনতি তার পিছু পিছু গিয়া বলিল, "সোজা বেরিয়ে যা' সদর দরজা দিয়ে"—

তার পর দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল "মালতীর যা জিনিষ পত্র আছে, সব নিয়ে রাস্তায় ফেলে দাও ; আর রমেন বাবুকে ব'লে দাও ওর হিসাব চুকিয়ে দিতে।" তার পর হতবুদ্ধি মালতীর দিকে চাহিয়া আবার বলিল "বেরো, বেরো, বাড়ী থেকে।"

মালতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল, ক্ষমা ভিক্ষা পর্য্যন্ত চাহিতে তার সাহস হইল না। দুয়ার গোড়ায় মিনতি দাঁড়াইয়া রহিল। মালতীর জিনিষপত্র সব রাস্তায় পৌঁছান হইলে, সে দুয়ার বন্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে গেল। নিজের শুইবার ঘরে খিল দিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ তার মুখ চোখ শুষ্ক কঠোর হইয়া রহিল—রক্তবর্ণ চক্ষু কড়িকাঠের উপর নিরর্থক রুষ্ট দৃষ্টিতে আবদ্ধ রহিল, সমস্ত অন্তর অসাড় জড়ের মত হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর বান ডাকিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে যখন মিনতির নিদ্রাভঙ্গ হইল,তখন সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। একটা গভীর বিষাদ তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু কেন এ বিষাদ, তাহা তার চট্ করিয়া মনে হইল না।

দুয়ার খুলিয়া সে অভ্যাসমত মালতীকে ডাকিতে অগ্রসর হইল। তখন হঠাৎ কাল সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা তার মনে হইল—নিদারুণ লজ্জায় তার সমস্ত মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে সঙ্কুচিত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

কি লজ্জা! কি লজ্জা! এ কথা তো আর কিছু চাপা থাকিবে না। মালতীই হয় তো আজ সমস্ত সহরময় মিনতির কুৎসা রটাইয়া বেড়াইবে। এতক্ষণ হয় তো সহরের কাহারও সে কথা জানিতে বাকী নাই। লোকের কাছে মিনতি এখন মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

এত দিন মিনতি একাগ্রতার সহিত তোতারামকে ঘেরিয়া ছিল, সে তাহাতে পরিপূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া ছিল। তাদের সম্বন্ধের কথা সে না ভাবিয়াছে তাহা নয়; কিন্তু ভাবিতে তার অন্তর মাতৃত্বের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে এত মত্ততার সহিত মাতৃত্বের গর্ব্ব চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত ছিল যে, তার ব্যবহারের যে এমনি একটা কদর্থ হইতে পারে সে কথা তার মনেই হয় নাই।

মালতী যখন এমনি করিয়া কথাটা মনে করাইয়া দিয়া গেল, তখন ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হইল যে, এ কথা লোকে বলিবেই তো। মিনতির বয়স সবে আটাশ, তাকে দেখিতে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। তোতারামের বয়স ২১।২২ আর সে সুগঠিতদেহ, বলিষ্ঠ,

সুপুরুষ। তার সঙ্গে মিনতির এতটা মাখামাখি মেশামেশিতে লোকে কুকথা বলিবে না কেন? কত দিন তো তারা একাকী নির্জ্জনে থাকিয়াছে;—যখন সমস্ত বাড়ীর লোক নিদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখনও মিনতি বসিয়া তোতারামের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে—এসব সত্বেও সে কেমন করিয়া লোককে বিশ্বাস করাইবে যে সে নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। কেহ তো বিশ্বাস করিবে না—তার স্বামীও তো বিশ্বাস করিবেন না। হায়, তবে মিনতির কি উপায় হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে হাঁপাইয়া উঠিল। কোনও দিক দিয়া সে কোনও কূলের আভাস পাইল না, অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিল—দারুণ হতাশায় অবসন্ন হইয়া সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

একটা দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, খোকাবাবু মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান।

কি লজ্জা! কাল যাহা হইয়া গিয়াছে, তার পর সে আর তোতারামের কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? তার মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

সে বলিল, "বলগে আমার শরীর ভাল নেই, আমি এর পরে যাব'খন।"

ঝি বলিল, "তিনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন, এখনি যাবেন, তাই বিদায় হ'তে চান।"

"চলে যাবে" কথাটায় মিনতির হৃদয়ের ভিতর দিয়া একটা বিদ্যুতের শিখা জ্বলিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "চলে যাবে কিরে?"

"হাঁ মা, তিনি ব'লছেন তাঁর চলে যেতেই হ'বে, একবার গুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এখন না ক'রলেই নয়।"

মিনতি তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিল। চলে যাবে? সে হইতেই পারে

না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে আবার হতাশ হইয়া পড়িল। কেন সে যাইবে না? এমন মিথ্যা কলঙ্ক, এমন অপমানের পর সে যাইবে না কেন? মিনতিই বা কি বলিয়া তাহাকে থাকিতে বলিবে? ইহার পর যদি সে এখানে থাকে, তবে তো কলঙ্ক আরও সহস্রমুখে ছড়াইয়া পড়িবে।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "ডাক তাকে এখানে।"

তোতারাম আসিতে আসিতে, মিনতি তাকে কি বলিবে তার মুশাবিদা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তোতারাম ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মিনতি কেবল নিদারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল, তার মুখে একটি কথাও ফুটিল না। কাল যাহা হইয়া গিয়াছে, তাতে যে তোতারামের সামনে মুখ দেখাইতেই তার লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছে।

তোতারামও গম্ভীর হইয়া নত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর তোতারাম বলিল, "বিদায় নিতে এলাম মা। আর এখানে আমার থাকা উচিত নয়।"—বলিয়া সে নীরবে মিনতির পদধূলি লইল।

মিনতি অনেকবার মুখ তুলি তুলি করিয়াও তুলিতে পারিল না, কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। শেষে যখন তোতারাম একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, তখন সে প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়া বলিল, "যেয়ো না, থাম।"

তোতারাম থামিল। মিনতি মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কাল যে কথা হ'য়ে গেছে, তার পর তোমাকে আমার কাছে থাকতে বলে আমি তোমাকে অপমান ক'রবো না। কিন্তু এত দিন তোমাকে রেখে আজ যদি আমি তোমাকে এ বাড়ী হ'তে যেতে দিই, তবে—তবে আমি প্রাণে বাঁচবো না। তুমি যেয়ো না! তোমার ধন দৌলত নিয়ে তুমি তোমার পূর্ণাধিকারের এখানে থাক—আমিই যাই। এ বাড়ী

তোমারই। আমার এতে কোন অধিকারই ছিল না। কোনও অধিকার পাবার অবসরও হয় নি—আমাকে এ অপরাধের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তুমি যেতে পারবে না। আমারই যেতে হবে। আমার প্রতি যদি তোমার এতটুকুও দয়া থাকে, যদি স্ত্রীহত্যায় তোমার এতটুকুও ভয় থাকে, তবে তুমি যেয়ো না।”

এ কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঝি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিল, “মা, বাবু!” আর সঙ্গে সঙ্গে শিশির আসিয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইল।

মিনতির সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁকিয়া উঠিল। শিশিরের চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। সে লম্বা দাড়ী রাখিয়াছে, চুল দাড়ী পাকিয়া গিয়াছে, মুখ শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে। কিন্তু তবু আজ আট বছর পরে মিনতির তাকে চিনিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। সে চমকিত স্তব্ধ হইয়া ভূতাবিষ্টের মত এক মুহূর্ত্ত শিশিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর তার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া শিশিরের পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল।

শিশির তিন পা পিছাইয়া গেল।

শিশির বাহির হইতেই মিনতির শেষ কথা কয়টা শুনিয়াছিল, “আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র দয়া থাকে, হদি স্ত্রী-হত্যার তোমার এতটুকুও ভয় থাকে, তবে তুমি যেয়ো না।”

শুনিয়া সে ভীষণ একটা আতঙ্ক লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। সেখানে দেখিল মিনতির সম্মুখে এক সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী—আর মিনতি স্তব্ধ, ভীত, চমকিত।

শিশিরও ভয়ানক স্তব্ধ হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সে কোনও কথা কহিতে পারিল না, কোনও সংবিৎ তার রহিল না।

যখন মিনতি তাকে প্রণাম করিতে আসিল, তখন সে সর্পভীত পথিকের মত তার স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

তার পর সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিলীপ!"

পশ্চাৎ হইতে ইংরাজী পরিচ্ছদধারী এক সুন্দর যুবক আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

অবসন্ন হইয়া যুবকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শিশির এলাইয়া পড়িল। যুবক তাহার বলিষ্ঠ বাহুতে শিশিরকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল।

অনেক দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া শিশির বোম্বাই আসিয়া উঠিয়াছিল।

বোম্বাই স্থানটা তার বরাবরই খুব ভাল লাগিত। এবার আসিয়া সে এখানে একদম জমিয়া গেল। সমুদ্রতীরে বহু দূরে বেড়াইত। সম্মুখে বীচি-বিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, চাহিয়া চাহিয়া তার আশ মিটিত না। সাগরের বিক্ষুব্ধ বক্ষের ভিতর সে নিজের অশান্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইত।

মানুষ জন্মিয়াছিল পৌত্তলিক হইয়া। তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সকল জিনিষের ভিতর মানবের মত প্রাণের আরোপ করা। তাই আদিম মানবের কাছে, আকাশ বাতাস মেঘ পর্ব্বত গাছ পাতা ফুল সবই সজীব আত্মাময় হইয়া প্রতিভাত হইত। আজ মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে—পাহাড় তার কাছে মৃত প্রস্তর, মেঘ শুধু বারিবিন্দু, গ্রহগুলি মরা পৃথিবী, বিদ্যুৎ তার পাঙ্খা-কুলী। প্রাচীন কালের মানবের চক্ষে বিশ্বের সব জিনিষের উপর যে একটা অপূর্ব্ব কাব্যের ছাপ থাকিত, তাহা খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্ন হাড় ক'খানা গিজ্ গিজ্ করিতেছে। তাই সেকালের মানুষ যেখানে গাছ দেখিলেই তার ভিতরকার দেব বা দৈত্যকে গড় হইয়া প্রণাম করিত, সেখানে আমরা সে গাছের ফল খাইবার যোগ্য কি না, তার কাঠ জ্বালান হইবে, না আসবাবের জন্য ব্যবহার করা যায়, তার হিসাব করিতে বসি। জ্ঞানের তীব্র আলোকের সামনে দেবতা ও দানব পলায়ন করিয়া শিশুর মনোরাজ্য সঙ্কীর্ণ আশ্রয় লাভ করিয়াছে!

কিন্তু আজও দুই একটি জিনিষ এমন আছে, যার সামনে দাঁড়াইয়া মানুষের এই প্রচণ্ড বুদ্ধি হার মানিয়া পলায়ন করে, আপনার সম্পুর্ণ

অজ্ঞাতসারে সে মানবের সেই শৈশবকালে ফিরিয়া যায়। বিস্তীর্ণ অপার সাগরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে তার তরঙ্গ-বিক্ষোভের ভিতর একটা বিশাল আত্মার স্পর্শ অনুভব না করে, এমন বস্তুতান্ত্রিক এই বিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ।

শিশির ধর্ম্মাচার যথেষ্ট করিত, কিন্তু দেব-দৈত্যে যে খুব বিশ্বাস করিত এমন নয়। সে মনের তুলাটা খুব নাড়িয়া দেখিত না, তাই তার বিশ্বাস ও আচারের ভিতর পরস্পর-বিরুদ্ধ বহু ভাব অনায়াসে পাশাপাশি বাস করিত। ইংরাজী খানা সে খায় না, কিন্তু খাওয়ায় কোনও গুরুতর দোষও দেখে না। মাটীর শিব গড়িয়া সে রোজ পূজা করে; অথচ স্বয়ং শিবকেও স্থলবিশেষে সে অনায়াসে অস্বীকার করে। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই সে প্রণাম করে, অথচ তাদের ক্লাবে বসিয়া এই licensed vagrancyর বিরুদ্ধে অজস্র বক্তৃতা করে। এক কথায়, শিশির এক দিকে সম্পূর্ণ আধুনিক, এবং আর এক দিকে সে সম্পূর্ণ সেকেলে। ইট দেবতা, কাঠ দেবতা, ঘটি দেবতা, বাটী দেবতা, গাছ দেবতা, পাহাড় দেবতা সম্বন্ধে সে উপহাস করিতে ছাড়ে না; অথচ বাড়ীতে ঘেঁটুপূজা হইলেও সে তার আচার নিয়ম ষোল আনা মানিয়া চলে।

সমুদ্রের সামনে বসিয়া শিশিরের মনে যে ভাবের উদয় হইত, সেটা মোটেই আধুনিক নয়, সে সেই শাশ্বত পুরাতন ভাব। সমুদ্র তার কাছে ছিল সজীব—একটা বিরাট বৃহৎ আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সমুদ্রবক্ষের তাণ্ডব নর্ত্তনে এবং তার প্রশান্ত স্নিগ্ধ তরঙ্গের ভিতর সর্ব্বত্রই সে দেখিত, একটা বিরাট প্রাণের অনন্ত অশ্রান্ত চঞ্চলতার উচ্ছ্বাস। তটের দিকে চাহিয়া সে দেখিত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাকে আক্রমণ করিতেছে—বহু দূর পর্য্যন্ত তাকে অভিভূত করিয়া সে বীচি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদে পরিণত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে—বিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত জলরাশি ফিরিয়া

যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে,—নূতন উৎসাহে, নূতন আক্ষোভ লইয়া বিরাট, শক্তিমান হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই পরিণতি ভাল করিতেছে। দিবারাত্রি, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ এই অশ্রান্ত চেষ্টা চলিয়াছে। দূরে চাহিয়া শিশির দেখিত সমুদ্র প্রশান্ত—কে বলিবে তার ভিভর কোনও আক্ষেপ আছে—তার জীবনের প্রান্তদেশে তার এমন অশ্রান্ত চঞ্চলতা—সীমাতটের বিরুদ্ধে সে এমন এক শাশ্বত সংগ্রাম চালাইতেছে!

এ আক্ষোভ, এ জ্বালা, এ অশান্তি সাগরের, এ কি কখনও মিটিবে না! শিশিরের অন্তরেও তো এমনি অপরিশ্রান্ত বেদনা অবিরত তার বুকের ভিতর হানা দিতেছে, আঘাতের পর আঘাত পাইয়া সে বিক্ষুব্ধ হইতেছে—শান্তি কি তার মিলিবে না? এক একবার শিশির এই ভাবিয়া শান্তি পাইত যে তার মৃত্যু হইবে—সাগরের মৃত্যু নাই। মরণে তার সকল জ্বালা এক দিন জুড়াইবে। কিন্তু জুড়াইবে কি? মনে পড়িল Hamletএর কথা,

To die, to sleep, perhaps to dream—
Aye there's the rub.

মরণেই যে সব শেষ, এ কথা কে বলিতে পারে! মরণে এ জীবনের শ্রান্তি শেষ করিলে, কে জানে—তখনি আবার নূতন উদ্বেগ, নূতন বেদনা, নূতন ক্লান্তিময় এক অভিনব জীবনের আরম্ভ হইবে না? আমাদের জন্মগত সংস্কার এই যে—আত্মা অবিনাশী; দেহ হইতে দেহান্তরে ইহা বিচরণ করে, যাবৎ ইহার ভোগের শান্তি না হয়। তাই যদি হয়, তার আত্মার এ দুর্ভোগ কত জীবনে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে কে বলিতে পারে। সেও কি এই সাগরের মত অশ্রান্ত অক্লান্ত হইয়া অনাদি অনন্তকাল বিক্ষুব্ধ হইতে থাকিবে?

ভাবিতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত—কিন্তু সাগরের এই অনন্ত বিশাল সীমাশূন্য বিক্ষোভের সামনে দাঁড়াইয়া এ কথা চিন্তা করিতে তার অন্তরের জ্বালা অনেকটা নিবৃত্ত হইত। সাগরের এ বিরাট বিস্তীর্ণ যাতনা সে আপনার হৃদয় দিয়া অনুভব করিত—তার পাশে তার ক্ষুদ্র বেদনা সহনীয় বোধ হইত।

এক দিন সে এপোলো বন্দরে একটা বেঞ্চে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। তার চক্ষের সম্মুখে বন্দরের জাহাজের ভিড়ের দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। একখানা জাহাজ অল্পক্ষণ হইল বন্দরে ভিড়িয়াছে। সোঁ সোঁ ভস্ ভস্ ঘড়্ ঘড়্ প্রভৃতি বিচিত্র শব্দসংযোগে এই বিরাট জলদৈত্য তীরে লংলগ্ন হইয়া আপনার উদর হইতে জনসমুদ্র উদ্গার করিবার আয়োজন করিতেছে। সূর্য্য ডুবিয়া গেল—পশ্চিম গগন তখনও বিচিত্র আলোকে উদ্ভাসিত—সাগরের সীমায় জলরাশি তখনও একটু আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তখন সেই দানবের বিকট কোলাহলে শিশিরের দৃষ্টি সেই জাহাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন সিঁড়ি নামান হইয়াছে—যাত্রিগণ দলে দলে ভিড় করিয়া নামিতেছে।

একে একে সব যাত্রী নামিয়া গেল। একটি তরুণ ইংরাজ সেই সিঁড়ির কারে দাঁড়াইয়া ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিতেছিল। শেষে ক্যাপ্টেন হাত বাড়াইয়া যুবকের সঙ্গে খুব আন্তরিকতার সহিত করমর্দ্দন করিল। যুবক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য কয়েক জন নাবিক, যারা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে হাত দিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "Cheerio ! see you again !" তারা সবাই বলিল "Cheerio".

শিশির সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দেখিতে লাগিল।

যুবক শিশিরের পাশ দিয়া গেল—নিকটে তার মুখের দিকে চাহিয়া

শিশিরের মনটা হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল! সে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল। যুবকের দাড়ী গোঁফ কামান, সুন্দর ছাঁট-কাটযুক্ত একটা ছাই রঙ্গের পোষাক পরা, মাথায়ও প্রায় সেই রঙ্গের ভেলুর হ্যাট, গলায় খুব চটকদার টাই। জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে—আসল ইংরাজের বাচ্ছা! শিশির মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাকে, দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করিল।

যুবকের হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল। শিশির সেদিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার উপর নাম লেখা আছে, Chas. Dayton. শিশির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সাগরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

সেই দিন Postal Fxpressএ শিশির এলাহাবাদে যাত্রা করিল। সে যে কামরায় ছিল, সেই কামরাতে উঠিয়া সে দেখিল, তাতে একটি ইংরাজ আর একটি পাঞ্জাবী তার সহযাত্রী। তারা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই; কিন্তু তাদের নাম লেখা আছে। কৌতূহলভরে নামগুলি পড়িতে পড়িতে সে দেখিল যে, তাদের মধ্যে একজন C. Dayton.

দেখিতে দেখিতে ডেটন আসিয়া জুটিল। সে জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া তড়বড় করিয়া নামিয়া গেল, ফর্ ফর্ করিয়া প্লাটফরমে ঘুরিতে লাগিল এবং তার জাহাজের সহযাত্রী পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে খুব গল্প-গুজব, হাসি তামাসা করিতে লাগিল। দেখা গেল, ছোকরা খুব জনপ্রিয় ও মিশুক। বিশেষ মেয়েরা তার উপর ভারী অনুরক্ত। তার চঞ্চলতা, সজীবতা এবং রহস্যপ্রিয়তা অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে অনেকের চক্ষেই বিশিষ্ট করিয়া তুলিল।

যে পাঞ্জাবী ছোকরা শিশিরের সহযাত্রী ছিল, তার নাম কুন্দনলাল। সেও বিলাত হইতে আসিতেছে; এবং দেখা গেল যে, তার সঙ্গেও ডেটনের বেশ আলাপ আছে। অনেকক্ষণ তারা গল্পগুজব হাসি তামাসা করিল।

তার পর ডেটন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, I say, Lall, I'll give you the surprise of your life.

কুন্দনলাল বলিল, "কি রকম ?"

ডেটন বলিল, "আমি যদি এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাঙ্গালায় কথা বলতে পারি, তবে তুমি আমাকে কি দেবে ?"

অবিশ্বাসের ভরে কুন্দনলাল বলিল "No !"

ডেটন বলিল, "সত্যি আমি পারি ।"

কুন্দনলাল বলিল, "হবে, তুমি কোথাও ভাষাটা শিখে থাকবে ।"

ডেটন। কিন্তু কেমন ক'রে পারবো বল ? আজ আট বচ্ছর হ'ল আমি জাহাজে কাজ ক'রছি—এ আট বচ্ছর ইয়োরোপ ও আমেরিকার মধ্যেই ঘোরা-ফেরা ক'রেছি। কোনও দিন ভারতে আসি নি। ভেবে দেখ, তবে কেমন ক'রে শিখলাম। বলতে পার ?

কুন্দনলাল হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয় আমি ব'লতে পারি। জাহাজে বোধ হয় তোমার একটী বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আর তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলে ।"

"সে ধার দিয়েও নয় ! ভালবাসাটা আমার ধাতে নেই ।"

"তোমার রকম সকম দেখে তো তা মনে হয় না। তোমাকে মেয়ে মহলে বেশ পশার জমাতে দেখতে পাই ।"

"ও ! সে আলাদা কথা। মেয়েগুলোকে নাচাতে বেশ। তারা এত বেকুব—তাদের বোকা বানাতে কিছুই লাগে না। দুটো মিষ্টি কথা, দুটো হাসি তামাসা—বস্ তারা অমনি গ'লে যায় ।"

"তুমি তো ভয়ানক লোক—a regular Bluebeard র'স, সব মেয়েদের কাছে এবার আমি তোমার নামে লাগাচ্ছি ।"

Oh don't please! আমি বরং তোমাকে এক বাক্স টফি কি সিগারেট ঘুস দেব।"

"আচ্ছা, ঘুস স্বীকার করলাম। কিন্তু রহস্যটা কি তাহ'লে? কেমন ক'রে তুমি শিখলে?"

"রহস্যটা ভারী গভীর—নিদারুণ গোপন কথা! কিন্তু অত্যন্ত গোপন কথা। কথাটা এই যে আমি আসলে বাঙ্গালী!"

শিশির শুইয়া পড়িয়াছিল, এ কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল।

কুন্দনলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সত্যি!"

Gods Own truth, man!" বলিয়া যুবক বলিল, "তের বচ্ছর বয়সে আমি হঠাৎ বাবার উপর রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। যখন ক'লকাতায় এলাম, তখন সম্বল ছিল মাত্র গোটা চল্লিশেক টাকা। ক'লকাতায় এসে আমার খেয়াল হ'ল ভারতবর্ষ ছেড়ে যাব। খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে জাহাজে ঘুরে কয়েক দিন চাকরীর সন্ধান ক'রলাম। জুটলো না। তার পর চাঁদনী থেকে এক ইংরাজী পোষাক কিনে নাম ভাঁড়িয়ে চার্লস ডেটন হ'লাম। ইংরাজীটা বেশ ভাল বলতে পারতাম —ফিরিঙ্গী ব'লে বেশ চ'লে গেলাম। তার পর কিছু চেষ্টা চরিত্র ক'রে Boy হয়ে জাহাজে চাকরী পেলাম।

"সে-জাহাজের সেকেণ্ড মেট লোকটা বেশ ভালমানুষ ছিল। Bay of Bengalএ জাহাজ প'ড়তেই আমার যা' sea sickness হ'ল, তা ব'লবার নয়। আমি একরকম মড়ার মত পড়ে কেবল বমি ক'রতে লাগলাম। এই মেট লোকটা তখন আমাকে শুশ্রূষা ক'রে খাড়া করালে। তার পর বিলেত গিয়ে আমি অনেক কাণ্ডকারখানা ক'রে শেষে পাকা চাকরী পেলাম। এইবারে আমি সেকেণ্ড মেটের সার্টিফিকেট পেয়েছি আর কয়েক বৎসর চাকরী ক'রলেই হয়তো ক্যাপ্টেন হতে পারবো।"

কুন্দনলাল। বাঃ তুমি ওস্তাদ ছেলে। বাহাদুর ছেলে। তা তের বচ্ছর বয়সে তুমি দেশ ছেড়ে গিয়েছ! এত দিন তোমার দেশের জন্য মন কেমন করে নি ?”

“প্রথম কিছুদিন ক'রেছিল। তার পর বিশেষ কিছু হয় নি। আমি একেবারে কাজে উন্মত্ত হ'য়েছিলাম। এ কত বড় একটা adventure বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে! এ জীবনটা আমার ভারী ভাল লাগতো। তা' ছাড়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সে—কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকতে হ'ত। ভাববার বড় সময় ছিল না। তা ছাড়া জাহাজের সে life ভারী মজার। Sailorদের মত ফূর্ত্তিবাজ লোক কম আছে! কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল মনটায় ভারী অশান্তি বোধ হচ্ছিল।”

“কেন ?”

“যাবার সময় আমি বাবার বাক্স আমার একটা চাবী দিয়ে খুলে পঞ্চাশটা টাকা বের ক'রে নিয়েছিলাম। লিখে গিয়েছিলাম যে এক দিন এ টাকা শোধ ক'রবো। গেল বারে লণ্ডনে ফিরে এসে আমি টমাস কুককে দিয়ে সে টাকা বাবাকে ফিরে পাঠিয়েছিলাম। এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে জানলাম যে, সে টাকা বাবা draw করেন নি, আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। শুনে মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। কারণ যদিও তাঁর উপর রাগ ক'রেই চলে গিয়েছিলাম, তবু বাবা আমাকে ভয়ানক ভালবাসতেন, আর আমিও তাঁকে বরাবরই খুব ভালবাসতাম। মনে হ'ল আমিই হয়তো, বাবার মৃত্যুর কারণ হ'য়েছি। মন ভারি খারাপ হল, তাই ছুটি নিয়ে চলে' এলাম একবার বাবার খোঁজ কর'তে।”

শিশির শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তার মনের ভিতর ঝড় বহিতেছিল। দিলীপকে এতদিন পর সম্মুখে দেখিয়া একটা প্রবল আনন্দ

তার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিল। এ কয় বৎসরে দিলীপের স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তি অপরূপ সৌষ্ঠবে ভরিয়া উঠিয়াছিল—তার সুগঠিত পৌরুষভরা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শিশিরের অন্তর গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল। তার পর তার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া তার আনন্দ হইল—এই তো পৌরুষ, এই মনুষ্যত্ব! এমন ছেলের বাপ হওয়া কি সহজ সৌভাগ্যের কথা! তবু মনের ভিতর দারুণ অভিমান গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। ছেলে যে তার বুকভরা স্নেহের এমন নিদারুণ অপমান করিয়া গিয়াছে, এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। তাই সে মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু দিলীপ যখন বলিল, "বাবা আমাকে ভালবাসতেন—আর আমিও তাঁকে বরাবরই খুব ভালবাসতাম।" আর তার পর তার মৃত্যুর আশঙ্কার কথা বলিয়া সে যখন তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিল, তখন শিশিরের সব অভিমান ভাসিয়া গেল। সেও মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিল। তার বুকটা এমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, চট্ করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

দিলীপ তখন তার পিতৃগৃহ ত্যাগের কথা, তার পিতার স্নেহের নানা নিদর্শনের কথা কুন্দনলালকে বলিয়া গেল। তার গলাটা ভয়ানক ভারী হইয়া উঠিল।

শেষে শিশির কতকটা আত্মস্থ হইয়া বলিল, "আমি তোমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে বাধ্য হ'চ্ছি—ক্ষমা করো। কিন্তু মিঃ ডেটন, তোমার পক্ষে কি এটা খুব নীচ কাজ হয়নি—পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তোমার বাপের ঋণ শোধের চেষ্টা? সে বেচারা হয় তো তোমাকে হারিয়ে তার নিজের জীবনটাই নষ্ট ক'রেছে।"

ডেটন একটু চমকিত হইয়া শিশিরের দিকে চাহিল। তার পর বলিল, "হাঁ, এখন মনে হ'চ্ছে বটে—কাজটা কতকটা নীচাশয়ের মতই হ'য়েছিল।

হয় তো ও-পঞ্চাশটা টাকার চেয়ে বাবা আমার একটা খবর, একটা ভালবাসার কথার জন্যই বেশী লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তখন তেমন ভাবিনি। বরং ভেবেছিলাম যে, এটা আমার একটা honourable obligation."

শিশির বলিল, "তুমি কি তোমার বাবাকে এখন চিন্‌তে পারবে দিলীপ ?" তার কণ্ঠ অশ্রুতে ভরিয়াছিল।

দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইল—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই পক্বকেশ শ্মশ্রুবহুল মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "আপনি, আপনি কি—" শিশির দুই বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমি তোমার বাবা।"—

দিলীপের মুখ একবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একবার হাত ছুঁড়িয়া বলিল, "Oh joy !" তার পর শিশিরের পায় পড়িয়া বলিল, "বাবা আমাকে ক্ষমা করুন।"

শিশির কম্পিত বাহুতে দিলীপকে বুকে টানিয়া লইল। অনেকক্ষণ দুজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অশ্রুমোচন করিল। কুন্দনলালের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

তার পর আর সেরাত্রে তাদের ঘুমের কথা মনে হইল না। দুজনে বসিয়া তাদের এ কয় বৎসরের জীবনের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। শিশির প্রথম দিলীপের কথা জিজ্ঞাসা করিল। দিলীপ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পর হইতে যাহা যাহা করিয়াছে, যত স্থানে গিয়াছে, যত ভাল কাজ করিয়াছে, যত লোকের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, তাহা শতমুখে বলিয়া গেল। তার গল্প শুনিতে শুনিতে শিশিরের ছাতি ফুলিয়া উঠিল। দেশ বিদেশে ছেলে যে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, কত আর্ত্তকে রক্ষা করিয়াছে, কত দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিয়াছে, ক্যাপ্টেনের কাছে কত রকম সমাদর লাভ করিয়াছে, সে কথা শিশির খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিল।

অন্তরের যে শূন্য কুঠরী এত দিন হাহাকার করিতেছিল, সেইখানে সে পুত্রের গৌরবের এই সব পরিচয় ঠাসিয়া বোঝাই করিতে লাগিল।

শিশির তার নিজের জীবনের কথা খুব বেশী করিয়া বলিল না। মিনতির কথা তুলিলই না। দিলীপ যাওয়ার পর হইতে সে চাকরী ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই কথাই সে বলিল। দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, মা কোথায়?"

চমকিত হইয়া শিশির পুত্রের মুখের দিকে চাহিল। তার পর বলিল, "তোমার বিমাতা? সে চুঁচুড়ায় আছে।"

ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া দিলীপ জানিল যে, এ আট বৎসর মাতার সঙ্গে পিতার দেখা হয় নাই। কথাটা শুনিয়া দিলীপের মনে ব্যথা লাগিল। তার মনে হইল, সে এই দুইটি প্রাণীর সমস্ত জীবন নষ্ট ও বঞ্চিত করিয়াছে—অপরাধ বোধে তার মন ভারী হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "এবার আপনি এখন বাড়ী চলুন বাবা।"

শিশির কোনও কথা কহিল না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার এখন মনে হইল, মিনতির কাছে এখন তার মুখ দেখাইবার পথ নাই। পুত্রকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে—পুত্র হারাইয়া তার চিত্তে যে গ্লানি ছিল, এ আনন্দে সে সব ধুইয়া গিয়াছিল। তাই এখন তার এই কথাই খুব বেশী করিয়া মনে হইল যে, মিনতিকে শিশির বিনা অপরাধে নিদারুণ শাস্তি দিয়াছে! মনে হইল, মিনতি যদি তার এই অবহেলা সম্বন্ধে অভিযোগ করে, তবে তার উত্তর দিবার কিছুই নাই। মিনতির দুঃখের ব্যথা আজ সে প্রথম পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিল। মনে পড়িল, তার সেই পুরাতন কথা—মিনতির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। তার পর তার সঙ্গে স্বল্প পরিচয়। মিনতির গুণের কথা তাহাকে এখন অভিভূত করিল। এমন গুণবতীকে

বিনা অপরাধে এমন কঠোর শাস্তি দিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, তার অনুভূতি শিশিরকে কাতর করিল।

দিলীপ বলিল, "সে হ'বে না, বাবা, আপনার আমার সঙ্গে যেতে হ'বে। মার কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হ'বে।"

শিশিরের দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। শেষে সে বলিল, "চল বাবা, তুমি যা বলবে তাই আমি করবো।"

তখন তার মনে হইল যে, মিনতি তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, দিলীপ ফিরিয়াছে। কথাটার রহস্য সে ভেদ করিতে পারিল না। দিলীপের সঙ্গে সে এই কথা আলোচনা করিতে লাগিল। অনেক গবেষণা করিয়া তারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এটা ফাঁকি দিয়া শিশিরকে বাড়ী ফিরাইবার একটা চক্রান্ত মাত্র। কিন্তু শিশিরের মনে হইল যে, আট বৎসর পরে মিনতির পক্ষে এমন চক্রান্ত করা সম্ভব নয়। আর দিলীপের সন্দেহ হইল যে, কোনও ভণ্ড দিলীপ সাজিয়া আসিয়া তাদের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দু-জনেই স্থির করিল, অবিলম্বে চুঁচুড়ায় যাইয়া এ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করা আবশ্যক।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোর বেলায় রামধারী বাবুর খিদমৎ করিতে আসিলে, দিলীপ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া চিনিল। সে হাসিয়া বলিল, "ওকে বলবেন না বাবা, দেখি ও আমাকে চেনে কি না।"

গাড়ীতে রামধারী উঠিলে দিলীপ বলিল, "রামধারী!"

রামধারী হঠাৎ থ মারিরা গেল। সে সাহেবকে চট করিয়া সেলাম করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। দিলীপ হাসিমুখে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

"চিনতে পারিল না রামধারী ?"

রামধারী আরও অবাক্ হইল। সাহেব হইয়া এমন বাঙ্গলা কথা বলে। আবার রামধারীকে চেনে, কে এ ? সে শিশিরের মুখের দিকে চাহিল। শিশির হাসিতে লাগিল। শিশিরের মুখে এমন হাসি রামধারী অনেক দিন দেখে নাই। দেখিয়া তার মুখ হাসিয়া উঠিল।

শেষে শিশির বলিল, "খোকাবাবু রে রামধারী।"

রামধারী তখন কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে হাসিবে, না নাচিবে, না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। দিলীপ তাহাকে এ দ্বিধা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বেঁচে আছিস বুড্ঢা —বেশ বেশ।"

২৩

দিলীপ যখন শিশিরকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল, তখন মিনতি একেবারে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত বিশ্বটা তার চক্ষের সামনে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া গেল—সে টলিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

তোতারাম ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে গেল, মিনতি সরিয়া গিয়া তাহাকে নিবারণ করিল।

অনেকক্ষণ পর মিনতি বলিল, "দিলীপ! তুমি দিলীপ নও!"

তোতারাম শান্তভাবে বলিল, "না মা আমি তো বরাবরই ব'লেছি—আমি দিলীপ নই।"

"তবে কেন?"—বলিতে বলিতে মিনতি থামিয়া গেল। কেন কি? কিছুই তার মনে আসিল না। তোতারামের উপর অনুযোগে অভিযোগে তার মন ভরিয়া গেল; কিন্তু এমন কোনও একটা কথাই তার মনে হইল না, যাহা লইয়া তাহাকে অনুযোগ করা যাইতে পারে।

তার মন কেবল বলিল "কেন তুমি দিলীপ হ'লে না?" কিন্তু সে অপরাধ তো তোতারামের নয়।

মিনতি বলিল, "কে তুমি?"

"মা, আমি আপনার ছেলে।"

মিনতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাও তুমি।" তোতারাম মুখ ভার করিয়া চলিল। তখন মিনতি বলিল, "এ বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না।"

"আচ্ছা মা," বলিয়া তোতারাম নীচে চলিয়া গেল।

এদিকে শিশিরকে তার নিজের ঘরে শোয়াইয়া দিয়া দিলীপ তাকে

শুশ্রূষা করিয়া শান্ত করিল। শিশির বারবার কি কথা বলি বলি করিয়া দিলীপের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কিছু বলা হইল না। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

দিলীপের মাথার ভিতর তখন আগুন ছুটিতেছিল। পিতাকে এই অবস্থায় একলা ফেলিয়া যাইতে পারিতেছিল না বলিয়া তার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

যখন শিশির খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দিলীপ রামধারীকে তার কাছে রাখিয়া "আমি এখনি আসছি বাবা," বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনতির ঘরে গিয়া দিলীপ দেখিতে পাইল, মিনতি বিছানার উপর অসাড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

সে সেদিকে একবার মাত্র অগ্নিময় দৃষ্টিতে চাহিয়া গট্‌মট্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল, তোতারাম গম্ভীরভাবে পায়চারী করিতেছে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে তোতারামের পশ্চাদ্দেশে একটা প্রচণ্ড লাথি মারিল।

অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তোতারাম হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সে চট্ করিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তখন দিলীপ তার শ্রমকঠোর বলিষ্ঠ বাহু আস্ফালন করিয়া প্রথমে বামহস্তে এক প্রচণ্ড ঘুসি বাগাইয়া তোতারামের দুই চক্ষের মধ্যস্থলে লক্ষ্য করিল। তোতারাম একটু সরিয়া গেল, সে আঘাত তার লাগিল না। অমনি চক্ষের নিমিষে দিলীপের ডান হাত তোতারামের কাণের কাছে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসিল। বিদ্যুৎগতিতে তোতারাম মাথা নীচু করিয়া আঘাত এড়াইয়া দিলীপের কোমর সাপটিয়া ধরিল।

দিলীপ বিচক্ষণ মুষ্টিযোদ্ধা। তার জাহাজে সে মুষ্টিযুদ্ধের পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তোতারামও বলিষ্ঠ কুস্তিগির। সুতারং রাগের ঝোঁকে দিলীপ তোতারামকে যত সহজে যত বিষম শাস্তি দিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইল না। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দিলীপ যদিও তোতারামকে গোটা কুড়ি খুব শক্ত ঘুসি লাগাইল, তবু শেষ পর্য্যন্ত তোতারাম তাহাকে সুকৌশলে ভূশায়ী করিয়া চাপিয়া ধরিল।

বাড়ীর চাকর-বাকর হা হা করিয়া ছুটিয়া দুইজনকে টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে তোতারাম দিলীপকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল, দিলীপও উঠিয়া তোতারামের দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

তোতারাম একটু সুস্থির হইলে বলিল, "মাপ কর ভাই, তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব করা অন্যায় হয়েছে।"

দিলীপ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "শুয়ারকে বাচ্চা! রসো তোমায় দেখছি!" বলিয়া সে ধাঁই করিয়া তিন চারটা প্রচণ্ড ঘুসি তোতারামকে লাগাইল। তোতারামের নানাস্থান দিয়া রক্ত প্রবাহ ছুটিল—মুখময় ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর বাধা দিল না।

তোতারাম কোনও বাধা দেয় না দেখিয়া দিলীপ থামিয়া গেল। এমন নির্ব্বিরোধী শত্রুকে আঘাত করা কাপুরুষের কাজ—ইহাতে দিলীপের রুচি ছিল না। সে সরিয়া গিয়া বলিল, "নেও, আত্মরক্ষা কর।"

তোতারাম বলিল, "না ভাই, আত্মরক্ষা করবো না। ক'রবার অধিকার আমার নেই, আমাকে যত আঘাত ক'রলে তোমার রোষের তৃপ্তি হয় তুমি তাই কর।"

"ভীরু—slave! তোমার যোগ্য এই!" বলিয়া দিলীপ তাকে পদাঘাত করিল।

"দিলীপ, ক্ষান্ত হও।" বলিয়া মিনতি আসিয়া দুয়ার গোড়ায় দাঁড়াইল। তাঁর মুখ একদম সাদা হইয়া গিয়াছে—সে যেন এক মাস রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছে।

দিলীপ, তোতারাম দুজনেই তার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

মিনতি দরজার চৌকাঠ ধরিয়া আপনাকে কোনও মতে সোজা করিয়া রাখিল। চাকর-বাকররা বুঝিতে না পারে সেই জন্য সে ইংরাজীতে বলিল, "তুমি যদি মনে কর যে, আমার কোনও কাজে তোমাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট হ'য়েছে, বা তোমার পিতার কোনও অনিষ্ট হ'য়েছে, সে জন্য শাস্তি প্রাপ্য আমার। তোতারাম নিরপরাধ, ওর উপর অত্যাচার ক'রো না। তোতারাম, তুমি এখন যেতে পার।"

তোতারাম অগ্রসর হইয়া মিনতির পায়ের ধূলা লইয়া নীরবে চলিয়া গেল। দিলীপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনতির উপর তার আক্রোশ কম ছিল না ; কিন্তু নারীকে ঠিক কিরূপে শাস্তি দেওয়া যায়, তাহা সে জানিত না। স্ত্রীজাতিকে সে একরকম ঘৃণা করিত ; কিন্তু তাদের গায় হাত তোলা বা তাদের তিরস্কার করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তা' ছাড়া, বর্ত্তমান অবস্থায় সে ঠিক আপনাকে তিরস্কার করিবার যোগ্য অবস্থায় অনুভব করিতেছিল না—সে অত্যন্ত লজ্জার সহিত অনুভব করিল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই বরঞ্চ মিনতির কাছেই অনেকটা খাটো হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

তোতারাম চলিয়া গেলে মিনতি দিলীপকে ইংরাজীতেই বলিল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে তুমি আমার ঘরে আসতে পার, দিলীপ। এখানকার চেয়ে সেখানে আমরা অনেকটা স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কইতে পারবো।"

দিলীপ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে বলিল, "ক্ষমা ক'রবেন,

আমার আপনার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখবার ইচ্ছা নেই। আপনি যেতে পারেন।”

“কোনও সম্পর্কই নয়? শাস্তি দিতেও ইচ্ছা নেই। আমার কোনও উত্তর শোনবারও ইচ্ছা নেই?”

“সে অধিকার আমার নেই।”

“বেশ,” বলিয়া মিনতি মুখ ঘুরাইয়া রাণীর মত তেজের সহিত চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া সে দুয়ার বন্ধ করিয়া খাটের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পর যখন তার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন মিনতির শরীরটা অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইল, সে মাথা তুলিতে পারিল না। নিশ্চেষ্ট অসহায় হইয়া সে একা পড়িয়া রহিল! আর রাশি রাশি অন্ধকার দুশ্চিন্তা তার মাথার ভিতর ভিড় করিয়া ছুটিতে লাগিল।

এ কি হইল! কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তার? কি করিতে কি হইল? তার জীবন তন্ন তন্ন করিয়া সে অনুসন্ধান করিল, সে কোনও অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তার মনে হইল না। কিন্তু তবু তার এ কি শাস্তি! আজন্ম ব্রহ্মচারিণী সে, কেবল দুটি দিন শিশিরের সংসর্গ ভিন্ন সে কখনও পুরুষের চিন্তা মনে স্থান দেয় নাই। তবু ঘটনাচক্রে এমন একটা কুৎসিত কলঙ্ক তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা দূর করিবার তার কোনও উপায়ই নাই। কে তার কথা বিশ্বাস করিবে? অন্য কাহারও নামে এমন কথা শুনিলে সে নিজেই যে বিশ্বাস করিত না। তবে সে তার স্বামী বা সপত্নী পুত্রকে কিরূপে বিশ্বাস করাইবে?

আজ দিলীপ আসিয়াছে। কত দিন সে একাগ্র সাধনা করিয়াছে এই দিলীপের প্রত্যাগমন প্রার্থনায়। বুক-ভরা মাতৃস্নেহ লইয়া সে এই সপত্নীপুত্রের সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল—তার পর এক

নিঃসম্পর্ক যুবককে দিলীপের জন্য সঞ্চিত স্নেহধারায় সে এত দিন অভিষিক্ত করিয়াছে। আজ ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, দিলীপ আসিয়াছে, তার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ প্রার্থনা পূরণ করিয়া ভগবান তার অভিমানকে কি নিদারুণ শাস্তি দিয়াছেন! সে বড় স্পর্দ্ধা করিয়া ভাবিয়াছিল, যে, তার পক্ষে কি মঙ্গল তাহা সে জানে। তাই সে দিলীপ ও স্বামীর প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিয়াছিল। বিধাতা তার সেই প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাঁর শাস্তির মাত্রা পূর্ণ করিয়াছেন।

মনে পড়িল, বিবাহের পূর্ব্বে সে বিদ্যুতের সৌভাগ্যের হিংসা করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, তেমনি সুযোগ পাইলে সে বিদ্যুতের গৌরব ম্লান করিয়া দিতে পারিবে। ভাবিয়াছিল, বিদ্যুতের চেয়ে তার কৃতিত্ব কত অধিক। বিধাতা তার সে অভিলাষও শুনিয়াছিলেন। বিদ্যুতের শূন্য আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তখন সে বড় স্পর্দ্ধা করিয়া আসিয়াছিল বিদ্যুতের গৌরব ম্লান করিতে। কিন্তু কোথায় তার সে কল্পিত গৌরব। নারীর যার চেয়ে বড় কলঙ্ক নাই, আজ সেই কলঙ্কের ভিতর তার ঐ অহঙ্কারের অভিযান সমাপ্তি লাভ করিল। কপট নারায়ণের এ কি কঠিন পরিহাস!

আর তোতারাম—তাকে সে পুত্রের অধিক স্নেহ দিয়া এত দিন বাড়াইয়াছে—তাহা হইতে তার এ কলঙ্ক! আর সন্ন্যাসী তোতারাম, তার এ পোড়া অদৃষ্টের ভাগী হইয়া, তার সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হইয়া, কি গভীর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া গেল। আজ দিলীপের হাতে আসন্ন মৃত্যু হইতে মিনতি তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—কিন্তু কে জানে, ইহার পর গৃহের বাহিরে তার কি শাস্তি হইবে। সে কোথায় যাইবে? কি দুর্গতি, কি লাঞ্ছনা তার অদৃষ্টে আছে কে জানে? কে জানে সে এই দুর্গতির জন্য

ধিক্কারে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে ? ভাবিতে মিনতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ সে কাঁপিয়া উঠিল।

দিলীপ বলিয়া মিনতি তোতারামকে ভালবাসিয়াছিল। ছয় বৎসর সে তাকে ভালবাসিয়াছে—তোতারামের কাছে ভক্তি ও প্রীতি পাইয়াছে। তা' ছাড়া তোতারাম ছিল তার ধর্ম্মজীবনের সহচর, ধর্ম্মে তার একরকম পথ-প্রদর্শক ! আজ প্রমাণ হইয়া গেল সে দিলীপ নয়, কিন্তু যে স্নেহ তার বুকের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহা তো ইহাতে ভাঙ্গিয়া যাইবার নয় ! তাই সে তোতারামের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মিনতির মনে পড়িল, তোতারাম সন্ন্যাসী হইলেও অভিমানী। দিলীপের মতই সে নিশ্চয় কোনও অভিমানে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে। কেবল অপরিসীম স্নেহ দিয়াই মিনতি তাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্নেহের স্থানে হঠাৎ এ নিদারুণ অপমান লাভ করিয়া সে না জানি কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে !

এ কথা মনে হইতে মিনতির মন এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, সে তার উপস্থিত বেদনা ভুলিয়া গেল, নিজের কঠিন সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হইল। না জানি তোতারাম কোথায় গিয়াছে, কি কষ্ট সে পাইতেছে—কি জানি, বুঝি বা সে আত্মহত্যাই করিয়া বসিয়াছে। তা' ছাড়া তার তো যাইবার কোনও স্থান নাই। তার গুরু কোথায় আছে, তাও সে জানে না। কোথাও যাইবার সম্বল তার নাই। সে শুধু একটা লোটা ও কম্বল লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ভিক্ষা না করিলে তার আজ খাওয়াই হয় তো জুটিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে মিনতি ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তার হাত কামড়াইতে ইচ্ছা হইল। কি নির্ব্বুদ্ধি সে ! তোতারামকে বিদায় দিবার সময় কিছু টাকা দিবার কথাও তার মনে হইল না। বৃন্দাবনে তীর্থানন্দ

স্বামীর কাছে যাইবার মত সম্বল তাহাকে দিয়া দিলেও তো তার একটা গতি হইত। কি ভুল তার।

ছট্ ফট্ করিয়া ঘরের ভিতর পাইচারী করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া বুদ্ধি স্থির করিয়া একখানা চিঠি লিখিল। তার দেরাজ খুলিয়া যা' কিছু টাকা কড়ি ছিল বাহির করিল—নোটে টাকায় সে প্রায় দুইশত টাকা হইবে। তার পর আহ্লাদী ঝিকে ডাকিল।

আহ্লাদীকে মিনতিই নিযুক্ত করিয়াছিল। সে মিনতির ভয়ানক অনুরক্ত এবং মিনতি তাকে বিশ্বাস করে।

মিনতি আহ্লাদীকে বলিল, "তুই একটা কাজ কর'তে পারবি আহ্লাদী ?"

"পারবো না কেনে গো মা, কি কাজখানা বল না ?"

"তোতারামকে খুঁজে বের করতে পারবি ?"

"সে কেনে পারবো নাই। এই তো গেল, হুগলী সহরটা কতটুকু যে তাকে খুঁজে বার কর'তে লারবো।"

"তাকে খুঁজে বের ক'রে এই চিঠি আর এই টাকা দিবি, আর একটা জবাব নিয়ে আসবি। বুঝলি ? দেখিস্ কেউ যেন টের না পায়।"

আহ্লাদী একটু হাসিল। সে হাসিটা মিনতির বুকের ভিতর বিষাক্ত ছুরীর মত বসিয়া গেল। সমস্ত অন্তর তার ঘৃণায় ভরিয়া গেল

আহ্লাদী হাসিয়া বলিল, "ইয়ার লিগে তুমি কিছু ভেবো না মা। আহ্লাদী তেমনটা নয়। আজ দুপহর না যেতে তার খবর লিয়ে আসবো, বাড়ীর ইঁদুরটা অবধি জানবেক নাই।"

কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ ঝিটা ভাবিল, মিনতি তার প্রেমিকের কাছে গোপনে পত্র পাঠাইতেছে! কিন্তু উপায় নাই—আর এ কথা তাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনাও বটে, তার মধ্যে একটা হীনতাও আছে।

মিনতি কিছু বলিল না, মুখ চাপিয়া সহিয়া গেল। ভাবিল, এখন তো এমন তার কতই সহিতে হইবে!

আহ্লাদীকে বিদায় করিয়া সে অনেকটা সুস্থচিত্তে আবার নিজের অবস্থা ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, এখন সে কি করিবে? তার পর মনে করিল, তার স্বামী কি করিবেন তার উপরই সেটা নির্ভর করিবে। সে ধরিয়া লইল, শিশির বা দিলীপ কেহই তার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবে না। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাতে তাহাদের বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াও কোনও লাভ নাই।

শিশির এখন বোধ হয় তাহাকে অপমান করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। এ কথা ভাবিতেই তার সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এ আট বৎসর শিশির নির্ম্মম অত্যাচারে তাকে নিপীড়িত করিয়াছে। বিনা দোষে তার অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছে। এই দীর্ঘ নির্য্যাতনের উত্তরে সে কোনও দিন একটি কথাও কহে নাই। শিশিরের সে অপরাধের কোনও শাস্তিই সে দেয় নাই, অনুযোগ পর্য্যন্ত করে নাই। আজ শিশির আট বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ধাঁ করিয়া স্বামীগিরির অধিকার জাহির করিয়া তার শাস্তি দিতে বসিবে। কি নিদারুণ পরিহাস! অপরাধী করিবে নির্য্যাতিতের শাস্তি! কেন না সে স্বামী আর মিনতি স্ত্রী! সেজন্য মিনতির অপরাধের উপযুক্ত বিচার পর্য্যন্ত করিবার প্রয়োজন বোধ হয় হইবে না!

স্বামিত্বের এই বিকট ভেঙ্গানি, পবিত্র পতি-পত্নী সম্বন্ধের এই মর্ম্মন্তুদ পরিহাসে মিনতির হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। এই অসত্য এই অপমান, অন্যায়ের এই লাঞ্ছনা কি সে মাথা পাতিয়া সুধু সহিয়া যাইবে? কখনই না। তার মনে পড়িল বিনোদের কথা। তার একটা স্বাধীন সত্তা আছে—তার আত্মা আছে, যার মর্য্যাদা শিশিরের চেয়ে কোনও অংশে

কম নয়। আজ তার মনে হইল যে মনুষ্যত্ব হিসাবে স্বামীর চেয়ে সে অনেক অংশে কম নয়। আজ তার মনে হইল যে মনুষ্যত্ব হিসাবে স্বামীর চেয়ে সে অনেক উপরে। তবু সে স্বামীর ছায়া বই আর কিছুই হইতে পারিবে না, স্বামীকে ছাড়িয়া তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে না, তার অপমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না ? এত কি সে মানুষ্যত্বহীন—সে কি কেবলই একটা ছায়া, মানুষ নয় সে ?

সে স্থির করিল এ অবিচার অত্যাচারকে সে তিরস্কৃত লাঞ্ছিত করিয়া আপনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। অন্যায়কারীকে বিচারক সাজিয়া বসিবার সুযোগ সে দিবে না। তার পর কলিকাতায় গিয়া শিক্ষকতা করিয়া বা অন্য কোনও উপায়ে সে একটা জীবিকার সংস্থান করিবে। তার পর সে তার জীবনের প্রধান কার্য্য করিবে—তার ধর্ম্ম জগৎকে শুনাইবে, তার মত অপমানিত লাঞ্ছিত নারীকে সে আশ্রয় দিবে, তাদের ভিতর শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিবে—নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার শক্তি জাগ্রত করিবে।

সে একান্ত মনে প্রার্থনা করিল, "নারায়ণ শক্তি দেও, বিদ্রোহ করিবার—শক্তি দেও এ বিদ্রোহে জয়ী হইবার"—

হঠাৎ সে থমকিয়া গেল। আবার প্রার্থনা! প্রার্থনা করিতে গিয়া তার মনে পড়িল যে, জীবনে যখনই সে কিছু প্রার্থনা করিয়াছে, তখনই সে প্রার্থনা পূরিত হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে। তার জীবন নিয়মিত করিবার ভার লইয়াছেন যে বিশ্বদেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সে যখনি তার নিজের বুদ্ধিতে নিজের ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রার্থনা করিয়াছে, তখনি দেবতা তার সে স্পর্দ্ধার এমনি লাঞ্ছনা করিয়াছেন। আবার অভিমান! আবার দেবতার কাছে আবদার! আপনার ক্ষুদ্র

বিচার-শক্তি ও ধূলিকণার তুল্য বুদ্ধি দিয়া আবার সে নিজের শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে! সে নিবৃত্ত হইল।

বিশ্ববিধাতা সমস্ত লীলাস্রোতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তার জীবন নিয়মিত করিতেছে। তার দুঃখ কষ্ট ভাল মন্দ সবই সেই লীলা-প্রবাহের এক একটা নগণ্য তুচ্ছ তরঙ্গ মাত্র। বিশ্বদেব তার গতি নিয়মিত করিতেছেন—তার উপর কথা কহিবার সে কে? এই চিন্তায় মিনতি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল। সে তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিল, "প্রেমময় নারায়ণ, তোমার প্রেমের লীলায় তুমি আমাকে নাচাইতেছ—তুমি জান কিসে আমার ভাল মন্দ, তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। তোমার লীলা সার্থক হউক। তুমি যে পথে আমাকে লইবে তাই লও প্রভু! আমার হৃদয় নিয়মিত করিয়া দেও, তোমার বিশ্ব লীলায় আমাকে ডুবাইয়া দেও—আর কিছুই চাই না প্রভু। আমার অভিমান ডুবাইয়া দেও, তোমার ইচ্ছায় আমাকে আনন্দ দেও প্রভু।"

নত হইয়া সে নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রশান্ত চিত্তে উঠিয়া বসিল। তার পর দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল।

বাহির হইয়া মিনতি দেখিল, রামধারী দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল।

দুয়ার খুলিতেই সে গড় হইয়া মিনতিকে প্রণাম করিল। মিনতি প্রশান্তচিত্তে তাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

রামধারী বলিল, "অনেক দিন মাকে দেখতে পাই নি। প্রয়াগজীতে মাইজীকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম মাইজী চলে গেছেন।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে মিনতি বলিল, "ভাল আছ রামধারী ?"

"হাঁ মা, আমি ভাল থাকবো না কেন ? গরীব দুঃখী মানুষ, ছোট-লোক, আমার ভাল মন্দে তো কিছু আসে যায় না। ভগবান বেটা দুঃখ কষ্ট দেয় বড় বড় লোককে। আমার বাবু আছেন, মাইজী আছেন, দেবতার মত মানুষ, তাদের ভগবান যত দুঃখ দেন!"

"ভগবান কাউকে দুঃখ দেন না বাবা। তাঁকে বুঝতে পারি না, আমরা তাই দুঃখ পাই।"

"হাঁ মাইজী সে ঠিক! সে ঠিক!"—তার পর অনেকক্ষণ নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া অনেক আয়োজন করিয়া রামধারী আমতা আমতা করিয়া বলিল, "মাইজী, রামধারী ছোটলোক, বোকা সোকা মানুষ, তবু সে আপনাদের অনেক দিনের নোকর, আপনাদের ভালমন্দ আমার কলিজায় লাগে মাই। দুটো আবদার করতে চাই মা, যদি কিছু না মনে করেন।"

"কি রামধারী, কি চাও তুমি ?"

"মাইজি, এই খোকাবাবুকে আপনি মাপ ক'রবেন।"

মিনতি অবাক হইয়া গেল। জগতে যে এমন লোক এখনও আছে যে দিলীপকে তার কাছে অপরাধী মনে করে, তাতে সে বিস্মিত হইল। রামধারীর কথায় তার চক্ষে জল আসিল। রামধারী বলিয়া গেল,

"সে ছেলেমানুষ মাই, তাতে এতদিন বিলাতে থেকে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আর হাজার হ'লেও মা, সে আপনার বেটা, আপনি মা। আপনার কাছে সে হাজার অপরাধ ক'রলেও তাকে আপনি মাপ করবেন।"

মিনতি কথা কহিতে পারিল না। সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

রামধারী বলিল, "মা আপনার ছেলে আমি, বুড়া মানুষ, হুকুম হয় তো দু একটা কথা বলি। অনেক দুঃখ পেয়েছেন বাবু, মা—সে দুঃখ এই রামধারী বেটা দুই চক্ষু দিয়ে শুধু দেখেছে; কিছু ক'রতে পারে নি। অনেক দিন পর যদি বাবু দেশে ফিরে এসেছেন, আর তাকে দুঃখ দেবেন না মা—আপনিও আর দুঃখ পাবেন না! বাবু আমার ঝোঁকী মানুষ, ঝোঁকের মাথায় কখন কি ক'রে বসেন তার ঠিক থাকে না। আমাকে তো দুশোবার তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি মা যদি তাতে রাগ করেন কি অভিমান করেন, তবে সব ভাল হ'য়ে এসেও সব আবার নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই যে মা এত দিন আপনি রাগ ক'রে রইলেন, তা না থেকে যদি একবার বাবুর কাছে যেতেন, অমনি বাবু জল হয়ে যেতেন, সব মিটে যেতো। সে যাক, যা' হ'বার হয়ে গেছে। এখন মা আপনি একটু ক্ষমা ক'রে নেবেন। বাবুর শেষ বয়সে আর যেন বাবু দুঃখ না পান। সব আপনার হাত মা।"

মিনতি চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার হাত আর কই বাবা? আমি এখন কি ক'রতে পারি। এখন বাবু আমাকে কাছে থাকতে দেবেন কি না তারই ঠিকানা নেই।"

"না মা, না—সেজন্য ভাববেন না আপনি। একটু চুপ ক'রে সুধু

চেপে থাকবেন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমার বাবুকে তো আমি চিনি মা। এখন ষোল আনা আপনারই হাত। আমি আপনার ছেলে মা, আমার কাছে লজ্জা কি আপনার? আজ যা' হ'য়ে গেল এতো আমি বুঝতে পারছি, আমার বাবুর খোকাবাবুর সব দোষ। আপনার কিছু দোষ নেই। কিন্তু বাবু তাতে রাগ' ক'রবেন, হয় তো আপনাকে মন্দ বলবেন, আরও কিছু ক'রবেন। আপনি যদি তাতে রাগ করেন, তবেই সব নাশ হ'বে। আপনি এত সহ্য ক'রেছেন—আর কয়েকটা দিন যদি স্থধু সহ্য ক'রে যেতে পারেন, তবে শেষে কোনও গোল থাকবে না। বাবু যা' বলেন যা' করেন, কিছুতে কিছু বলবেন না—স্থধু এ বাড়ী ছেড়ে যাবেন না মা। তা' হ'লেই, বস্, সব মিটে যাবে। রামধারী বুড়া কথা দিচ্ছে মা—কিছু গোল হবে না।"

বুড়ার কথায় মিনতির মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। এ তাকে বিশ্বাস করে। এই একজন লোকের তার উপর শ্রদ্ধা আছে। এ শিশিরকে অপরাধী করিয়া তার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, ইহাতে মিনতি অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ লাভ করিল!

রামধারী যাহা বলিল তাহাতে মিনতির আস্থা হইল না। এত সহজে এ গোল মিটিবে বলিয়া তার মনে হইল না। কিন্তু সে কথা লইয়া রামধারীর সঙ্গে আলোচনা করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না।

সে বলিল, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক রামধারী! তুমি আমার বাপের বয়সী, তোমার কথা আমি রাখবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার হাতে যা আছে তা আমি করবো। আমি এমন কিছুই করবো না, যাতে তোমার বাবুর দুঃখ হয়। আমি সব সহ্য করবো।"

রামধারীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ভগবানজী আপনার ভাল করুন মাই। আমার আর কোনও চিন্তা নেই। আপনি

এই বুড়ার কথাটা মনে রাখবেন। এখন আপনি কাজ কর্ম্ম করুন গে যান—বাবুকে এখন কোনও রকম ঘাটাবেন না। দু'দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কোনও চিন্তা নেই।”

মিনতি একটু ভাবিল। সে যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিল, এ কথায় তাহা সব উলট-পালট হইয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, এখনি গিয়া সে শিশিরের সঙ্গে দেখা করিয়া, শান্তভাবে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিবে। তার অদৃষ্টে এখন কি আছে, সেটা যত শীঘ্র জানা যায় তাই ভাল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল, রামধারীর বুদ্ধিই সে শুনিবে। সে শান্তভাবে গিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে সে সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল শিশিরের আহ্বানের। শিশির একটু সুস্থ হইলেই যে তাহাকে ডাকিয়া তার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে, এ সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে শিশির একবার খোঁজও করিল না। সে স্নান আহার করিল, রামধারী ও দিলীপ তার দেখাশুনা করিল—মিনতি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খাইবার জায়গায় না যাওয়াই স্থির করিল।

খাওয়া দাওয়ার পর যখন শিশির ও দিলীপ বিশ্রাম করিতে গেল, তখন মিনতি দেবার্চ্চনায় বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সে পূজা করিল। তার পর বিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মনকে শান্ত করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে স্থির করিবার চেষ্টা করিল। পূজান্তে প্রসন্ন অন্তরে উঠিয়া সে খাইতে গেল।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মিনতি বই পড়িতে লাগিল। তোতারাম তুলসীদাসখানা ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহা লইয়া সে পড়িতে লাগিল। বইখানা হাতে লইতেই তার চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল।

তোতারামের জন্য তার প্রাণটা ভয়ানক কাঁদিয়া উঠিল। সে আহ্লাদীর খোঁজ করিল। জানিল সে তখনও ফেরে নাই। মিনতি একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বহুকষ্টে মন শান্ত করিয়া সে রামায়ণ পড়িতে লাগিল। সে পড়িল সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা, তার পর সীতার নির্ব্বাসনের কথা। পড়িতে পড়িতে জানকীর দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে সে পড়িয়া গেল।

তার পর বই বন্ধ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল। জগতের আদর্শ সতী লক্ষ্মীর অবতার সীতা দেবীকে তাঁর স্বামী সন্দেহ করিয়াছিলেন। সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অযোধ্যায় আসিয়া প্রজার মধ্যে তাঁর অখ্যাতি রটিল। রামচন্দ্র তাহাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাপলেশশূন্য হইয়া দেবী সীতার যদি এ নিগ্রহ হইয়াছিল, তবে সামান্য মানবী মিনতির যে এ দুর্গতি হইবে এ আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার শ্রীরামচন্দ্র যদি ভ্রান্ত হইয়া সীতার সতীত্বের প্রতি সন্দিহান হইতে পারিয়াছিলেন, তবে শিশিরের পক্ষে মিনতির চরিত্রে সন্দেহ করা এমনি কি গুরুতর অপরাধ? এ কথা ভাবিতে মিনতি আশ্চর্য্য শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিল। ইহার পূর্ব্বে সে এই ভাবিয়া গ্লানি বোধ করিয়াছিল যে, নির্দ্দোষ হইয়াও সে সমাজে নিন্দিত হইবে, হীন পাপিষ্ঠা স্বৈরিণী ও গণিকার সঙ্গে এক পর্য্যায়ে তার স্থান হইবে। এখন সে এই কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিল যে, তার স্থান হইবে জানকীর পার্শ্বে। দেবচরিত্র যে সকল বীর পুরুষ ও নারী সমাজের অজ্ঞতা ও অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইয়া বীরত্ব ও গৌরবের অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, গৌরবে না হউক অপমানে ও দুঃখভোগে মিনতি তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান লাভ করিবে, এ কথা ভাবিয়া তার চিত্ত গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল।

তার মনে হইল এই তো চাই। সুখভোগ তো সবাই করিতে পারে,—দুঃখ সহিবার শক্তিতেই প্রকৃত বীরত্ব। যারা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাদেরই সৌভাগ্য হয় অন্যায় নির্য্যাতন ভোগ করিবার। সাধারণ লোকের জন্য সুখ—দুঃখ আছে জগতে বীরের জন্য। খৃষ্টানদের ধর্ম্মে ক্রুশ এই অন্যায়ের নির্য্যাতনের প্রতীক—ক্রুশ বহন করা খৃষ্টানের সব চেয়ে বড় গৌরব! চৈতন্যদেব জগাই মাধাইয়ের কাছে দারুণ লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিলেন। এ জগৎ সেই জগাই মাধাই—জগতের লোক ভালকেই চিরদিন নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছে।

এ কথা ভাবিতে ভাবিতে মিনতির চিত্ত একটা বৃহৎ গৌরব বোধে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে গৌরবের নেশায় উন্মত্ত হইয়া খৃষ্টীয় martyr-গণ হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন, যে গৌরবের উত্তেজনায় ভারতের সতী হাসিতে হাসিতে অগ্নিবরণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরবের মদিরায় তার চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে তার শাস্তিকে যীশুর কণ্টক-মুকুটের মত পবিত্র ও গৌরবময় বলিয়া মনে মনে সম্বর্দ্ধনা করিল। ভগবান যে তাকে এত দুঃখের যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, সেই জন্য সে তাঁহাকে বারবার নমস্কার করিল।

বৈকালে আহ্লাদী ফিরিয়া আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া একখানা চিঠি দিল। ফিস ফিস করিয়া সে বলিল, "মা গো, সে কি খুঁজে পাই? এ-ঘাট সে-ঘাট, এঘর সেঘর খুঁজতে খুঁজতে সেই গেনু সেই রথতলার ঘাটে। সেখানে গিয়ে দেখি সন্ন্যাসী ঠাকুর গাছ তলায় কম্বল বিছিয়ে পড়ে রইছে। চিঠি তো দিলাম—তা জবাব দিবেক কেমন করে? সেই ছুটলাম আবার সেই মল্লিকদের ঘরে। সেখানে আমার এক বহিন কাজ করে। তার ঠেঙ্গে আনলাম চেয়ে একটা কলম দোয়াত তবে ঠাকুর চিঠি

লেখে—আর লিখতে কি চায় ? বলে কি—না চিঠি লিখবো নাই তুমি মুখেই বলো গিয়ে। কি জানি চিঠি লিখিলে ফির কে কি ভাববেক। আমি বল্লাম সে ভয় করো নাই ঠাকুর—আহ্লাদী সে মেয়ে নয়।”

ইত্যাদি করিয়া আহ্লাদী সুদীর্ঘ বাক্য বিন্যাসের সহিত নিজের দৌত্যের বিবরণ বলিয়া গেল। এবং সে যে একটা ভারী রকম বকশীসের আশা রাখে তাহা জানাইল। মিনতির হাতবাক্স খুঁজিয়া পাঁচটা টাকা বাহির হইল, তাহা সে আহ্লাদীকে দিল। বড় দুঃখে তার হাসি পাইল। আহ্লাদী তাকে যাহা ভাবিতেছে, তাহা ভাবিয়া সে একটু কৌতুক অনুভব না করিয়া পারিল না।

আহ্লাদীকে বিদায় করিয়া মিনতি চিঠি পড়িল। তোতারাম লিখিয়াছে—

“মা, আপনার আশীর্ব্বাদী টাকা পাইলাম। টাকার আমার দরকার ছিল না। তবু আপনার স্নেহের দান আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম।

আমি আপনার দুঃখের কতক নিবৃত্তি করিবার আশায় আসিয়াছিলাম। আপনার মাতৃস্নেহে আমার জীবন ধন্য হইয়াছে; কিন্তু আপনাকে কেবল আমি অশেষ দুঃখ দিয়া গেলাম। এখন আর আপনার কাছে থাকিয়া অপরাধ বাড়াইব না।

যদি আপনার কোনও বিষয়ে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, এবং আমাকে যদি স্মরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই ঠিকানায় জানাইলেই আমার কাছে সংবাদ পৌঁছিবে।” তার পর সে ঢাকা জেলার একটা ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছে।

পত্রখানা মিনতি সযত্নে বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা বেলায় রামধারী বিছানা করিবার পূর্ব্বে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা বাবুর বিছানা কি তাঁর পুরানো ঘরেই ক'রে দেবো ?"

শিশির বলিল, "না, এই ঘরেই আর একখানা খাটিয়া এনে দে।"

রামধারী বলিল, "এ ঘরে মাইজী থাকবেন—তা খোকা বাবু"—

শিশির ধমক দিয়া বলিল, "না, মাইজী এখানে থাকবে না। যা' বলছি, কর।"

রামধারী মুখ ভার করিয়া শিশিরের বিছানা তুলিয়া ঝাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিছানা করিতে লাগিল, আর বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিল, "বেশ হ'বে। আমার কি ? লোকে থক দেবে। ঘরের কথা ঢাক পিটিয়ে বললে মান ইজ্জত সব থাকবে আর কি ? মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারী হ'বে।"

ছাড়াছাড়াভাবে এই কথাগুলি বলিয়া বলিয়া রামধারী বিছানার এক একটা জিনিষ টানিয়া উঠাইতে লাগিল। তার পর তোষকটা ঝাড়িয়া সে বলিল, "ভদ্রলোকের মান আপনি রাখলেই থাকে, আপনি বিলিয়ে দিলেই যায়।" তোষকটা পাতিয়া বলিল, "ঘরের মেয়েছেলের কথা সত্যি হ'লেও জান গেলে কেও বাইরে জানতে দেয় না।" তার পর চাদরটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "এ তো মিথ্যে কথা—এক দম মিথ্যা !"

"কি বিড়্ বিড়্ বকছিস্ তুই ?" বলিয়া শিশির আর একটা ধমক দিয়া উঠিল।

"না—কি বকবো ? অনেকদিন আছি হুজুরের কাছে—তাই মনে লাগে। বলি !"

"তুই কি বলতে চাস্? তোর আস্পর্দ্ধাটা বড় বেড়ে গেছে।"

"কি আর বলবো? আপনি যা ভাবছেন সব মিথ্যে, এই আর কি? নাহক সুধু খোকা বাবু একটা সাধু-সন্ন্যাসীকে নাকাল ক'রলে।"

"চুপ কর! তুই সবজান্তা কি না?"

কিন্তু শিশিরের ক্রমে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল যে, রামধারীর কথা কতকটা ঠিক। মিনতির চরিত্র সম্বন্ধে তার যে সন্দেহ, সেটা যে সত্য, তাতে কোনও সংশয় তার হইল না; কেন না, সে যাহা শুনিয়াছে ও নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছে, তার উপর আর কারও কোনও কথা বলা চলে না। কিন্তু তবু দিলীপের পক্ষে সে বিষয় লইয়া এমন হট্টগোল করাটা ঠিক হয় নাই। ইহাতে ব্যাপারটা বিসদৃশ রকমে জানাজানি হইয়া যাইবার সম্ভাবানা। এ সব কথা লোকের কাছে ঢাক পিটিয়া জানাইবার মত কথা নয়। কেন না, ইহাতে সমাজে যে কেবল অপরাধিনী পত্নীর নিন্দা হয় তাহা নয়—সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীর ও তার পরিবারের কলঙ্ক হয়। এতটা না করিলেই ভালো হইত।

তার পর এত দিন পর দেশে ফিরিয়া আজ যদি সে মিনতিকে ঘরে আসিতে না দেয়, সে যদি স্বতন্ত্র ঘরে শোয়, তবে সেও এক রকম ঢাক পিটাইয়া কথাটা প্রচার করা হইবে। সুতরাং মিনতির সান্নিধ্য তার কাছে যত কষ্টকর হউক, যে কয় দিন শিশির এখানে আছে, সে কয় দিন মিনতির এ ঘরে শোয়াই ভাল। বেশী দিন শিশির এখানে থাকিবে না। কালই সে দিলীপকে লইয়া কলিকাতা যাইবে—না হয় তো পরশু দিন। এ একটা দুইটা দিন কোনও মতে কাটাইয়া দিলে বোধ হয় কলঙ্কটা কমিতে পারে। তার পর আর তো শিশির মিনতির কাছে আসিবে না।

যখন রামধারী বিছানা সারিয়া আবার গজর গজর করিতে করিতে

ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল, তখন শিশির তাকে বলিল, "আচ্ছা, যা'—খোকার বিছানা পাশের ঘরেই করগে।"

রামধারী খুসী হইয়া খুব জোরে জোরে ঝাঁটা চালাইতে লাগিল। ঝাঁট দেওয়া হইয়া গেলে সে বলিল, "মাইজী তা' হ'লে এখানেই শোবেন।"

শিশির বলিল—"হাঁ।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে রামধারী চলিয়া গেল। মিনতির কাছে গিয়া বলিল, "এইবার মা, বুড়ার কথা মনে রাখবেন। বাবুর ঘরে আপনার বিছানা হ'য়েছে। রাত্তিরে হয় তো কথা কিছু হ'তে পারে। মা, আপনি একটু ক্ষমা ক'রে সয়ে যাবেন দয়া ক'রে।"

প্রভুভক্ত ভৃত্যের এই আগ্রহ দেখিয়া মিনতির চক্ষে জল আসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমার জন্য কোনও ভয় নেই।"

রাত্রে শিশির ও দিলীপ যখন খাইতে বসিল, তখন মিনতি সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ প্রসন্ন, উদ্বেগশূন্য। সে হৃদয়কে নিয়মিত করিয়া সকল দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। তার সমস্ত চিন্তা ভগবানের পায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে—তাই সে প্রসন্ন।

শিশির অনুভব করিল, মিনতি আসিয়াছে। সে কোনও কথা না বলিয়া নীরবে গম্ভীর হইয়া আহার করিল। দিলীপও কোনও কথা বলিল না। মিনতি কেবল তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহারা খাইয়া গেলে মিনতি আহার করিল। তার পর সে আপনার ঘরে গিয়া তার মহাপরীক্ষার জন্য কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিবাহ বাসরে কেবল এক রাত্রিমাত্র সে স্বামীর সঙ্গলাভ করিয়াছিল,

তার পর এক দিনও সে স্বামীর শয্যায় স্থান পায় নাই—ফুলশয্যা হয় নাই। —আজ তার ফুলশয্যা—অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! কত আশা ভরসা, কত আনন্দের স্বপ্ন লইয়া সে ফুলশয্যায় যাইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু আজ তার ফুলশয্যা রচিত হইয়াছে তার সকল আশা ভরসার ভস্মস্তূপের উপর, ভগ্ন হৃদয়ের জীর্ণ সমাধির উপর। স্বামীর প্রতি কি অপরিসীম প্রেম লইয়া সে এ ঘরে আসিয়াছিল—আজ আট বৎসর দুঃখের নিপীড়নে সে প্রেম এক তপ্ত উদাস বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। সে বাষ্প তার হৃদয় পরতে পরতে দগ্ধ করিয়া তাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে নববধূর বেশে যাইতেছে স্বামীর শয্যায় স্থান লইতে—কিন্তু সে নবধূর কঙ্কালমাত্রও তার অন্তরে নাই। তার সে প্রেম নাই, সে আশা নাই, সুখ নাই—বুঝি হৃদয় পর্য্যন্ত নাই। তার নিজের অসীম দুঃখের মাঝেও সে এ কথা মনে করিল যে, তার স্বামীকে দিবার তার কিছুই নাই। সম্পূর্ণ রিক্তা হইয়া সে শূন্য হৃদয় লইয়া ফুলশয্যায় চলিয়াছে।

মিনতি ভাবিল, এখন কি হইবে? স্বামী তাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবেন? কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? তার কাছে কোন্ দাবী করিবেন? কেমন করিয়া সে স্বামীর কথার উত্তর দিবে?

স্বামী যে তাকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইবেন, এমন সন্দেহের আভাসমাত্রও তার মনে উঠিল না। আর সে সম্ভাষণের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও তাকে পীড়া দিল না। সে স্বামীকে কল্পনা করিল বিচারকরূপে। স্বামী হয় তো তাহাকে তার কল্পিত অপরাধের জন্য তিরস্কার করিবেন।

তখন সে কি উত্তর দিবে? প্রথমেই সে ভাবিল, সে কোনও উত্তর দিবে না, নিজের দোষ ক্ষালনের কোনও চেষ্টা করিবে না। অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টার মধ্যে যে একটা দীনতা আছে, তাহার কল্পনায় তার

হৃদয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তার পর ভাবিল, সে মাথা খাড়া করিয়া বলিবে, "আমি যাই ক'রে থাকি, সে সম্বন্ধে জবাবদিহি করবার তোমার কি অধিকার আছে। তুমি তো আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছ। বিবাহের পর হ'তে তো তুমি আমার কোন খবরই নেও নি। তুমি আমার বিচার করবার কে?" কিন্তু তার মনে পড়িল যে, সে রামধারীকে কথা দিয়াছে—সে সহিয়া যাইবে। তাই এ কথা সে নামঞ্জুর করিল। তার পর সে ভাবিল, সে কোনও কথা বলিবে না, তার যে শাস্তি হয় নীরবে তাহা গ্রহণ করিবে। এমন শাস্তি জানকীর হইয়াছিল—তার কেন না হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে রামধারী আসিয়া পড়িল। সে বলিল, "যান মা, বাবু শুয়েছেন—আপনি এখন ঘরে যান।"

মিনতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল, "রামধারী, তুমি মানুষ নও দেবতা। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার বাপ ছিলে। আমি তোমার মেয়ে বাবা।"

বুড়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "মা, ভগবানের কাছে ভিক্ষা করি—যেন আর-জন্মে আমি রাজা হই, আর তুমি আমার বেটী হও।"

সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি তখন ভাবিতে লাগিল, কি বেশে সে যাইবে। সে অন্যমনস্ক ভাবে চিরুনী হাতে করিয়া এতদিনকার অযত্নে লাঞ্ছিত চুলগুলি আঁচড়াইতে লাগিল! একবার ভাবিল কাপড় খানা ছাড়িয়া লইবে। তার পর হাসিল। সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার দিন কি তার আছে? আর সাজাইবেই বা কাকে। আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তার মুখের সে শ্রী আর নাই। আটাশ বৎসর বয়সেই সে শুকাইয়া বার্দ্ধক্যের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তার যে চক্ষের দৃষ্টিতে

শিশির একদিন মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এখন কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। রূপ তার কোনও দিনই বেশী ছিল না, এখন তার কিছুই নাই। যে করুণ তপঃক্লেশের মাধুরী তার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মিনতির চক্ষে পড়িল না।

সে স্থির করিল, সে যেমন আছে, ঠিক তেমনি অবস্থায়ই যাইবে। একখানা মোটা চাদর লইয়া সে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চলিল।

রামধারী বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিয়া মনে মনে রাম নাম জপ করিতে লাগিল। দ্বারের কাছে মিনতির কাণে কাণে বলিল, "মনে রাখবেন মা, রাগ ক'রবেন না।"

একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া লজ্জিত হাস্যের সহিত মিনতি ঘরে ঢুকিয়া ছুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে ঢুকিয়া মিনতি দেখিল, শিশির পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। ঘুমের ভান করিয়া সে পড়িয়া আছে, তাহা মিনতি বুঝিতে পারিল ; কিন্তু সে ভান ভাঙ্গিতে তার ইচ্ছা হইল না।

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—এখন সে কি করিবে। খাটে উঠিয়া স্বামীর পাশে শুইবার চিন্তায় তার দারুণ ঘৃণা বোধ হইল। সে কি বেশ্যা ? স্বামী যদি তাকে না চান, তবে সে কোন্ লজ্জায় তাঁর শয্যা অধিকার করিবে। সে মেঝের দিকে চাহিয়া দেখিল—বেশ পরিষ্কার। বিছানা হইতে অতি সন্তর্পণে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া সে মাটিতে তাহা রাখিয়া গায়ের চাদরখানা বেশ করিয়া মুড়িয়া শুইয়া পড়িল—অনেকক্ষণ তার ঘুম হইল না। এই নূতন অবহেলার অপমানে তার অন্তরের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। দারুণ জিঘাংসায় সে দগ্ধ হইল। শেষে সে আয়ত্ত করিল যে এ অপমানের কোনও প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তার

নাই। তখন সে কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে তার উপাধান ভিজাইয়া ফেলিল, তার পর অনেক রাত্রে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলায় উঠিয়া শিশির দেখিল, মিনতি মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তখনও তার মুখে অশ্রুর ছাপ লাগিয়া আছে। একবার শিশিরের মনে একটু করুণার উদ্রেক হইল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উপরের দিকে চাহিল। বিদ্যুতের ছবির দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত অন্তর বিষে ছাইয়া গেল। শিশির দুয়ার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিনতির যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিতে পাইল, শিশির উঠিয়া গিয়াছে। মিনতি উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। অপমান বোধে তার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল—সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তার মনে হইল, কেন সে এ অনাদরের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া এ ঘরে আসিতে গিয়াছিল। তার স্বামীর দৃষ্টি ও ব্যবহারের ভিতর যে নীরব অভিযোগ, তার যোগ্য উত্তর দিয়া সে কেন দূরে থাকে নাই! তার মানের মাথা খোয়াইয়া সে কেন এ-ঘরে শুইতে আসিয়াছিল?

শিশির না জানি কি ভাবিতেছে। তার এ অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া সে নির্লজ্জের মত ছুটিয়া আসিয়াছিল—স্বামীর আদর কাড়িতে—স্বামী তাকে নিদারুণ অপমান করিয়া তার লোভের লাঞ্ছনা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় তাঁর খুবই তৃপ্তি হইয়াছে। নিষ্ঠুর বালকেরা 'তু' বলিয়া কুকুরকে ডাকে, কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে কাছে ছুটিয়া যায়, অমনি তারা তাকে চাবুক লাগাইয়া দেয়। কুকুর কেঁউ কেঁউ করিয়া ছুটিয়া পালায়—বালকেরা আনন্দে হাসিতে থাকে। কিন্তু আবার তু বলিয়া ডাকিলে আবার লেজ নাড়িয়া ছুটিয়া আসে। শিশির নিশ্চয় মিনতিকে এই

কুকুরের মত লজ্জাহীন, কুকুরের চেয়ে আত্মসম্মানহীন মনে করিতেছে, আর তার এই অপমান করিয়া শিশির খুব একটা নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। এ কথা মনে হইতে মিনতির আপনাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। ছি! ছি! ছি! বুদ্ধিহীন রামধারীর কথায় ভুলিয়া সে নিজের আত্মসম্মান এমন করিয়া বিলাইয়া দিল! ধিক!

আপনাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া মিনতি ছুটিয়া নিজের ঘরে গেল। পথে রামধারী দাঁড়াইয়া ছিল। তার দৃষ্টির ভিতর জিজ্ঞাসার ছায়াপাত দেখিয়া মিনতি যেন একেবারে মর্ম্মে মরিয়া গেল। আত্মগোপন করিবার এক নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় সে মাথার উপর চাদরটা টানিয়া দিয়া ধাঁ করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

২৬

মিনতির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আঘাত সামলাইয়া উঠিবার পর শিশির মিনতির সম্বন্ধে কোনও কথা কারও সঙ্গে বলে নাই। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তার একটা নিদারুণ লজ্জা বোধ হইতেছিল। বিশেষ করিয়া দিলীপের কাছে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

দিলীপও এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। প্রথম রাগের ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সে তোতারামকে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিল; কিন্তু তার পর সে আর কিছু বলে নাই। তারও এ বিষয়ে যথেষ্ট লজ্জা-বোধ ছিল।

যখন মিনতির ঘর হইতে বাহির হইয়া আহ্লাদী বাহিরে চলিয়া গেল, তখন দিলীপ লক্ষ্য করিয়াছিল। তখন সে কিছু মনে ভাবে নাই। কিন্তু যখন সারাদিন পরে আহ্লাদী ফিরিয়া আসিয়া তার সম্মুখ দিয়া আবার মিনতির ঘরে গেল, তখন তার সন্দেহ হইয়াছিল। আহ্লাদী যে মিনতির কাছে ফিস ফিস করিয়া গোপনে কোনও কথা বলিতেছে, তাহা দিলীপ একটু দেখিতে পাইয়াছিল; এবং পত্রখানা দেওয়াও তার চক্ষে পড়িয়াছিল।

তার পর হইতে দিলীপ আহ্লাদীকে গোপনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইল, কিন্তু সেদিন কোনও সুবিধাই করিতে পারিল না।

পরের দিন সকাল বেলায় দিলীপ বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার ধারে গিয়াছিল। সেখানে সে হঠাৎ আহ্লাদীকে দেখিতে পাইল। তখন সেখানে আর কোনও লোকজন ছিল না। দিলীপ আহ্লাদীর কাছে

অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তুই সন্ন্যাসীটার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলি ?"

আহ্লাদী জিভ কাটিয়া একেবারে অস্বীকার করিল। কিন্তু দিলীপ যখন তাকে খুব জোরে ধমক দিল—তখন আহ্লাদীর মনে পড়িয়া গেল দিলীপের হাতে তোতারামের লাঞ্ছনার চিত্র। সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে দিলীপ তার কাছে সব কথাই আদায় করিয়া লইল—অর্থাৎ আহ্লাদী যেমন বুঝিয়াছিল তেমনিভাবে। তখন দিলীপের মনে একটা দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। সে সেই ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তার ইচ্ছা হইল যে মিনতির মাথা মুড়িয়া ঘোল ঢালিয়া চাবুক মারিতে মারিতে বাড়ী হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবিতে তার মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। ইহা যে একেবারে অসম্ভব, আর এ সম্বন্ধে তার পিতা কিছু না করিলে যে ইহা দিলীপের পক্ষে অসহ্য অনধিকার-চর্চ্চা তাহা সে বুঝিল। তাই সে কেবল আপনার ঠোঁট কামড়াইয়াই নিবৃত্ত হইল। স্ত্রীজাতির প্রতি তার যে গভীর ঘৃণা ছিল, তাহা আরও বাড়িয়া গেল।

যখন দিলীপ বাড়ী ফিরিল, তখন শিশির তাকে ডাকিয়া বলিল, "চল দিলীপ, আমরা ক'লকাতায় গিয়ে বাস করিগে।"

দিলীপ বলিল, "চলুন ; সেই ভাল।"

"চল আজই বৈকালে যাওয়া যাক।"

দিলীপ সম্মত হইল, কিন্তু সে বলিল, চুঁচুড়ার এবাড়ী রাখবার তো কোনও দরকার দেখি নে—মিথ্যেমিথ্যি কতকগুলো খরচ।"

শিশির গম্ভীরভাবে বলিল, "তা ঠিক—কিন্তু সে সম্বন্ধে ওঁর যা ইচ্ছা তাই হ'বে।"

"ওঁর এখানে থাকবার কোনও দরকার নেই। উনি বাপের বাড়ী গিয়ে

থাকলেই পারেন, না হয় দেশে গিয়ে থাকতে পারেন। সেখানে দেখবার শোনবার লোক আছে।”

শিশির চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, “যাক, সে সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে চাই নে। কলকাতায় গিয়ে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা কিছু ক'রতে হ'বে। এখন তা'হ'লে সব ঠিক ঠাক ক'রে নেও। চারটের গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।”

দিলীপ বলিল, “তা হ'লে আমি একবার গোপেনের কাছে ব'লে আসি। ও'র সঙ্গে একটা engagement ক'রেছিলাম।”

দিলীপ বাহির হইয়া গেল। শিশির রামধারীকে ডাকিয়া জিনিষ-পত্তর সব গুছাইতে বলিল।

রামধারী বলিল, “ক' দিনের জন্য যেতে হ'বে ?”

খুব জোরে শিশির বলিল, “চিরদিনের জন্য। আর ফিরবো না। সব জিনিষ-পত্তর নিয়ে চল্।”

রামধারী স্তম্ভিত হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, সে নড়িল না।

শিশির বলিল, “কি রে দাঁড়িয়ে রইলি যে। যা জিনিষ-পত্তর গুছাগে।”

রামধারী ক্ষেপিয়া উঠিল। সে বলিল, “আপনি কি পাগল হ'য়েছেন বাবু ? এত দিন ঘুরে যদি বা ঘরে ফিরলেন—আবার ছুট। এমন ক'রে ক' দিন বাঁচবেন।”

“ঠিক যত দিন ভগবান বাঁচাবেন তত দিন বাঁচবো। তোর পাহারা-দারীতে আমি তার চেয়ে এক দিনও বেশী বাঁচবো না; যা।”

তবু রামধারী নড়ে না।

শিশির আবার তাগাদা করিতে, তার মনের ভিতর যে কথাটা সব চেয়ে বেশী খোঁচা দিতেছিল, তাহা বলিয়া ফেলিল। সে বলিল, “তার পর মাইজী থাকবেন কোথায় ?”

শিশির গর্জ্জিয়া বলিল, "যে চুলোয় তার মন চায়, সেইখানে সে যাবে। সে জন্য তোর মাথা ঘামাতে হ'বে না।"

রামধারী রাগ করিয়া বলিল, "আপনার জিনিষ আপনি গুছান গে বাবু, আমি পারবো না। আমি আপনার চাকরী ক'রবো না।"

রোষরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তার দিকে চাহিল। চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। পুরাতন ভৃত্যের দুঃখ দেখিয়া শিশিরের মনটা নরম হইয়া গেল।

সে একটু নরম সুরে বলিল, "তোর কি হ'য়েছে রামধারী, তুই কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিস ?"

"পাগল হইনি বাবু। আমার দোষ এই যে, আমি আপনার মত চক্ষু থাকৃতে অন্ধ হইনি। আমি মানুষ দেখলে চিনতে পারি। তা ছাড়া কাণ দিয়েছেন ভগবান, সব কথা শুনতে পাই। আর চক্ষের উপর যখন দেখছি, আপনারা একটা নির্দ্দোষ মেয়েমানুষকে পিষে মেরে ফেলছেন, আর নিজে মরতে ব'সেছেন, তা' সইতে পারি না। এই আমার দোষ।"

"চোখ আমারও আছে রামধারী। কাণ দিয়ে আমিও শুনতে পাই। তাই আমার তোর সঙ্গে পরামর্শ করবার দরকার হয় না। সত্য মিথ্যা বিচার করতে করতে জীবন কেটে গেল, আজ তোর কাছে আমার সে কথা শিখতে হ'বে না।"

"ভগবান আপনার কি বুদ্ধি দিচ্ছেন আর কেন দিচ্ছেন তা তিনিই জানেনঃ। কিন্তু বাবু, আমি জান কবুল ক'রে বলতে পারি, মাইজী দেবতা —তাঁর কোনও দোষ নেই। আর আপনি যদি মাইজীর উপর এ অত্যাচার করেন, তবে আপনার চাকরী আমি করবো না—আমার সাফ কথা।"

বিরক্ত হইয়া শিশির বলিল, "আচ্ছা, না করিস না করবি। বেরো এখান থেকে।"

রামধারী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। শিশির তার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তার মর্ম্মস্থল হইতে বাহির হইল। এই পুরাতন প্রভুভক্ত ভৃত্যের অশ্রুজল তার অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিল।

রামধারী মিনতির কাছে গিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "মা, বাবুর চাকুরী ছেড়ে দিলাম, আজ থেকে আমি আপনার চাকর।"

"সে কি রামধারী? কি হ'য়েছে?"

"কি আর হ'য়েছে? বাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

ক্রমে নানা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে রামধারী, শিশিরের সঙ্গে তার যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিল। মিনতির মুখখানা সামান্য একটু ভার হইয়া উঠিল।

সে শান্তভাবে বলিল, "কেন তুমি আমার জন্য তোমার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে গেলে রামধারী? আমি তো তোমাকে কিছু বলি নি।"

"আপনি কিছু বলেন নি। কিছু বলেন না সেই তো যত গোল। যদি আপনি কথা ব'লতে জানতেন, তবে কি এ সব হ'তে পারে? এখনও ধর্ম্ম আছেন মা। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এমন অধর্ম্ম সইবে না মা, সইবে না।"

"ছি রামধারী, তুমি বুড়ো মানুষ হ'য়ে বাবুকে শাপছো!"

"ভগবান জানেন মা—বাবুর জন্য আমার বুকটা কেমন ক'রছে। আমি তাকে শাপছি না। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি—ভগবান তাঁকে শাস্তি দেবেন!"

"ভগবান কাকে শাস্তি দেবেন, কাকে পুরস্কার দেবেন, তার মালিক তিনি। আমাদের সে বিচারে কাজ কি বাবা? যাও—তুমি বাবুর জিনিষ-পত্তর গুছাও গে।"

"না মা, বাবুর চাকরী আমি করবো না।"

"তা না ক'রলে। আমার চাকরী তো ক'রবে। চল—আমি সব গুছাব, তুমি আমার সাহায্য করবে।"

মিনতি অগ্রসর হইল। রামধারী স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল—এ মেয়ে কি! সে নীরবে স্বামিনীর অনুগমন করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মিনতি শিশিরের বাক্স পেটারা খুলিয়া আবার তাহা ভাল করিয়া গুছাইয়া দিল। তার বিছানা-পত্র রামধারীর সাহায্যে বাঁধিয়া ফেলিল। শিশিরের যে সব জিনিষ বরাবর এ বাড়ীতে ছিল, সেগুলি সে আর দুই তোরঙ্গ ভরিয়া গুছাইল। বিদ্যুতের ছবিখানা সাবধানে নামাইয়া সযত্নে বাঁধিয়া দিল। এমন সৌষ্ঠবের সহিত সে এ সব করিল যে, রামধারী অবাক হইয়া গেল।

এ সব করিতে করিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। শেষ বাক্সটা গুছাইবার সময় শিশির আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মিনতি অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মুক্তার মত স্বেদবিন্দু সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া মুক্ত কেশ পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আবার নতমুখে বাক্স গুছাইতে লাগিল। শিশির তার এ মূর্ত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

শিশিরকে দেখিতে পাইয়াই মিনতি মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রামধারী অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনতি নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। শিশিরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিনতি শেষে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "রামধারী বল্লে, তুমি একেবারে চ'লে যাচ্ছ। আমাকে কি আদেশ দিয়ে যাচ্ছ?"

শিশিরের মোহ কাটিয়া গেল। সে খাটের পায়ার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমাকে আমার বলবার কিছুই নেই। তোমার যা' ইচ্ছা ক'রতে পার।"

"কেন? আমি কি ক'রেছি?"

ভ্রূকুটি করিয়া শিশির বলিল, "কি ক'রেছ তা তুমিও জান আমিও জানি, আর আমি যে জানি তাও তুমি জান। সে কথা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?"

একবার মিনতির চক্ষের ভিতর একটা বিদ্যুতের ঝলক দিয়া গেল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া, আবার মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি অপরাধ ক'রেছি এই যদি স্থির ক'রে থাক, তবে শাস্তি তো দিতে পার? আমি কি শাস্তি পাবার যোগ্যও নই?"

মিনতির এই প্রশান্ত মূর্ত্তি ও শান্ত বাক্যে শিশিরের অন্তর যেন খড়্গাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর এই নারী! এত বড় অপরাধ করিয়া সে এমন নির্ব্বিকার! আর স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে নির্ব্বিকারভাবে, এমনি করিয়া সে অপরাধ স্বীকার করিতে পারে! বুকের ভিতর দারুণ ঝঞ্ঝা অনেক কষ্টে চাপিয়া শিশির বলিল, "না শাস্তি দেবার কর্ত্তা ভগবান। আমি কেবল মুক্তি গ্রহণ ক'রলাম।"

"বেশ, তাই ভালো। কিন্তু তবে তোমার এ সংসারের ভার থেকে আমায় মুক্তি দেও। এ আট বৎসর আমি এ সংসার আগলে র'য়েছি কেবল দিলীপের ফিরে আসবার প্রতীক্ষায়। এখন দিলীপ এয়েছে। তুমি তোমার ছেলে পেয়েছ। এখন আর আমার এ বিড়ম্বনায় প্রয়োজন নেই। আমাকে বিদায় দেও।"

এ কথায় শিশিরের মনে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দিল। দারুণ হিংসা ও আক্রোশে তার সমস্ত মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।

তার চেষ্টালব্ধ শান্ততা এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। সে দাঁত খিচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন? কোথায় যাবে? কোন্ ভাগাড়ে? ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে?"

এ কথায় মিনতির মনের ভিতর চাপা আগুণ যেন ঘৃতাহুতি পাইয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃষ্টিতে আগুন ছড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অসহনীয় অকথ্য ঘৃণায় রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিল। তার পর বলিল, "দেখ, ও কথা বলো না, জিভ খসে' পড়বে। সে আমার ছেলে —আমি তার মা।"

দর্পের সহিত কথাটা বলিয়া মিনতি বেগে মুখ ফিরাইয়া চলিল—তার বুক ঠেলিয়া যে কান্না আসিতেছিল, তাহা সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

শিশির সে তেজস্বিনী মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তার মনে ভয়ানক গোল লাগিয়া গেল। সে বলিল, "দাঁড়াও—যেও না।"

মিনতি থামিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিল। তার অশ্রুপ্রবাহ সে কিছুতেই তার স্বামীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারে না!

শিশির বলিল, "তুমি বলতে চাও—তুমি নির্দ্দোষ!"

দর্পের সহিত মিনতি বলিল, "সে কথা জেনে তুমি কি ক'রবে? আমি —আমি তো তোমার কেউ নই—বিবাহের পরের দিন থেকে তুমি আমার কোনও খবর নেওয়া দরকার মনে কর নি—আমার কোনও কথা তো তোমার শোনবার দরকার নেই!"

শিশির ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, "দরকার আছে ব'লেই বলছি মিনতি— আমার মরণ বাঁচন তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রছে বলে জিজ্ঞাসা করছি—তুমি নির্দ্দোষ?"

মিনতি কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল—তার পর মাথা

উঁচু করিয়া গর্ব্বিত দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আমি নির্দ্দোষ—কোনও পাপ আমি করি নি, কোনও অপরাধ করিনি।"

শিশির কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু কেমন করে এ কথা বিশ্বাস করবো—কি প্রমাণ আছে?"

মিনতি অস্বাভাবিক ধীরতার সহিত বলিল, "বিশ্বাস না করতে চাও, নাই ক'রলে! কিন্তু যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি প্রমাণ দিয়ে তোমার বিশ্বাস করাতে যাব, নিজের ধর্ম্ম নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবো, এত্ত ছোটলোক আমি নই। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক—আমার ধর্ম্ম আমি দেখবো। শাস্তি দিতে চাও,—সে সইবার শক্তি আমার আছে।"

দিলীপ আসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া ছিল। শিশির বা মিনতি তাহা লক্ষ্য করে নাই। মিনতির কথা শুনিয়া শিশির একটু দ্বিধাযুক্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

দীলীপের ভারী রাগ হইল। সে বলিল, "দেখুন, বাবাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন আপনি, এখন ক্ষমা দিন। আর উৎপাতটা ক'রবেন না।"

মিনতি যেন এ কথায় জ্বলিয়া উঠিল। সে গর্জ্জিয়া বলিল, "আমি দুঃখ দিয়েছি তোমার বাবাকে? এ কথা তোমার মুখে সাজে বটে!" সে আর কিছু বলিতে পারিল না, রাগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দিলীপ বলিল, "দেখুন, অতটা injured inncence নাই দেখালেন। এ কথা নিয়ে ঘাঁটান আমার কাছে মোটেই প্রীতিকর নয়, তবু দু' একটা কথা বলতে হ'চ্ছে! আচ্ছা, বলুন দেখি, পরশু দিন আপনি মালতীকে এক কথায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছিলেন কেন?"

"সে কথার জবাব তোমার কাছে আমি দেব না।"

দিলীপ রাগে ফুলিতে লাগিল। সে বলিল, "তা নাই দিলেন; কিন্তু

আপনার জবাব ছাড়াও অনেক কথা প্রমাণ হ'তে পারে। কাল সেই সন্ন্যাসীটাকে বের ক'রে দেবার পরও আপনি তার কাছে চিঠি এবং টাকা আহ্লাদীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং সে চিঠির জবাব আহ্লাদী আপনাকে এনে দিয়েছে। খুব সম্ভব সে চিঠি আপনার বাক্স দেরাজে কোথাও আছে। সেটা কি আপনিই বের ক'রে দেবেন, না, আমায় জোর ক'রে বের ক'রতে হ'বে ?"

অসহ্য বেদনায় মিনতির মুখ কালো হইয়া গেল। তার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে কেবল চক্ষু দিয়া দিলীপের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর সে কেবল বলিল, "ওঃ দিলীপ ! দিলীপ ! তুমি আমার এমনি অপমান করছো !" সে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

দিলীপ বলিল, "আচ্ছা, তবে আমিই খোঁজ ক'রে দেখছি।" বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল।

শিশির একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "দিলীপ, থাক !"

দিলীপ বলিল "না বাবা, অনেক সহ্য ক'রেছি। এতটা অন্যায় ক'রে যে উনি আবার আপনাকে ধমকাবেন, এ আমি সহ্য করবো না।"

সে মিনতির ঘরে চলিয়া গেল। দুমদাম করিয়া বাক্স ও দেরাজের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মিনতি একটা স্তূপের মত হইয়া পড়িয়া রহিল। শিশির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ভাবিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা ধরিয়া মিনতির বাক্স ও দেরাজ ঘাঁটিয়া দিলীপ সব কাগজ-পত্র টানিয়া বাহির করিল। একখানা একখানা করিয়া সব পড়িল।

কয়েকখানা বাজে চিঠিপত্রের পর বাহির হইল দিলীপের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানা ছাপা বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন মিনতি কাগজে ছাপাইয়াছিল। দিলীপ তাহা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল। কি কপটী এই নারী!

তার পর একখানা কবিতার খাতা। কবিতাগুলির পাতা উল্টাইয়া গেল। অনেকগুলি পাতায় নিজের নাম দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইল। সে কবিতাগুলি তাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা, উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহ, লাঞ্ছিত স্নেহের ব্যথা ও আকুল আবেগে সেগুলি বোঝাই। প্রথমে দিলীপ সেগুলি মনে মনে ভেঙ্গাইতে লাগিল, কিন্তু কবিতাগুলি এত সুন্দর ও সরস—এত প্রাণপূর্ণ, যে দিলীপ ক্রমে তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। তার মনে ধোঁকা লাগিয়া গেল। এ সবই কি কপট উচ্ছ্বাস, অর্থশূন্য অভিনয়?

তার পর সে কয়েকখানা চিঠি পাইল। চিঠি সুমতি, বিনোদ, বড়-বউ প্রভৃতির লেখা। তার ভিতর যাহা দেখিল তাহাতে সে আরও স্তব্ধ হইয়া গেল।

সুমতি এক পত্রে লিখিয়াছে,—"তোর ছেলে পেয়ে তোর এত আনন্দ দেখে আমার আনন্দও হ'চ্ছে দুঃখও হ'চ্ছে। যার থেকে তোর জীবনটা নষ্ট হ'তে ব'সেছে তাকে তুই এত ভালবাসিস—এতে আনন্দ হ'চ্ছে। কিন্তু যার জন্য তোর ছেলের উপর এত দরদ, সে ত একবার চেয়েও দেখছে না। এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নাই।"

বিনোদ এক চিঠিতে লিখিয়াছে, "তুমি লিখেছ দিলীপ তোমার ছেলে

বই অন্য কিছুই তুমি ভাবতে পার না। তাকে যে তুমি ভালবাস সে তার বাপের জন্য নয়, তারই জন্য। শুনে বড় সুখী হ'লাম। এমন মা হ'য়ে তুমি জন্মেছ; কিন্তু ভগবান তোমার মাতৃত্ব যাতে পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ হ'বে তার সুযোগে তোমায় বঞ্চিত ক'রেছেন।"

আর এক পত্রে লিখিয়াছে, "আমার ভুল হ'য়েছিল মিনু, তুই যে এত বড় তা' আমি বুঝতে পারি নি। তুই লিখেছিস, তোকে যে ভগবান পেটের ছেলে দেন নি, সে জন্য তুই তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিস, কেন না তা না হ'লে হয়তো তুই এমন ক'রে দিলীপকে ভালবাসতে পারতিস না। এত বড় কথা ক'জন মেয়ে মানুষ বল্‌তে পারে।"

এমনি রাশি রাশি পত্র সে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া দিলীপের মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

তার পর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে আরও কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। আরও পত্র পাইল। শেষে তোতারামের পত্রখানা পাইল।

তোতারাম পত্রখানা লিখিয়াছিল মিনতির পত্রের পৃষ্ঠে। দিলীপ মিনতির পত্র আগে পড়িল। মিনতি লিখিয়াছে,

বাবা,

তোমাকে বড় লাঞ্ছনা পেয়ে আমার বাড়ী থেকে বিদায় হতে হ'য়েছে। আমি যে নিজের বুদ্ধির ভুলে তোমার এত লাঞ্ছনার হেতু হ'য়েছি, এ কথা ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

তোমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছি। তখন আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আহ্লাদীর হাতে তোমাকে ২২৫৲ টাকা পাঠালাম। এ টাকা কটা নিও। অপমান লাঞ্ছনা আমি তোমার যতই ক'রে থাকি, তুমিই তো যাবার আগে বলেছ—আমি তোমার মা। টাকা

কটা না নিয়ে মায়ের বুকে শেল মেরো না। এই টাকা নিয়ে তুমি বৃন্দাবনে গুরু মহারাজের কাছে যেতে পারবে।

তোমাকে আমার ছেলে ব'লে ভুল ক'রে আমি ভালবেসেছি। এখন জানছি তুমি আমার ছেলে নও। কিন্তু ছয় বৎসর যে তোমাকে স্নেহ ক'রেছি, তা তো জীবনে ভুলতে পারবো না। অভাগিনী মা ব'লে আমাকে তুমি এখনও মনে রাখবে কি ?

মনে রাখবার যোগ্যা আমি নই। ধর্ম্মাত্মা তুমি, তোমার ধর্ম্মের সাধন পথ থেকে আমি কেড়ে এনেছিলাম। তার পর—নিদারুণ অপমান—যার চেয়ে বড় কলঙ্ক সন্ন্যাসীর হ'তে পারে না সেই মিথ্যা কলঙ্কে তোমাকে লিপ্ত ক'রেছি আমি। শেষে আমার ছেলে তোমাকে অপমান ক'রেছে, প্রহার ক'রেছে। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তবু, বাবা, তুমি আমাকে দুঃখিনী মা ব'লে ক্ষমা ক'রে মনে রেখো।

যে লাঞ্ছনা তোমার হ'য়েছে, তার জন্য কোনও গ্লানি তোমার মনে রেখো না। এ তো সবই সেই লীলাময়ের লীলাচক্রের গতি—তবে দুঃখ কি বাপ ?

তোমার অভাগিনী মা
মিনতী”

পড়িতে পড়িতে দিলীপের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে পাতা উল্টাইয়া উত্তর পড়িল। তার পর চিঠিখানা তার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

তার পর সে ছুটিয়া শিশিরের ঘরে গেল। শিশির তখনও ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া ছিল। দিলীপ তার কাছে চিঠিগুলি লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, “বাবা, আমাদের বড় অপরাধ হ'য়ে গেছে। এই দেখুন মা'র সে পত্র।”

শিশির চিঠিটা পড়িল। তার মন হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে উৎফুল্ল-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি তখন সে ঘরে ছিল না। দিলীপ তাহাকে এঘর ওঘর খুঁজিল। আহ্লাদী সামনে ছিল, সে বলিল, "মা নীচে গেছেন।"

দিলীপ বুঝিল, মিনতি রান্নাঘরে সংসারের কাজ করিতে গিয়াছে। সেখানে গিয়া চাকর-বাকরদের সামনে তাকে কোনও কথা বলিতে সঙ্কোচ হইল। দিলীপ আহ্লাদীকে বলিল, "মাকে একবার উপরে আসতে বল, খুব জরুরী দরকার।" দিলীপ পিতার কাছে গেল।

একটা কিছু না করিলে তার মনটা শান্ত হইতেছিল না। সে তাই তড়্বড়্ করিয়া বাঁধা বিছানা খুলিয়া ফেলিল, তোরঙ্গ খুলিয়া জিনিষপত্র-গুলি বাহির করিয়া ফেলিল। তার মায়ের ছবিখানি যথাস্থানে টাঙ্গাইল।

মিনতির আসিতে দেরী দেখিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। নীচে ছুটিয়া গেল। সিঁড়ির পাশে আহ্লাদী দাঁড়াইয়া ছিল, দিলীপকে দেখিয়া তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল, সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আহ্লাদী নীচে গিয়া শুনিতে পাইয়াছিল, মিনতি বাড়ী নাই। সে রামধারীর সঙ্গে একখানা গাড়ী ডাকাইয়া একবস্ত্রে চলিয়া গিয়াছে। আহ্লাদী দিলীপকে মিনতির ঘরে খানাতল্লাসী করিতে দেখিয়াছিল। সে সহজে সিদ্ধান্ত করিল যে, মিনতি ধরা পড়িয়া এখন একেবারে সন্ন্যাসীর কাছে উধাও হইয়া গিয়াছে। ভাবিতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ধন্যি মেয়েমানুষ বাপু! ভর দিনের বেলায় সোয়ামী পুত্তুরের সম্মুখ দিয়া এমনি করিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল!

এই বার্ত্তা দিলীপের কাছে বহন করিয়া লইতে তার সাহস হইল না। শুনিয়া কি জানি যদি রাগের মাথায় দিলীপ তাকে বুটশুদ্ধ পদাঘাত করিয়াই বসে। সে লাথি একটা খাইলে আর আহ্লাদীর ধড়ে প্রাণ

থাকিবে না। তাই সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া ছিল হঠাৎ দিলীপ নামিয়া আসিতে সে একবারে ভড়কাইয়া গেল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, "কই, মা কোথায় ঝি ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে আহ্লাদ্বী বলিল, "তিনি নেই।"

"নেই কি ? কোথায় গেছেন।"

আহ্লাদী কাঁদিয়া ফেলিল। ভেউ ভেউ করিয়া বলিল, "বেরিয়ে গেছে দাদাবাবু—গাড়ী ক'রে চলে গেছে, তোমাদের মুখে কালি দিয়ে"—

"চুপরও হারামজাদী" বলিয়া দিলীপ তাড়া দিতেই আহ্লাদী, "ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লে রে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল।

দিলীপ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিতে পাইল, মিনতি গাড়ী করিয়া চুঁচুড়া ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন।

সে একটা বাইসিকেল সংগ্রহ করিয়া ছুটিল।

* * *

দিলীপ যখন তার ঘর খানাতল্লাসী করিতে গেল, তখন অপমানে মর্ম্মপীড়ায় মরিয়া গিয়া মিনতি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

তার সেই অবস্থা দেখিয়া রামধারী কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

মিনতি তখন মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "চল রামধারী।"

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রামধারীও পিছু পিছু চলিল। তার আর মুখে কথা ছিল না।

বাহিরে আসিয়া মিনতি বলিল, "রামধারী, আমি তোমার মেয়ে—

তুমি আমার বাপের কাজ কর। আমাকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর। একখানা গাড়ী ক'রে আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসো।"

রামধারীরও ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, "তাই ভাল মা, চলুন।"

তার পর তারা নীচে চলিয়া গেল। রামধারী গাড়ী ডাকিয়া আনিল।

মিনতি বলিল, "আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারবে, বাবা?"

রামধারী তার কোমর হইতে বটুয়া খুলিয়া পাঁচটা টাকা বাহির করিল। মিনতি বলিল, "থাক, তোমার কাছেই থাক এখন। চল।"

তার পর তারা গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দিলীপ যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন ট্রেন আসিয়াছে, মিনতি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে। তখন সেই ষ্টেশনভরা লোকের সম্মুখে দিলীপ তার সব মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া মিনতির পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

দিলীপ বলিল "মা, আমি তোমার কাছে যে অপরাধ ক'রেছি, তার শাস্তি নেই। তবু মা তোমার ছেলে আমি—আমাকে ক্ষমা কর।"

মিনতির দুই চক্ষু ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে দুই হাত দিয়া দিলীপকে জোর করিয়া উঠাইয়া বলিল, "ওঠ বাবা, তোমার উপর আমার এক ফোঁটাও রাগ নেই।"

দিলীপ তখন দুই হাতে মিনতির পথ আগলাইয়া বলিল, "তবে মা বাড়ী ফিরে চল—আমাকে এখন আর ফেলে যেতে পারবে না।"

মিনতি দৃঢ়ভাবে বলিল, "ওই অনুরোধটা আমাকে আর ক'রো না বাবা। আমি যেতে পারবো না।"

দিলীপ আর কিছুক্ষণ ব্যর্থ সাধ্য-সাধনা করিয়া শেষে ভাবিল যে, ইতিমধ্যেই চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছে। এখানে একটা হট্টগোল

করা কিছুই নয়। তাই সে রামধারীকে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও রামধারী। বাবাকে বলগে আমি মাকে পোঁছাতে গেলাম, কালই ফিরবো।" বলিয়া সে মিনতির পিছু পিছু গাড়ীতে উঠিল।

মিনতির পিত্রালয়ে পোঁছিয়াই সে মিমতিকে বলিল, "মাগো, আমার অপরাধে বাবার তোমার দুজনেরই জীবন অর্দ্ধেক নষ্ট হ'য়েছে। এর পর যদি আমারই অপরাধে তুমি আমাদের ছেড়ে এসো, তবে আমার সে দুঃখ ম'রলেও যাবে না। তুমি আমাকে আর যে শাস্তি দেও মাথা পেতে নেব মা, সুধু এই শাস্তি আমায় দিও না।"

মিনতি দিলীপের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "শাস্তি তোকে কি দেব বাবা, তোকে দুঃখ দিলে যে সে দুঃখ আমারই বুকে বাজবে। কিন্তু তুই তো আমার ছেলে, তুইই বল, যেখানে তোর মায়ের এমন অপমান হয়ে গেছে, সেইখানে তাকে আবার কি বলে ফিরতে বলিস্! আর অপমান তো শুধু আমার নয়, তোতারাম আমার জন্য সেখানে অপমান স'য়েছে, দুঃখ পেয়েছে। তুমিও আমার যেমন ছেলে সেও তেমনি। আমি যদি আজ সেখানে ফিরে যাই, তবে আমি তার মা হ'বার যোগ্য হ'ব না।"

দিলীপ আর কথা কহিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক বুদ্ধি স্থির করিল। সে পোষ্টাফিসে গিয়া একখানা টেলিগ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরের দিন সকালে দিলীপ মিনতির পায়ের ধূলা লইয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিল।

দিলীপের কাছে মিনতি শুনিয়াছিল যে, তার এবং শিশিরের সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। তারা যে মিনতির কাছে নিদারুণ অপরাধে অপরাধী, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। এ কথা শুনিয়া মিনতির মনে ভারি তৃপ্তি বোধ হইল। এতদিনে ভগবান তার শাস্তির যোগ্য পুরস্কার

দিয়াছেন। সে আজ জয়ী হইয়াছে। সে তার নারীত্বের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া পাইয়াছে, আর পাইয়াছে তার স্বাধীনতা। তা ছাড়া সে দিলীপকে সত্য সত্যই পুত্ররূপে পাইয়াছে। সে নারায়ণকে মনে মনে শতকোটি প্রণাম করিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বিনোদ ও সুমতি মিনতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

মিনতি বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায়, এইবার আমার একটা রোজগারের উপায় করে দিন। আমার একটা কিছু ক'রে খেতে হ'বে তো।"

"ক'রে খেতে হ'বে কেন মিনতি? শিশিরের সম্পত্তি থেকে খোরপোষের তোমার আইনসঙ্গত অধিকার আছে—তা' তুমি নেবে না কেন?"

জিভ কাটিয়া মিনতি বলিল—"ছি, এতটা খাটো আমায় মনে ক'রবেন না মুখুজ্জে ম'শায়।"

তার পর শ্যালী ভগ্নীপতিতে অনেক কথা-কাটাকাটির পর বিনোদ দেখিল যে মিনতির সঙ্কল্প টলিবার নয়। সে তখন বলিল, "আচ্ছা সে পরে হ'বে। তুই এখন তবে আবার পড়তে আরম্ভ কর। এম-এ পাশ না ক'রলে ভাল একটা রোজগারের উপায় কিই বা হ'বে?"

তাই স্থির হইল। পরের দিন প্রত্যুষে মিনতি বইপত্র গুছাইয়া পড়া-শুনার আয়োজন করিল।

দশটার সময় হঠাৎ তোতারাম আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আর তার সন্ন্যাসী বেশ নাই। দেখিয়া মিনতির মন খুসী হইয়া উঠিল।

তোতারাম বলিল, "আমি হুগলী থেকে আসছি মা, এখনি আপনার যেতে হবে।"

"হুগলী থেকে? তুমি সেই খানেই ছিলে?"

"না মা, আমি বাড়ী গিয়েছিলাম, দিলীপ আমায় টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়েছে।"

"সে কেমন করে তোমার ঠিকানা জানলে?"

"আপনার চিঠিতে আমি যে ঠিকানা দিয়েছিলাম তা সে দেখেছিল।"

"ও! সে নিজে আমাকে নিতে পারলে না দেখে বুঝি তোমার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সে হ'বে না বাবা, সে বাড়ীতে আমি ফিরবো না। ঐ অনুরোধটা ক'রো না।"

"না মা, এখন আর রাগ করে থাকবার সময় নাই। বাবা এখন বোধ হয় মৃত্যু-শয্যায়! তাঁর জ্ঞান থাকতে থাকতে আপনি তাঁকে প্রসন্ন মনে একবার আপনার ক্ষমা ভিক্ষা দিতে যাবেন না?"

"আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায়? বল কি? কি হ'য়েছে তাঁর?"

"কাল হঠাৎ তাঁর এপোপ্লেক্সী হ'য়ে অচেতন হয়ে প'ড়েছেন। আজ সকালে আমি দেশ থেকে এসে দেখলাম তাঁর সেই অবস্থা—দিলীপ অস্থির হ'য়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাকে দেখেই দিলীপ আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বল্লে, দাদা, তুমি যাও, মাকে নিয়ে এসো। আমি অমনি ছুটে এলাম।"

মিনতি তৎক্ষণাৎ একখানা ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন? জ্ঞান হ'য়েছে কি?"

"আমি যখন আসি তখন পর্য্যন্ত হয় নি।"

মিনতির ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ পর বলিল, "ডাক্তারেরা কি বলেন?"

"তারা বলছেন এখনো কিছুই বলা যায় না। হয় তো আর জ্ঞান নাও হ'তে পারে।"

তার পর আর কিছুক্ষণ বাদে মিনতি বলিল, "হাঁ বাবা, আমার জন্যে কি—আমি কি তাঁর এ দশা ক'রেছি?" মিনতির চক্ষে জল আসিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তোতারাম বলিল, "ডাক্তাররা সেই রকম অনুমান করেন। আপনি চ'লে আসাতে তিনি একেবারে মুশড়ে প'ড়েছিলেন। সেই shock থেকে এমনি হওয়া সম্ভব।"

মিনতি মনে মনে ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিয়া তাঁহার কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ট্যাক্সি আসিবামাত্র তাহারা উঠিয়া বসিল। প্রথমে তারা কলিকাতার দুইজন বড় ডাক্তারের কাছে গিয়া তাঁহাদের হুগলী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া ষ্টেশনে গেল।

সে যাত্রা শিশির অনেক চেষ্টায় রক্ষা পাইয়া গেল। কিন্তু পক্ষাঘাতে তার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গেল।

তোতারাম ও দিলীপ অক্লান্ত চেষ্টায় শুশ্রূষা করিল। মিনতি স্বামীর শিয়র ছাড়িয়া একদণ্ডও নড়িল না। আহার নিদ্রা এমন পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া এমন প্রশান্ত একান্ত সেবা যে কেহ করিতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না।

শিশির এখন তার চেয়ারে পড়িয়া থাকে—রামধারী তাহাকে ঠেলিয়া বেড়ায়। মিনতি সর্ব্বদা পাশে বসিয়া তার সঙ্গে গল্প করে, গান করে, বই পড়ে, ধর্ম্মালোচনা করে।

রোজ একবার তাকে লইয়া মিনতি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যায়। মিনতির আর কোনও কাজ নাই—দিন রাত সে শিশিরকে লইয়াই আছে।

তোতারাম একদিন আসিয়া বলিল, "বরাহনগরে গঙ্গার উপর একখানা বাড়ী কিনেছি মা। প্রকাণ্ড বাগান আছে—আর বারান্দায় ব'সলেই গঙ্গার হাওয়া পাবেন। আপনারা সেইখানে চলুন।"

শিশির বলিল, "কোন্ বাড়ী ?"

তোতারাম সে বাড়ীর পরিচয় দিল। শিশির বলিল, "সে যে প্রকাণ্ড বাড়ী, একবার তার পঁচাত্তর হাজার দাম চেয়েছিল।"

"না—এখন তার চেয়ে সস্তা হ'য়েছে। আমি পঞ্চাশ হাজারে পেয়েছি।"

মিনতি অবাক্ হইয়া বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী কিনেছ? তোমার এত টাকা আছে?"

দিলীপ বলিল, "তবে কি?—ঐ যে ঠিকানা দিয়েছিলে তুমি, কুমার নৃপতিনাথ চৌধুরী—তিনি তোমার কি হন?"

হাসিয়া তোতারাম বলিল, "বেদান্তে বলে সব জীবই এক ব্রহ্ম—মানুষে মানুষে কি ভিন্ন কিছু আছে? তিনি ও আমি এক আত্মা বললেই হয়।"

"অ্যাঁ! তুমি কুমার নৃপতিনাথ!"

তোতারাম হাসিতে লাগিল।

সকলে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশির বলিল, জগদীশপুরের জমীদার—তোমার তো অন্ততঃ লাখ তিনেক টাকা আয় হ'বে।"

"হাঁ—ঐ রকম হ'বে।"

মিনতির মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বলিল, "না জেনে তোমার বড় অমর্য্যাদা ক'রেছি"—

ম্লানমুখে নৃপতিনাথ বলিল, "মা, ঐ কটা টাকার কথা শুনে আপনি আমাকে এখন পর ভাবছেন?"

লজ্জিত হইয়া মিনতি বলিল, "না বাবা! কিন্তু তবু—কত কষ্ট না জানি হ'য়েছে তোমার।"

"মা, বাড়ী থেকে পাগল হ'য়ে বেরিয়েছিলাম স্নেহের অভাবে। বাবা ম'রে গেলে ছেলে বয়সে বিমাতার হাতে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছিলাম। সংসারে ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিল। আপনার কাছে সেই স্নেহ পেয়েছি। সংসারে থেকে যে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হ'তে পারে তা' আপনার কাছে শিখেছি। তাই মা যখন দেখলাম আপনার বিপদ, তখন ঘরে

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

অগ্নিসংস্কার … …	১॥৽
আনন্দ মন্দির … …	॥৽
দ্বিতীয় পক্ষ … …	॥৽
শাস্তি … …	২॥৽
বাসন্তিকা … …	১৲
রক্তের ঋণ … …	॥৽
গ্রামের কথা … …	২৲
পিতা-পুত্র … …	১॥৽
শুভা … …	২৲
রাজগী … …	২॥৽
কাঁটার ফুল … …	১॥৽
ব্যবধান … …	২॥৽
দূরের আলো … …	২৲
বিপর্য্যয় … …	২॥৽
পাপের ছাপ … …	২।৽
মিলন-পূর্ণিমা … …	২৲
রূপের অভিশাপ … …	২৲
তৃপ্তি … …	২৲
একা … …	১॥৽
ব্যবধান … …	২॥৽
উকের, মেলা (নাটিকা) … …	॥৽
ঋষির মেয়ে (নাটক) … …	১৲
নারায়নী (নাটক) … …	১৲
আহুতি (প্রবন্ধ) … …	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



বাংলার স্ত্রী-আচার

শ্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী-সংকলিত